চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অনন্যা প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদনা : অশোকা গুপ্ত, পি. ৪০৪/৫ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-২৯,
অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, ৯৪/২, অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া-২
প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৮, প্রকাশক : হীরক রায়, অনন্ত প্রকাশন,
৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলিকাতা-৭৩, প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল, মুদ্রাকর :
কুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিণ্টার্স, ৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের নভোমণ্ডলে জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশেষ। স্মরণীয় এক নাম। স্বনামধন্যা লেখিকা তিনি।

বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে রাজস্থানের জয়পুর সহরে তাঁর জন্ম। সেখানেই শৈশব কেটেছে। বিবাহ সূত্রে মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশে আসেন। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর বৈধব্য ঘটে। তারপর আবার ফিরে চলে আসেন জয়পুরে তাঁর পিতৃ পরিবারে।

তাঁর পিতা পিতামহ উচ্চ রাজ-কর্মচারী ছিলেন। বিশেষ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন তাঁরা। তাঁদের পরিশীলিত রুচি নীতির মধ্যেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর বহু বছর কাটে। পাঠাগ্রহী মন তাঁর, বিদ্যালয় বা কলেজে পাঠের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু পিতৃপিতামহের লাইব্রেরীর বই ছিল প্রচুর। সেগুলির মধ্যে স্বচেষ্টায় তিনি প্রবেশাধিকার করে নেন। বিশেষ মনোযোগে সেই সব বই পড়তে থাকেন। তারপর কলম ধরেন।

কয়েকটি পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই লেখিকা হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সেই লেখনী আজও ৯৫ বছর বয়োক্রম পর্যন্ত তাঁর সৃজনী শক্তিকে বিকশিত ও প্রকাশিত করে চলেছে।

তাঁর সাহিত্য রচনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক পান। ১৯৭২ সালে পান রবীন্দ্র পুরস্কার। এছাড়াও আরো কয়েকটি পুরস্কার প্রাপ্তা হয়ে তিনি সম্মানিতা হন।

আত্মপ্রচার বিমুখ, নিরভিমানী কোমল ও দয়ার্দ্র হৃদয় মহিলা যে কেবল সাহিত্য রচনাতেই নিজের জীবন কাটিয়েছেন এমন নয়। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে তিনি সমাজের উচ্চনীচ সকল স্তরের মানুষের সেবা করে চলেছেন।

তাঁর সময়কার দেশের যে কোন আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, সমাজের সমস্যা বিষয়ক রচনা লিখেছেন। তার সৃষ্ট সাহিত্য কোনদিনও কেবলমাত্র পাঠকের চিত্তবিনোদনে আবদ্ধ থাকেনি। তা দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে, নারীর কল্যাণে নিযুক্ত থেকেছে।

নারীর অবরোধ মোচন, স্বাধীনতা আন্দোলন, হরিজন উন্নয়ন প্রভৃতি কি নিয়ে যে তিনি ভাবেননি তা বলা যায় না।

তাঁর চোখে যখনই যে প্রথা, সংস্কার বা আইন সংস্কারযোগ্য মনে হয়েছে তিনি

বলিষ্ঠভাবে তা নিজের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং উন্মুক্ত সভায় দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

নারী সমাজের জন্য ক্ষীণদেহা এই ৯৫ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর সাহায্য হস্তখানি প্রসারিত করে রেখেছেন। সেই হাতখানি ধরে তাঁর মত ও পথের ইঙ্গিতে চললে আজও আমাদের দেশের নারী সমাজ উন্নত মস্তকে সসম্মানে স্বাধীনভাবে চলতে পারে মনে করি।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পরিচয় ঘটে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনেরমাধ্যমে। সামাজিক আইনে নারীর সম অধিকার আন্দোলনে তিনি আমার মা স্বর্গীয়া চারুলতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। এই কাজে তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর মত স্বনামধন্যা মহিলার এই প্রবন্ধ রচনাবলীর ভূমিকা লিখতে পেরে আমি বিশেষ গর্বিত।

সম্পাদিকার নিবেদন

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জন্ম ১৮৯৭ অর্থাৎ বিগত শতাব্দীতে। ঐ শতাব্দীর নারীর মনে নিত্য যে প্রশ্ন জাগে অথচ যে প্রশ্নের সোচ্চার প্রকাশের সুযোগ যে নারী অন্তঃপুরের পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার এবং পুরুষের তাচ্ছিল্যের জন্য পায় না, তার অবস্থা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্ফীংকস্ (Sphynx) নামক কবিতায়—'পৃথিবীর ইতিহাসের নীরব দর্শক রূপে'। অর্থাৎ পুরুষের চোখে।

তাই "দয়ালু ঈশ্বর আমাদের করেছেন
মিথ্যাভাষিণী ও প্রবঞ্চক
তথা মিশরের ঐ স্ফীংকস্‌টার মত
পৃথিবীর ইতিহাসের নীরব দর্শক।"

তাঁর এই শতাব্দীর গোড়া থেকে নারী জিজ্ঞাসা বা অবস্থা সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ সংকলনের মূলে যাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই, তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীচিন্তামনি কর, স্নেহভাজন শ্রীঅমিতাভ চোধুরী এবং স্নেহাস্পদা ভারতী রায়, মঞ্জুশ্রী সিংহ, দেবী [illegible] মল্লিক, সুরঙ্গমা ভদ্র এবং মালতী গুহরায়।

আরও ধন্যবাদ দিই শ্রীমতী রেণুকা রায়কে যিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই বইখানির ভূমিকায় বলেছেন যে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও সমাজের চিন্তাশীল মানুষের কাছে এই লেখাগুলি তৎকালীন সামাজিক চিন্তাধারার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের সুযোগ দেবে। কেননা নারী প্রগতি আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, নারীর সামাজিক স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমানে যে নির্যাতন ও নারীর প্রতি অবিচার প্রত্যহ কাগজে আমরা দেখতে পাই—এ প্রসঙ্গে ১৯৩০ সালে "আওরৎ ও হাতিয়ার" প্রবন্ধে লেখিকা লিখেছেন যে, 'নারী তার নিজের ঘরে স্বচ্ছন্দে বাস করতে যদি না পারে ও নির্যাতিত হয়, অসম্মানিত হয় ও থাকতে না পারে—সেটা শাসন ব্যবস্থার কলঙ্ক।' স্বাধীন ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে নারী সব সুযোগ ও সুবিধা পেলেও একথা আজও প্রযোজ্য। সামাজিক সচেতনতা পুরুষের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য অনুশীলন ও আন্দোলনের প্রয়োজন এখনও আছে।

লেখাগুলি একত্র করে সঙ্কলিত করার ব্যাপারে শ্রীঅমিতাভ সেন, শ্রীমান পার্থসারথি গুপ্ত ও শ্রীমান হীরক রায়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

আমার লেখার গোড়ার কথা

সে অনেক দিন আগের কথা—অর্ধশতকেরও বেশি। হঠাৎ আমার জীবন যাত্রার সোজাপথে একটা প্রকাণ্ড পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। মোটা দাঁড়ির দাগ। আর জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এ যে কি ধরনের বিপর্যয়, মনে জীবনে সংসারযাত্রায় তা বলে বোঝানো এতদিন পরেও শক্ত। এবং এ বিপর্যয় শুধু মেয়েদের জীবনেই আসে। পুরুষের জীবনে এমনটা হয় না। এটাও আমার বিশেষ অভিজ্ঞতায় বুঝেছি।

দুঃস্বপ্নে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় লোকেরা বুঝেও জেনেও কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়। ভূমিকম্পে পায়ের নিচের মাটি সরে যায় যেমন, এই বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাও অনেকটা সেই রকম।

পৃথিবী যেমন বর্তমান আছে দিনরাত্রি চন্দ্রসূর্য নিয়ে। স্বজনবন্ধু মানুষও সবাই পাশে আছেন, কিন্তু মনে মনে ও জীবনে আশ্চর্য শূন্যতায় এক নিঃসঙ্গ হ'য়ে যাওয়ার এ অভিজ্ঞতা তাই আমাকে উপলব্ধি করালো।

আমি এক নিমেষে যেন মনের একটি পথহীন প্রান্তরে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে কেউ কোথাও নেই যেন।

অথচ মানুষের জীবনে মানুষের সঙ্গ না হলে চলে না। ভগবানকে লাভ করতে হলেও সঙ্গ দরকার হয়। সাধুসঙ্গ সৎসঙ্গ দরকার লাগে। এমনকি মায়াবী জড়জগতেও নদী-পাহাড় বন অরণ্য তাদের স্বজাতীয় সঙ্গীছাড়া থাকে না। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পলোকেও মানুষ সঙ্গী খুঁজে খুঁজে ফেরে। সঙ্গের আলোয় সঙ্গীর চোখে সে নিজেকে দেখতে পায়। নিজের অভাব মেটায়। নিজের বাড়তি সত্তাকে ভাবগুলিকে ছড়িয়ে দেয় সঙ্গীদের মধ্যে। এ বস্তু ছোট বড় সজ্জন-অসজ্জন ভালো মন্দ গুণী নিগুর্ণ মানুষ সকলেরই দরকার হয়। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গও মেলে না, সঙ্গীও নেই। যিনি গান ভালবাসেন—গানের সঙ্গী পান না। যিনি সাহিত্যসঙ্গ চান তা তিনি পান না। এমন কি যিনি সেলাই বা রান্নার সঙ্গী চান তাও পান না তিনি। অথচ সেটা মেয়েদেরও দরকার হয় পুরুষদের মতই। কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি মেয়েদের জীবনের সবটাই বিপর্যয় ও সংঘাতের মধ্যে চলা। পুরুষদের চলাফেরার বিধি-নিষেধ নেই। বন্ধু নির্বাচনেও বিধি-নিষেধ নেই। যেখানে যে গুণীর বা মনোমত সঙ্গীর সন্ধান পাবেন সেখানেই যেতে পারেন। কিন্তু মেয়েরা সঙ্গী ও সঙ্গহীন জাত।

'সহিত' থেকে 'সাহিত্য' কথাটির সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়েছে লোকে বলেন। এবং 'সহিত' মানে সান্নিধ্যও। ঐ সান্নিধ্য—মানুষের সঙ্গই আমাদের জীবনে এক দুর্লভ বিষয়!

যাই হোক সেই 'সাহিতের' 'সাহিত্য' মানে তো এখন বই পড়াশুনা।

সেই সাহিত্য এলো তার রূপকথার অমৃত লোকের কথামৃত নিয়ে। কলা-লোকের বার্তা নিয়ে। ভুবনমোহিনীরূপ নিয়ে—যে রূপে জগৎ মুগ্ধ।

কিন্তু সেকালের শিক্ষা তো! তার গভীরতা ও পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্র আমাদের কালে ছিল না। বিদ্যাসাগরের খানপাঁচেক পাঠ্য বইতে প্রথমভাগ থেকে—বোধোদয় অবধি পড়ে পড়া শেষ। আর রামায়ণ মহাভারত পুরাণ শুনি তার সঙ্গে! এই পড়া আরম্ভ পাঁচ বছর বয়সে। শেষ দশ এগারো বছরে। তখন গৃহজীবনে—বিবাহিত জীবনে প্রবেশ। কখনো কদাচ ইংরাজি ফার্ষ্টবুক ও বর্ণপরিচয় শেখানো হতো। ঠিকানা লেখার জন্য চিঠির!

ঐটুকু পড়াশোনা বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে তো সাহিত্যরস উপলব্ধি হয় না। পড়া শোনাও হয় না।

কিন্তু তাও হয়। খুঁড়িয়ে চলার মত, অন্ধের অন্বেষণের মতো।

তাই অত দুঃখের মাঝেও মনে হয়েছিল সেদিন এ যেন মানুষের জীবন নিয়ে বিধাতার লীলার সঙ্গে সমাজেরও একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বা কৌতুক। যার বিধি-নিষেধের অন্ত নেই মেয়েদের ক্ষেত্রে। সমাজের যন্ত্র যেন, মানুষ নয়। এখনকার মেয়েরা যে পড়াশোনায় মেলামেশায় সহজ সুযোগ পেয়েছেন—তাঁরা আমাদের সেই কালকে জানেন না।

তা ছাড়া পড়ার মত বইই বা ক'খানা সেকালে! অবশ্য যাও ছিল তা অপাঠ্য ছিল না। এবং কম থাকার জন্য এক জিনিসই বার বার খুলতে হয়েছে। বার বার পড়তে হয়েছে। আজ মনে করি মন্দ নয় সেটা।

বারে বারে পড়লাম, পেলাম বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ কথামৃত, রবীন্দ্রকাব্য ও কথাসাহিত্য। আর পড়লাম সঙ্গে মানকুমারী, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা, গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য কবিতা। এবং স্বর্ণকুমারী ক্রমে অনুরূপা নিরুপমা সীতা শান্তা দেবীদের লেখা কথাসাহিত্য। রামায়ণ পুরাণ এবং পড়বার মত বই 'বারবার বা দশবার' পড়াও মন্দ নয়। না পড়বার মত বই একবারও হাতে না পেলেও ক্ষতি নেই।

সংসারটা আছে অথচ নেই এমনি জীবনযাত্রা। যেন কাজ আছে অথচ আনন্দ নেই, স্বজন আছেন কিন্তু সঙ্গী নেই। তবে সেকালের মস্তবড় পরিবার এও একটা সঙ্গ তো! কর্মহীন আনন্দহীন দুর্যোগময় জীবনে মাঝে মাঝে দু-এক লাইন লিখি—তা যেমন অসংলগ্ন তেমনই বাজে।

এমন সময় কলকাতায় আসতে হলো।

সেও এক একান্নবর্তী পরিবারের মাঝে এলাম।

সহসা এখানে চারদিকে জড়ো হলো আর এক ধরনের মানুষজন।

সহসা অনুভব করলাম একটা নতুন জাতি। সেটা আমার তখনকার জগতের মতই একটা জগৎ, যাতে স্থূল সুখ দুঃখ সংসার স্বার্থ জগতের কিছুই নেই।

আপনার লোক তারাও সবাই। কিন্তু সংসারের মধ্যের যেন কেউ নয়, অনেকটা একটু মেস বা মনুষ্যশালা বা তীর্থপথের ধর্মশালা বিশ্রামশালা।

এবার যেন মনের শূন্য অন্ধকার ঘরে একটা প্রদীপ হেসে জ্বলে উঠলো।

মানুষের মনের যে প্রদীপটায় তেল থাকে—পাশে তার দেশলাইও থাকে; সলতেও থাকে, কিন্তু দেশলাইটা থাকে মিইয়ে।

খুড়িমা ছিলেন খুব সুকণ্ঠী সুগায়িকা। নিতান্তই কম বয়সী মেয়ে, আমার চেয়ে অনেক ছোট। কাকারও বয়েস প্রায় ছোটই—সমবয়সী কেউ, ভাইরাও তাই। পড়াশুনা করার মূলে তারা।

গানে গল্পে পড়ার বইতে (ইংরাজি বইয়ের আলোচনায়) মনের অসীম শূন্য-লোকের অন্ধকার রাত্রিতে কে যেন নক্ষত্র তারা ছড়িয়ে দিল এবং সেই অবাস্তব শূন্যবস্তু দিয়েই তো শূন্যতাকে পূর্ণ করা যায়। গান বা সাহিত্য কিংবা বন্ধুর আলোচনার জগৎ তো স্থূলে বস্তু নয়। সবটাই নিরর্থক নিষ্প্রয়োজনের জগৎ। লাভ ক্ষতি অর্থ স্বার্থ নিয়ে সেখানে কিছু কাজ করা হয় না। নিতান্ত অদরকারি জগৎ সেটা। কিছু গান কিছু কথা কিংবা কারো মুখের হাসি অথবা একটা কবিতা ও সাহিত্যের শূন্য বস্তু কথার আলো দিয়েই তার শূন্যতা ভরে ওঠে। এবং তা খালিও হয় যেমন ভরেও তেমন ওঠে।

ছোট ছুটকো বাজে লেখা কিছু কবিতা ছিল খাতার একটা পাতায় কারোকেই দেখাই নি—সে সব লেখা। আর ছিল একটা ছোট উগ্র লেখা। সমাজের অনুশাসন, নানারকম মন্তব্যের ওপর আমার তখনকার নারী মনের অভিযোগ অনুযোগ বিরাগে ভরা সে লেখা।

নাম ছিল—'নারীর কথা'।

বক্তব্যও এখনকার দিনে কৌতুক জাগাবে মনে। লেখাটার আরম্ভে ছিল রামপ্রসাদের একটি গানের দুলাইন—

'রমণী মুখেতে সুধা', সুধা নয় সে বিষের বাটী—

তুলসীদাসের দু লাইন—'দিনকো মোহিনী, রাত কো বাঘিনী

পলক পলক লহু চোষে

দুনিয়া সব পউয়া হোকে

ঘরঘর বাঘিনী পোষে'।

সাধুসন্তদের 'কামিনী কাঞ্চন' বলা চূড়ান্ত অভিযোগ ছিল পাঁজির বিধিবাক্যে

'স্ত্রী তিল মৎস্য মাংস সম্ভোগ নিষেধ।'

এককথায় স্ত্রীকে কেন মাছ মাংস তেলের সামিল করে বিধি নিষেধ করা হবে ?

সেকালের সমাজে কেমন করে যে অত কম বয়সে অমন দুঃসাহসী প্রতিবাদ করেছিলাম ও অভিযোগ জেগেছিল মনে তা বলতে পারবো না আজ। তবে ঐসব শাক্যের বিধানের বিধিনিষেধের বাণীতে যে ব্যক্তি নারী বা মানুষকে দোষী করা হয়েছে—যাকে নরনারীর চরিত্রের বা স্বভাবের দুর্বলতা বা দোষ অন্যায় অনাচার বলাই উচিত ছিল—আমার বক্তব্য বোধহয় তাই ছিল। আজো তাই আছে। এটাই হলো আমার ঐ লেখাটির মূল কথা। আসল বিষয় নারীকে 'সুধা নয়, বাঘিনী, মোহিনী, কিংবা খাদ্যবস্তুর মত কিছু কেন বলা হবে ? মানুষের ইন্দ্রিয় মন দুর্বলতার ইতিহাস তো একা নারীর ইতিহাস নয়। মানুষের মনের ধর্মের কাহিনী। তখনকার পুরুষরা এবং পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয় তাতে এ নিয়ে বেশ একটু কৌতুক মজা অনুভব করেছিল সন্দেহ নেই। বেশ একটু বাদ প্রতিবাদও উঠলো ধর্মীয় পত্রিকায় এবং রক্ষণশীল সমাজে। (কিন্তু পাঁজির বিধান আজও একই আছে !)

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কাব্যে কঠোর প্রতিবাদ করলেন। বললেন, 'এ ছদ্মনামে পুরুষের রচনা। মেয়েরা এরকম লিখতে পারেন না।' আরও দু একজন প্রতিবাদ করলেন। আমিও তার জবাব দিলাম।

ঠিক কথাই। আমিও লিখে, লেখা প্রকাশ হলে, খুবই লজ্জিত ও ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। কে কি ভাবলেন ? কে কি বলবেন ? লেখাটা কি অশালীন হলো ? চারদিকে শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের গুরুজন সমাজ। আমি একটা বৌ মানুষ এবং মাত্র ২৮।২৯ বছর বয়স তখন। লেখাটা বেরিয়েছিল ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায়। আগের মাসে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে একটা কবিতাও বেরিয়েছিল।

তখন মেয়েদের বিষয় নিয়ে লিখতেন খুব কমই কয়েকজন। একজন ছিলেন সত্যবালা দেবী। বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ লিখতেন। কিন্তু প্রতিপাদ্য বস্তু স্পষ্ট হত না যেন।

তখনকার আলোচ্য বিষয় ছিল নারী-শিক্ষা, পর্দা প্রথা, মেয়েদের বিবাহের বয়সের সীমা।

বৈধব্য জীবনের সামাজিক কঠোরতা, প্রয়োজনস্থলে বিধবা বিবাহের কথা সসংকোচে বলতেন, অতি সন্তর্পণে বিবাহবিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা উৎপীড়িত হলে। এবং নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তা।

বলাবাহুল্য, সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো খুব দরকারী মনে হতো না। তাঁরা গৃহজগতের ব্যস্ত মানুষ। ভাবপ্রবাহের ধার ধারতেন না। যদিও প্রতিবাদ করতেন। স্ত্রী-শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণায় খ্রিশ্চান মিশনারীদের আনুকুল্যে তার আগেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের বয়স বিধবা জীবনের

কঠোরতা কৃচ্ছতা-অপমানিতা পতিপরিত্যক্তা মেয়ে—আর উত্তরাধিকারহীন তথা জীবিকাহীন মেয়েদের সমস্যাটা প্রবলই ছিল চিরকালের মত।

সে কথা পুরুষরাও ভেবেছেন অনুকুল ও প্রতিকুল ভাবেই। মেয়েরা খুব ভয়ে ভয়েই বলেছেন সেকথাগুলো। বললে ভয় ছিল নানা রকমের ধরনের।

(১) কখনো ভয় বাবা ভাই শ্বশুর ভাসুর চোখ রাঙাবেন সম্পত্তির কথায়।

(২) বৈধব্যের কঠোরতার কথায় "মঞ্জুলিকা"র মত গোঁড়া পুরুষেরা টিট্‌কারী দেবেন। (৩) বিবাহ ছাড়াছাড়ির প্রয়োজনে অদৃশ্য পুরুষ সমাজ খড়্গহস্ত হবেন। (৪) বয়সের সীমা বাড়ানো ও লেখাপড়া শেখায় মেয়েরা চরিত্রভ্রষ্ট হবে বলবেন—যা সবটাই প্রায় যুক্তিহীন টিট্‌কারি ও ব্যঙ্গ।

আমার প্রথম লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ (ওমর খৈয়ামের কবি)। তিনি ছিলেন কাকাদের বন্ধু। একজন কাকার কাছে আমার একটা কবিতার খাতা ছিল কয়েকদিন। কান্তিবাবু সেটা দেখেছেন এবং তার দু-একটা কবিতা 'ভারতবর্ষ' 'বঙ্গবাণী' 'সংসঙ্গী' পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেন।

কবিতার জন্য আমার ভাবনা থাকলেও আসল ভাবনা ছিল ঐ উগ্র প্রবন্ধটির জন্য। পাঠকরা কী ভাবলেন, না জানা গোঁড়া ও উদার বন্ধু ও স্বজন আত্মীয়রাও কী মনে করলেন?

১৩২৮ সালের সেকাল। যখন বাইরে মেলামেশা তো দূরের কথা, ঘরের নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে কথা আলাপেও অদ্ভুত বিধি-নিষেধ। ভাসুর, শ্বশুর ও মামাশ্বশুর, বয়স্কদের নন্দাই, জামাই, কুটুম্বদের সঙ্গেও কথা কওয়া নিষিদ্ধই ছিল। আবার মেয়ে-মেয়েতে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রও সংকীর্ণ। যেটুকু আছে তাতেও তাঁদের চিন্তার ধারার সঙ্গে আমার নিজের চিন্তার ধরণ মিলতো না। এককথায় মাসি, পিসি, খুড়ি, মামি নানা সম্পর্কের বোনে বাড়িভরা। কিন্তু সাহিত্যের রসবোধ রুচির ভেদাভেদে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। তাঁরা হয়তো ভালবাসেন গানে গল্পে তাসখেলায় মশগুল থাকতে। মানসিক ক্ষেত্রের বন্ধুত্বও ঐ তাঁরই ভাই আর কাকারাও আত্মীয়বন্ধু। বাইরের পুরুষসমাজ তো নয়ই, পাশের বাড়ির পুরুষ-সমাজেও বিরাট ঘোমটার আড়ালই নিয়ম ছিল। তবু কি এক কৌতুহল শঙ্কিত মনে কান্তিবাবুকে একখানা চিঠি লিখলাম। আমার লেখাটা তাঁদের কেমন লেগেছে···ইত্যাদি। চিঠির জবাব পেলাম যেমনি সহৃদয় তেমনি সম্ভ্রম-স্নিগ্ধ উত্তর (এবং কিছু বইও এলো। বইগুলি সহজ ও কঠিন প্রবন্ধ ও নাটক মেটারলিঙ্কের মেরী ম্যাগডালিন ইত্যাদি।) তার সঙ্গে কিছু ভরসা ও উৎসাহ এমনভাবে মিশিয়ে লেখা যা সেদিন বুঝিনি অত, পরে বুঝেছি এবং আজ এতকাল পরেও দেখছি মানুষের জীবনে আত্মীয়গণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে যে জগৎ আছে তা কত উদার স্বার্থহীন নির্মল মধুর হতে পারে। পরবর্তী

লেখার কালে সেইকালের চিঠিপত্রেরই এবং কান্তিবাবুর সহৃদয় স্নেহকৌতুক মেশানো আলোচনা ও উৎসাহ আমায় লিখতে পড়তে ভরসা দিয়েছে। পরেও সেই ভরসাই লেখার পথের পাথেয় হয়েছে, নিজের কাজের গুণাগুণ দোষত্রুটি নিজে তো বোঝা যায় না। এবং পরেও চিরকালই আমার মনে হয়েছে নরনারীর অনাত্মীয় বন্ধুত্ব জীবনের একটি বিশেষ সম্পদ এবং নৈর্ব্যক্তিক আনন্দপথের পাথেয়। সংকীর্ণ গণ্ডিতে দেখা চোখে লোকে যে বন্ধুত্বকে পঙ্কিল দৃষ্টিতে বিচার করেন সেটাই সত্য নয়। সত্য তার অনেক উপরে, তার অনেক গভীরে সে সত্যের বাস। এই বন্ধুত্ব সঙ্গের বিস্তৃত ক্ষেত্র না পেলে কারুরই নিজের কর্ম সাধনার বিকাশ হয় না। এবং তা হয় না বলেই মেয়েদের জীবনে কোনো মনন সাধনাই সার্থক হয় না এও দেখলাম।

যা পেয়েছি এবং যা পাওয়া হয়নি তাই নিয়ে যদি বিচার করি, মেয়েরা জীবনে সব কর্মে সব সাধনাতেই সাহিত্য শিল্পকলা জ্ঞানবিজ্ঞান সর্বত্র পঙ্গু হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হল দেখতে পাই।

এই যে সঙ্গ বা সঙ্গীর প্রভাব ও প্রয়োজন এ পৃথিবীতে কি জড় কি স্থাবর জঙ্গম জীব-নির্জীবজগতে সর্বত্রই রয়েছে। গাছ পাথর, পাহাড়, নদীর জগতেও তাই দেখা যায়। সমতলে সমতলের পর সমতল ধু ধু প্রান্তর। পাহাড়ের দেশে পাহাড়-পর্বত একত্র হয়ে নিজেদের যেন দুর্গের মত ঘিরে আছে। নদী-গুলিও সব ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি পাশাপাশি দেশে মিলে মিশে গিয়ে বাস করতে ভালবাসে। গাছের তো কথাই নেই, তাল-নারিকেল খেজুর বন, আম-কাঁঠালের ফলের বন আগাছার জঙ্গল তারাও সব নিজের জাতের সঙ্গে একত্র হয়ে থাকে।

মানুষের মনেরও এই নিজ আত্মীয়দের দরকার হয়। যে যেরকম প্রকৃতির হয় সেই প্রকৃতিরই সান্নিধ্য সঙ্গ সে চায়। এবং ঐ পরিচয়ের সমস্ত রূপটাই তার মনের হৃদয়ের অন্তরলোকে। সহজ কথায় হৃদয়ের মধ্যে তার রূপ, কথার মধ্যে তার সঙ্গ, রচনা যা লেখার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থাকে, এই বন্ধুত্বের বা সঙ্গের কোনো পৃথক রূপ নেই। মানুষের যেমন দেহ মনের খাদ্য প্রয়োজন মনন-জগতেও বেঁচে থাকতে হলে এ সঙ্গী তার চাইই।

এইটেই মেয়েরা পান না। এবং পান না বলেই তাঁদের জগৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকে। সাহিত্যিকেরা সাহিত্যসঙ্গী, গায়কেরা সঙ্গীতসঙ্গী, শিল্পীরা শিল্পীসঙ্গী না'হলে বেঁচে থাকেন না। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো সময়ে বাপের বাড়িতে সাহিত্যচর্চা ছিল, সঙ্গীতচর্চা ছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির বা কর্মজগতের পরিবেশ এমনভাবে চাপ দিয়েছে যে সেইসব সাধ-সাধনা বা লেখা যাই বলুন বিস্মৃতিতে ডুবিয়ে দিয়েছে।

আরেক অভাব হল বাড়ির লোকদের উপেক্ষা নয়ত অবজ্ঞা কিংবা অসহযোগিতা। এও মেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে। লেখাপড়া থেকে যে কোন

ব্যাপারেই হোক তা। বিশেষ করে বিধবা পরাশ্রিত জীবনের ক্ষেত্রে। নিজের সহজ সাহিত্যিক প্রতিভা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিরুপমা দেবীর ক্ষেত্রে এটা দেখতে পেয়েছি ; সঙ্গসান্নিধ্য আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে না পারায় তাঁর সাহিত্যিক স্বত্বাকে শেষজীবনে আস্তে আস্তে নিজেকে ধর্মজীবনের ও তীর্থজীবনের কঠোরতায় ডুবিয়ে দিলেন, রচনাও গতানুগতিক হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার জীবনও বিস্তৃতক্ষেত্র পায়নি পরিবেশ সঙ্গ-সঙ্গীর অভাবে।

আমাদের তো সাংসারিক সহায় পিতা ও পুত্র। এঁরা যদি উৎসাহী হন, এগিয়ে আসেন, তাহলে তাঁরা স্বর্ণকুমারী অনুরূপা দেবীদের মত নিজের সাধনার ক্ষেত্রে ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারেন। যা এখনো যে কজন লেখিকা আছেন, সেটা পেয়েছেন বলেই। ঐসব সাধনা তাঁরা করে থাকেন পিতা পতি ও পুত্রের সহযোগিতায়। যেটা বৈধব্যজীবনে মেয়েরা পান না।

মনে পড়ে যায় বিদেশি লেখিকা জেন অস্টেনের একটু জীবনকথা। তাঁর কোনো ভাইপো বা বোনপোর (নেফিউ) লেখাতে তিনি লেখেন,—আমার মনে আছে বা শুনেছি জেন অস্টেন বেশ বড় বই বা মোটা হিসাবের খাতা নিয়ে বসবার ঘরের টেবিলের ধারে বসে কী সব লিখতেন। কেউ এলেই মুড়ে ফেলতেন। যেন হিসাব কিংবা ধোপার খাতা! অর্থাৎ লেখাটা গোপনচারী। সম্ভবত সেটা উপহাস্য অথবা অবজ্ঞাত হবার ভয় ছিল। হায়! স্বাধীন দেশের নারীও এত অসহায় ছিলেন!

একালে ও সেকালে এছাড়া আছে পারিবারিক দায়-দায়িত্ব। কারুর অসুখ, কারুর আঁতুড়, দাসীচাকরের কামাই বা অভাব, রান্নাঘরের কাজের দরকার তো ঘটেই—লেখার পাতা থেকে মন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অবসর থাকলেও। কখনো লজ্জা-ভয়ে-উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে কখনো কটুতিক্ত ইঙ্গিত ভাষণ শ্রবণে এ পলায়ন। এসব সেকালের মেয়েদের সাহিত্যক্ষেত্রের চিরসঙ্গী ছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বলা যায়, কেননা গানবাজনা ও স্কুল কলেজে পড়া রক্ষণশীল পরিবারে নিষিদ্ধ ছিল এবং এখনো দেখা যাবে স্কুল কলেজে পড়া ছেলে ও মেয়েতে মনোভাবের এই পার্থক্য আছে।

কিন্তু বৈদগ্ধ শিক্ষা ও বিদ্যা এই তিনটি বস্তু ছাড়া লেখকের ক্ষেত্র বিস্তৃতও হয় না, গভীরও হয় না। এই তিনটি ক্ষেত্র একসঙ্গে পাওয়া তো পুরুষেরই দুর্লভ—মেয়েদের ভাগ্যে তো সুদুর্লভ।

বলা বাহুল্য, বিদ্যার সঙ্গে মেলামেশা না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এবং বিদ্যা শুধু লেখাপড়া শেখা মাত্র হয়, বিদগ্ধতার বহুমুখী বিশেষত্বগুলি অর্জিত হয় না, সেকালে আমাদের এই অবস্থাই ছিল।

তারি মাঝে হঠাৎ আমি একটুখানি যেন আশ্বাস পেলাম কান্তিবাবুর চিঠিতে এবং সেই সময়ে আমাদের সমাজে আমার মনে ঐ চেনা পরিচয়টুকু যেন একটা

সম্পদবিশেষ হয়েছিল। আমার সে উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন মনের জীবনে ঐ নিতান্ত কাঁচা উচ্ছ্বাসভরা মেয়েলি লেখাগুলো গতানুগতিক এক পথেই দৃষ্টিহীন জন্তুর মত ঘুরছিল। ব্যক্তিগত বিয়োগ শোকের ক্ষোভের দুঃখের পথকে অতিক্রম করে অন্যদিকে যাবার ক্ষমতা সে কোনোদিন পেত না যদি না ঐ অচেনা মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারত। মনের ও মননের জগতে নারীর এই অভাববোধ বিদেশিনী বিদুষী প্রতিভা ভার্জিনিয়া উলফের রচনাতেও পাওয়া যায়। মেয়েদের সীমাবদ্ধ জীবন, সীমিত চিন্তার ক্ষেত্র এবং সমাজের বিধিনিষেধসমষ্টি, পুরুষ-সমাজের অবজ্ঞা উপেক্ষা নিয়েও তিনি বেশ কিছু আলোচনা করেছেন 'এ রুম অব ওয়ানস্ ওন' বইয়ে।

কৌতুক এই, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনেও অনেকদিন আমার সঙ্গে কান্তিবাবুর পরিচয়টা চাক্ষুষ হয়নি। দীর্ঘ আট ন বছর চিঠিতেই আলাপ চেনা-জানা হয়েছে এবং এইতেই আমার মনে ধারণা হয়েছে যে মনের জগতে শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসা সাক্ষাৎ চেনা না হলেও আদান-প্রদান মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে অনায়াসেই চলে। যেমন প্রাচীন কবির লেখা কাব্য পড়ে আমরা মনে মনেই তাঁদের মনের স্পর্শসান্নিধ্য অনুভব করি আবার গভীর আনন্দ পাই। এবং এই অদেখা অচেনা প্রীতিই তো ভগবৎ প্রেমেরও আদি ভিত্তি। একটি মহৎ সত্য।

এই চক্ষুকর্ণবাক্ আদি ইন্দ্রিয়াতীত দেহাতীত মনোময় প্রীতির নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে কিছু কিছু যে পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হল পৌরাণিক। যা থেকে বোঝা যাবে একটি দেহাতীত জগৎ এবং নরনারী সম্পর্কবোধশূন্য বন্ধুত্বের মধুর আশ্চর্য স্বাদবোধ সেকালেও ছিল। সে হল দ্রৌপদী ও শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্বের কাহিনী। বনবাসে ও স্বামীদের সঙ্গেও পতিদের অতিক্রম করেও শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্বে তাঁর অশেষ ভরসা ও নির্ভরতা ছিল। একদিনের জন্যও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হন নি। ইতিহাসে ও অন্যত্র কথিত অজস্র কাহিনীর অন্তরালে থেকেও আমরা সেই না বলা না লেখা নির্ভরতা ভরসায় মধুর সম্পর্কের স্পর্শ পাই। যদিও এ সম্পর্কতে চেনা জানা ছিল।

অন্যজন হলেন এযুগের নিবেদিতা। এই অসাধারণ মনস্বিনী তেজস্বিনী ব্রহ্মচারিণী বা ভারতপ্রেমী সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসজীবন ইতিহাসে এই নারীর যতখানি নিঃস্বার্থ আত্মদানের কাহিনী ছড়ানো আছে সেটা হল আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে। এই শ্রদ্ধা-প্রীতিময় বন্ধুত্বের তুলনা হয় না। একদিকে তাঁর গুরু বিবেকানন্দ, তাঁর জীবনে ভরা পরম আত্মোৎসর্গের কাহিনী, অন্যদিকে জগদীশচন্দ্রের উপর সেই শ্রদ্ধাপ্রীতি। এক আশ্চর্য মনোজগৎ এটিও।

ঐ প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর কি নৈর্ব্যক্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি এই দুজনের প্রতি। এবং আরো কত প্রীতি ও আত্মত্যাগময় কাহিনী আমাদের ঘরে ঘরে

আছে। হয়তো কত নিন্দা গ্লানি কত বাধা আর মনের আড়ালে সমাজজীবনে ও বিপ্লবী জীবনে—অসামাজিক জীবনেও তা সব সময় জানা যায় না।

এদিকে আমার সেকেলে সংস্কারযুক্ত মন ভয় পায়। 'পাছে লোকে কিছু বলে', বাড়ীর লোকদের ভয় করি পাছে কিছু মনে করেন। সবচেয়ে দ্বন্দ্ব নিজের মনেই, একটা অপরাধবোধ একটা ভয়, যেন আদর্শচ্যুতি ঘটছে। হিন্দু ঘরের বিধবার অন্য অজানা নিঃসম্পর্কীয় কারুকে চিঠি লেখা উচিত কি? কি যেন একটা অন্যায় অসঙ্গত অনুচিত কাজ হয়েছে!

সহসা একটা সমাধান আবিষ্কার করে নিলাম, একটা সম্পর্ক পাতিয়ে—ভাইবোন সম্পর্ক। তবু মনের ঠিক বা ভুলের খোঁচাটা দীর্ঘকাল ছিল।

কিন্তু গেল। অনেকদিন পরে। যেদিন কান্তিবাবু বিদেশিনী মহিলা 'এটা'কে বিবাহ করে আমার সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে এলেন। সেদিন আমার ঐ 'ভাই' সম্পর্ক পাতানো লোকটি যত্ন মায়া মমতা করার ভালবাসবার একটি নারীকে আপন করে পেয়েছেন দেখে যে আনন্দ হয়েছিল, তাতে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসার ক্ষেত্র ও পাত্র চিরকালই বহুবিস্তৃত এবং নির্মল হতে পারে। অকারণ সমাজ ও সংস্কারভীতি অপরাধবোধের জায়গা সেখানে নেই। এই নিঃসম্পর্কীয়কে আপন ভাবা ও নির্ভর করার মাঝ থেকেই আমি পেয়েছিলাম একটি বিদগ্ধ কবিমনের মমতাময় সহায়তা। একটি অচেনা অদেখা সামান্য বিধবা অন্তঃপুরিকাকে করুণস্নেহে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বই যুগিয়ে, লেখা সংশোধন করে, প্রকাশ করে তিনি আমায় সাহায্য করেছিলেন। আমার প্রায় না জানা ভাষা তখনকার ইংরেজী বই আমার কাছে এসে পড়ত। বুঝি বা না বুঝি। কিন্তু দেখলাম না বুঝেও পড়া চলে। অভিধান দেখে ভাইদের, কাকাদের সাহায্য নিয়ে পড়ি। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না।

আগেই বলেছি জীবনের পথে মেয়েদের পাথেয় আমাদের সমাজে কখনোই কেউ পায় না। তাকে তৈরী করা হয় সমাজের জন্য। জীবদাত্রীত্বের জন্য। জৈবজীবনেরই যত কিছু প্রয়োজনের জন্য—রন্ধন, সেবা, সন্তানলালন আর পারিবারিক কাজ। অর্থাৎ বহুজনের মনরাখা জগতের জন্য এককথায় তাকে মানুষ হিসাবে মানুষ করা হয় না, কাজে লাগাবার উপকরণ হিসাবে দেখা হয়। সে প্রয়োজন হল স্বামীর ও সন্তানের জন্য—মনের ও মননের অবকাশ তাদের দেওয়া হয় না। (বস্তুত আমাদের সময়ে তো একেবারেই না)। লেখাপড়া শিক্ষা জ্ঞান, শিল্পকলা আর কোনো প্রয়োজনের দিক মানবীয় মানুষ হিসেবে তার জন্য দেখা হয় না।

সেকালের সকলের মত আমিও দশ এগারো বছর বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঁচখানা বই (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়) এবং প্যারী-মোহন সরকারের ফার্স্টবুকের কয়েক পাতা পড়ে বিদুষী হয়ে সংসারযাত্রার

জৈবভোজ্যরূপে আরেক সংসারের ভোজের পাতায় পরিবেশিত হলাম। সেখানে, অপরপক্ষের আত্মপ্রতিষ্ঠার শুরু। এ পক্ষের আত্মবিলোপের সাধনার শুরুর জগৎ আরম্ভ হয়।

কিন্তু সংসারের দাবাখেলার ছকে ফেললেই তো হারজিতের মীমাংসা করা যায় না। হার হয়, জিতও হয় ভাগ্যদেবীর নিয়ন্ত্রণে। তখন পরাজিত 'নারী'-নামের মানুষটা যায় কোথায়? সেইটেই হল সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসনে মানুষের জীবনের অপচয়ের দিক।

এই অপচয়ের জগৎই হোল নারীজগৎ···। যার মন আছে, মননশক্তির বিকাশ নেই। হৃদয় আছে, হৃদয়ের সম্মান নেই। যেন সুর আছে সঙ্গীত নেই। ভাব আছে ভাষা নেই। এমনি জীবন। সে যদি মুনি (মনন যাঁর আছে তিনিই মুনি) হতে পেত—তার প্রেম-বিরহ-মিলন, তার শোক-বিলাপ আর্তনাদ না হয়ে বাল্মিকীর কাব্য হোত। কালিদাসের মেঘদূত হোত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সুর পেত।

এই জীবন ও বৈধব্য নিয়ে লেখাপড়া এ-যে কি জিনিস, সেদিন মহাকাল পাঠশালায় বিদুষী আমি বা আমরা দেখেছিলাম। আজো তার পঙ্গুতা বুঝতে পারি, দেখতে পাচ্ছি।

আগেই লিখেছি আমার প্রথম লেখার কথা। আগেই বলেছি লেখাটা বেশ একটু উগ্র ছিল যা সেকালের পুরুষসমাজকে রাগিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রাগলেন অনেকেই। কারণ তাতে ছিল 'পতিদেবতা' নামে একটা উক্তি। ছিল কামিনী ও কাঞ্চন নিয়ে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মতবাদের বিরোধিতা। যা হোল জীবস্বভাবের দুর্বলতা বা স্বভাব তাতে স্ত্রীজাতি বা পুরুষজাতি দুইই সমান সহযাত্রী, আর কাঞ্চন তো জড়বস্তু। স্ত্রীজাতি তার সঙ্গে এক হয়ে যায় কি করে? এছাড়া পাঁজির বিধিনিষেধের তালিকায় 'স্ত্রী-তৈল, মৎস্য-মাংস সম্ভোগ নিষেধ' বচনটি। নারী যেন স্ত্রী নয়, জননী নয় খাদ্যবস্তু। তাহলে ধরা যেতে পারে অন্য খাদ্যবস্তুগুলিও 'প্রাণময় ভোগ্য'। পাঁজিপুঁথির প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটল, তারপর সিম, মুলো, বেল, নারিকেল, নিম, বার্তাকু, মাষকলাই আদি ভক্ষ্যাভক্ষ্য।' এর সঙ্গে স্ত্রীলোক খাদ্য 'ভক্ষ্য-অভক্ষ্য' হয়ে পড়েছেন শাস্ত্রমতে। এই কথাটা যেমন কৌতুক উৎপাদক, তেমনি লজ্জাকর মুখে বলা—আবার তেমনি সঙ্গতি বা অর্থহীন।

আমি অবশ্য শুধু ঐ পাঁজির লাইনটিই উদ্ধৃত করেছিলাম এত বিস্তৃতভাবে বলিনি। সে সময়ে সে বয়সে এত বলা লজ্জাও ছিল শক্তও ছিল। যাইহোক একসঙ্গে এতগুলো মতবাদ নিয়ে লিখে একটি মেয়ের বিরাগ ও প্রতিবাদ জানানোতে অনেকেই ক্ষেপে গেলেন। এঁদের সকলেরই মনে হয়েছিল লেখিকা ছদ্মনামে পুরুষ। যাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম হলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়। আর দু এক সাধু রামকৃষ্ণমিশনের। এঁদের সকলেরই মনে আঘাত করেছিল ঐ 'পতিদেবতা' কথাটি। কিছু বাদানুবাদে যোগ দিলাম। সে সব ভারতবর্ষের ১৩২৮ সালের পাতায় আছে।

আর যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পত্রপরিচয় হয়ে গেল। ১৩২৯ সালের একসময়ে তাঁর পত্নী পুত্রসহ আমাদের জয়পুরের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন। সেইসময়ে আমার পরিচয় জানতে পারেন বৃন্দাবন ভট্টাচার্য মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র, তাঁরাও নারী ছদ্মনামে পুরুষ ভেবেছিলেন। পরিচয়ের পর তিনি খুব কৌতুক অনুভব করেন। পিতার কাছে ৺কাশী ফিরে গিয়ে বলেন। তর্করত্ন আমায় পত্রও দেন। সেই পত্রালাপগুলি তখনকার কাশী থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অলকায়' বেরিয়েছিল। এবং বলাবাহুল্য আমিও লেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বশুরকুল পিতৃকুল 'অ-কুল' সবাই কে কি ভাবছেন ভেবে লজ্জিত ও ভীত হয়েছিলাম। কারণ মেয়েদের লেখা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোনো সমাজ বা পুরুষ তো দেখেন না, এই হোল সমাজের অনুশাসন।

এই হোল লেখার জগতে ঐ প্রথম পা ফেলার কাহিনী, কিন্তু তখনকার আধুনিকরা যদিও আমার পক্ষেই ছিলেন।

কান্তিবাবুর কাছ থেকে ক্রমে আরো বই পেতে লাগলাম। আরো পেলাম তখনকার প্রখ্যাত অধিকার আন্দোলিকা 'এলেন কী'র 'ওম্যান' বা নারী নামের বই। একজন জার্মান লেখকের 'সেক্‌স্‌ এ্যাণ্ড ক্যারেকটার' নামের অদ্ভুত মতের বই। এঁর মতবাদ হোল মেয়েদের নীতিজ্ঞান নেই, ভেদবোধই নেই সুনীতি দুর্নীতির (অনেকটা আমাদের কিছু মুনি ঋষির মতে মেলে)। মেয়েরা এঁর মতে দুটিমাত্র শ্রেণীর, মাতাজাতীয়া, গণিকাজাতীয়া 'মাদার টাইপ, প্রষ্টিটিউট টাইপ' মাতা-নারী হিংস্র, স্বার্থপর হয়। সমাজের ভয়ে সতীধর্ম পালন করে। গণিকানারী নিঃস্বার্থ প্রকৃতি, উদার ও শিল্প-সাহিত্যে রসজ্ঞ হয়·· এই ধরনের বক্তব্যে তাঁর বইখানি সমৃদ্ধ।

এইসবের সঙ্গে ভাইরা, কাকারাও আনেন নানা বই। বার্ণাডি-শ'-র নাটক, ডস্টয়ভস্কির 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'। নাটক পড়া একটু সোজা। খালি কথা তো। বার্ণাডি-শ'র 'ক্যাণ্ডিডা', 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান' পড়তে পারলাম, বোঝা যেত। কথার মারপ্যাঁচ, তর্কের ফুলঝুরি কথ্যভাষায়। সেক্সপীয়ারের কাব্য, ভাবসমৃদ্ধতা তাতে নেই। বিদেশী কাব্য বোঝা কঠিন। তর্ক, তথ্য, কথা, আলোচনা বোঝা তত কঠিন নয়। নিজেরা তারা নিয়ে এলো হ্যাভলক এলিসের পাঁচখণ্ড 'সাইকোলজি এণ্ড সেক্‌স্‌'। বুঝি আর না বুঝি আলোচনা তারা করে নিজেদের মধ্যে। আমরা কয়েকজন "মহাকালী পাঠশালায়" পড়া শিষ্টাচার এ মেডেল পাওয়া বিদুষী ও শ্রোত্রী সসম্ভ্রমে সংকোচসহ শুনি।

অবশ্য শ্বশুরবাড়ীতে মাত্র দশ বছরের সধবা জীবনে গুরুজনদের লুকিয়ে চুরিয়ে কাজকর্ম সেরে রাত্রে বসে দু একখানা ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ পড়তে শিখেছিলাম। বৈধব্যের পরে জয়পুরে এক পিতামহের কাছে দু একখানা সহজ ও কঠিন বই পড়তে বসেছিলাম যখন সংসারধর্ম ভাবনার দায়িত্ব থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি পেলাম। যদিও অঙ্কুশটা রয়ে গেল এবারে অনুগ্রহ এবং কৃতজ্ঞতার আকারে। তবু ঐ অবোধ্য বই পড়া এবং ব্যর্থ লেখার চেষ্টাই সে জীবনের গোপন মনের সান্ত্বনার সম্বল ছিলো।

যা বলছিলাম আগে। সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করে মনের সীমালোকে যে কিছু পাওয়া যেতে পারে সেইটেই তখন ঐ ভাই ও কাকাদের কাছে পেলাম। এবং তাঁদেরই বন্ধুদের কাছেও পরে মনের জগতে চলবার পথ দেখতে পেয়েছিলাম।

আমার নিজের মতে মেয়েদের আনন্দের কোনো সৃষ্টিই স্বাধীন সত্ত্বা ও স্বাধীন চিন্তা কল্পনার অভাবে সার্থক হয়না। আমরা অনুগ্রহ আর কৃতজ্ঞতার ভারে ওতপ্রোতভাবে ডুবে আছি। আমাদের মাথা থেকে পা অবধি শেখা আছে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি। এবং স্বাতন্ত্র্য যার নেই, সে মানুষ হলেও সেই অর্থে মানুষ নয়। বিবেকানন্দের সংবেদনশীল ভাষায়, 'যে ভালো বা মন্দ কিছু করতে পারে না, সে গরুও হতে পারে, দেওয়ালও বলা যায় তাকে' সে মানুষ নয়।

নারীর কথা

"রমণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী ;
ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি ।"
(ভক্তকবি রামপ্রসাদ রচিত)

সেদিন এই গানটির দুলাইন আমার কোন ভক্তিভাজন আত্মীয়ের মুখে শুনেছিলাম, অবশ্য একটু শ্লেষের সুরে গাওয়া হয়েছিল। সে শ্লেষটা যে কাকে করা হয়েছিল, ঠিক বুঝতে পারলাম না। যারা ঐ সব সম্মানসূচক কথা বলে জনসাধারণকে উপদেশ দেন, তাঁদের সেই নিরীহ, স্নেহশীলা মাতা ধরিত্রীর চেয়ে সহিষ্ণু, (এটা বললে অত্যুক্তি করা হবে না হয়ত) নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিতা, কুণ্ঠা-লজ্জা সরম সংকুচিতা আমাদের জননী, ভাগনী সহধর্মিণী, কন্যাকে বলা হয়েছে ? যাঁরা নিজেদের অভাব, অভিযোগ, লাঞ্ছনা সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন না, চিরদিন মানুষের, শাস্ত্রের, পিতার, স্বামীর, পুত্রের কাছে ভয় সংকোচপরায়ণা—সেই মৃত জাতিকে খড়গাঘাত করা হয়েছে।

গানটি যাঁর রচিত, তাঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, কিন্তু তবু মুখে আসে, ভগবান এমন বন্ধুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ কামিনী-কাঞ্চন শব্দটির অনাবশ্যক প্রাদুর্ভাব অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। নব্যবঙ্গের পূজ্য ভক্তিভাজন বিবেকানন্দের উপদেশেও ঐ মূল্যবান উপদেশটির অভাব নেই। এই সব দেখলে স্বতই মনে আসে তা হলে কি আমাদের দেশে জ্ঞানী সাধকদের কাছে তাঁদের মাতা কন্যা, ভগিনীরা পিশাচী স্বৈরিনী! তাঁদের মধ্যে মাতৃত্ব, নারীত্ব নেই—নারীর মহিমা হয়ত শাস্ত্র বুঝিতেন, তাই তাতে আছে নারীদের পূজা করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন আবার মাঝে মাঝে দেখি নারীত্বের মহিমা এমনি ঠুনকো জিনিস যে, 'বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে নারীর থাকিতে হইবে—কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নহে।' কি ঘৃণার্হ কথা ? এ থেকে যে কি প্রকাশ পায়, তা আর লিখে বা বলে নিজেকে কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা হয় না। এত ভঙ্গপ্রবণ, এমন ঠুনকো ধর্ম নাই থাকল ? যার নিজেকে শাসন বা রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই বা প্রবৃত্তি নেই, তাকে ধর্ম বলা চলে না—আর যা ইচ্ছা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুশাস্ত্র রূপ মহা জলধিতে এই রকম কত রত্নরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যা আমাদের কাছে অমূল্য ? কিন্তু আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না, এই অপূর্ব সম্মান বা অসম্মানটি কাকে করা হয়। ব্যথা-ভয়-আনন্দ-শোক-দুঃখ-সুখ বিজড়িত, রক্ত-

মাংসময় দেহ বিশিষ্ট ভগবানের সৃষ্টি (মানুষের নয়) এই হতভাগিনী নারীদের না তাদের সমাজ ধর্ম পালনকে ?

যাঁরা কখনও নিজের সামান্য অভাব ত্রুটির কথাটাও মুখে বলতে সঙ্কোচবোধ করেন, যাঁরা সমাজের উৎপীড়ন অত্যাচারকে বিধাতার আশির্বাদের মত মাথা পেতে নেন, নিজেদের মানসিক, শারীরিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য করেন না, তবু আপনাদেরই বাপ, আপনাদেরই কোলে করে মানুষ করা ভাই, পতিদেবতা (হোন বা না হোন) আপনাদেরই বুকের স্নেহধারা দিয়ে লালিত পুত্র সকলের কাছেই উৎপীড়িত হন না কি ? আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়—মনে হয়ত বা এই অধম হতভাগিনীরা ভগবানের সৃষ্টি নয়, এদের মানুষই গড়েছে ;—তাঁদের দুস্প্রবৃত্তি, পৈশাচিক লিপ্সা, নিষ্ঠুর পীড়নের উপকরণ স্বরূপ করে। তাই এঁরা কোনও অন্যায়, কোনো উৎপীড়নের প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না—স্রষ্টার অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হন। মানুষ হয়ে যিনি অত্যাচার সহ্য করেন, আর যে অত্যাচার করে,—উভয়েই মানুষ নামের অযোগ্য।

আমাদের পুরাণ, মহাভারত—সকলের মধ্যেই বেশির ভাগ এই রকম সম্মানের নমুনা দেখা যায় নারদ নারী চরিত্রে, নারদ জিজ্ঞাসা করছেন কাকে ? না, রম্ভাকে ! স্বেচ্ছাচারিণী রম্ভাও ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। সে বর্ণনা পড়লে আমাদের মায়েদের, মেয়েদের কেন যে লজ্জায় ধিক্‌কারে ঘৃণায় শরীর মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে না, তাকে ধর্মপুস্তক বলে কেমন করে যে পড়েন, আমি ভেবেই পাই না। কেন যে তাদের মনে হয় না, 'মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও—তোমার কোলে লুকাই।' তাতে এমন ঘৃণিত, দুঃসহ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, যার প্রতিবাদ করতেও লজ্জা হয়। নারদ কি সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, উত্তরা, চিন্তা, চিত্রাঙ্গদা—কারুকেই পাননি ? অবশ্য জায়গায় জায়গায় সতী মাহাত্ম্য দেখা গেছে, কিন্তু সে কি শুধু 'নরপূজার মাহাত্ম্য' কীর্তন নয় ? শুধু পতি দেবতার সন্তুষ্টি সাধন নয় ?

আমাদের মায়েদের, মেয়েদের অধিকার নেই আশা নেই, আনন্দ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। আছে কি ? আছে শুধু নির্জীব দাসীত্ব —যার প্রতিকার কেউ করতে পারবেন না স্বার্থহানির আশঙ্কায়।

আমাদের মায়েরা—নারীরা, মাদ্রাজের পঞ্চমার, বঙ্গের নমঃশূদ্রের, আমেরিকার নিগ্রোর, ইউরোপের আইরিশের—সমস্ত বিশ্বের যেখানে যত উৎপীড়িত আছেন সকলের চেয়ে লাঞ্ছিত, তবু তাঁদের লাঞ্ছনার অন্ত নেই। মহিলা শিক্ষার কথা উঠলেই পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান,—পাছে ঐ উৎপীড়িতারা উৎপীড়ন বুঝতে পারেন, পেরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন ; যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন। তাই কতরকম

করে বলা হয় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা পবিত্র ভারতবর্ষের পুণ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে মহিলারা এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা পাননি; তাই সনাতন হিন্দু ধর্মের কঙ্কালটা আছে (কঙ্কালই বটে) অতএব তোমরা আর শুদ্ধান্তপুরে ম্লেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিও না; তাহলে এমন পবিত্র মহিমান্বিতা হিন্দু মহিলা এমন পবিত্র সনাতন ধর্ম—সবই রসাতলে যাবে। পবিত্র বৈ কি, নিশ্চয়ই পবিত্র; নারীহন্তা, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারী,—পুণ্যের নামে, ধর্মের নামে উৎপীড়ক যে ধর্ম, সে ধর্ম পবিত্র নয়? অবশ্য আগের কথা জানতে না পারি কিন্তু এখন ত সনাতন ধর্মের রূপ এই রকম। যে ধর্মের নামে প্রচারিত সমাজের অনুশাসনে অবিবাহিতা কন্যা আত্মহত্যার আশ্রয় লয়; বিবাহিতা প্রহৃতা, পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা, বিধবা অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় কটুবাক্য ভূষিতা হয়েও প্রতিকারে অক্ষম সেই সমাজ, সেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে ধর্ম আমরা প্রচার করি তার পবিত্রতায়, মহত্ত্বে কি কিছু সন্দেহ আছে? উৎপীড়িতা মহিলা যদি তেজস্বিনী হন, তবে তাঁকে আত্মরক্ষার্থ আত্মহত্যার আশ্রয় নিতে হয়। যদি ভুল করে এক পাও ঘরের বাইরে আসেন, জীবন্তে নরকের ব্যবস্থা। আর মাঝামাঝি কোনো স্থান নেই। আমি শুধু ভাবি, ভগবান আমাদের কেন কন্যা জন্ম দেন।

আমাদের ধর্মপুস্তক যে কেহ ইচ্ছা করেন পড়ে দেখবেন—বেশির ভাগই এই রকম ব্যবস্থা। আবার পঞ্জিকা খুলে দেখুন, গাছ আসে তেলের সঙ্গে কোন হতভাগ্য নারীর নাম করা হয়েছে কি জন্য? সম্ভাব্যার্থ। আমি জানি না, এর চেয়ে লজ্জা ঘৃণার কথা আর আছে কি না।

ভগবান কি একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই এই হতভাগিনীদের সৃষ্টি করেছিলেন?

তুলসীদাস পড়ুন, কবীর পড়ুন, যাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, লোকে বলে জনগণের উদ্ধারের জন্য, সেই সব মহাপুরুষ নামে অবহিত মহাত্মা বা তাদের জননী-ভগিনীর (হয়ত অবিবাহিত কি স্ত্রী পরিত্যাগী তাই স্ত্রী বললমাম না) উদ্দেশ্যে বলে গেছেন—

অভিহিত মহাত্মা বা তাঁদের জননী-ভগিনীর (হয়ত অবিবাহিত কি স্ত্রী পরিত্যাগী তাই স্ত্রী বললাম না) উদ্দেশে বলে গেছেন—

'দিনকো মোহিনী রাতকো বাঘিণী পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর-ঘর বাঘিণী পোষে॥"

যাঁরা মার বুকে মানুষ, বোনের কোলে শৈশব কাটিয়েছেন, সন্তানের জননী স্ত্রীকে, ঘরের গৃহিণী স্ত্রীকে দেখেছেন তাঁদের মুখে এমন কথা আসে? আমার তো ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁদের মহিমা উপলব্ধি হয় না। সবচেয়ে বড় ত্যাগ কামিনী-কাঞ্চন—তা না হলে আর সাধক হওয়া যায় না, ভগবানের মহিমা

উপলব্ধি করা যায় না। আবার লক্ষ্য করে দেখলে বুঝা যাবে, কি রকম নীচ কদর্য্য অর্থসূচক নাম আছে নারীদের, সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, এই হতভাগিনীরা নিজের অবস্থা জানেনও না, বোঝেনও না; হয়ত বা সমর্থনও করেন এই নিয়মের। যাক ঐ থেকে বেশ বুঝা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে মেয়েদের অন্ধ করে রাখা হয়েছে, তা সিদ্ধ হয়েছে। শেষে শুধু মনে হয়, ভগবান এই নিষ্ঠুর হতভাগ্য দেশ থেকে নারীত্ব বিলুপ্ত করে দাও।

ভারতবর্ষ আষাঢ়, ১৩২৮

আজকাল পাশ্চাত্য বিবাহ-সমস্যা নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। পাশ্চাত্য জগতে বিবাহচ্ছেদ প্রথা থাকাতে, আর নারী ও পুরুষের প্রায় সমান অধিকার থাকায়, বিবাহটা স্থলে স্থলে সাময়িক হয়ে পড়েছে। এক কথায়, তাকে বিবাহ না বলে স্বৈরাচার বলা চলে। কাজেই সন্তানদের কাছে পিতৃ-মাতৃ পরিচয় অনেক স্থলেই গর্বের বিষয় না হয়ে, লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জগতের অনেক মনীষী সমাজের এই অনাচারে শিউরে উঠেছেন।

যদি ভাবি, ওখানে যা-খুসী হ'ক না, আমাদের তাতে কি ক্ষতিবৃদ্ধি? কিন্তু সেটা খাটছে না; কেন না, আমাদের সমাজ ও মনের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কিছু কম আধিপত্য বিস্তার করে নি। সেইজন্য আমাদের সমাজ আর মন দুই-ই ও বিষয়ে অনুকূল প্রতিকূল দু-রকম মতই দিতে আরম্ভ করেছে।

বিবাহ সম্পর্কটা দৈহিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও মাত্র ঐটাই ওর মূল আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য নয়। তার অনেকটাই মানসিক মিলনের উপর নির্ভর করে। কাজেই ও সমাজে নর-নারীর অবাধ সম্মিলন আর পূর্ণ অধিকার থাকার ফলে, যাঁরা সমাজের ধর্ম আর ভিত্তিস্বরূপ, সেই নারীরা অনেকেই পুরুষদের মতন চঞ্চলমতি হয়ে, নিজেদের নির্বাচন বা মিলন একেবারে স্থির করে নিতে পারেন না। সমাজ তাঁদের অনুকূল হওয়াতে, তাঁরা মনের সাময়িক মোহের প্রভাবকে দমন না করে অনুসরণ করে চলেন।

এখন পুরুষেরা যতদিন স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচার করে এসেছেন, তাতে সমাজের কিছু ক্ষতি হয় নি; মানে, পুরুষের অসুবিধা ঘটে নি; তার শাসন বিচার মেনে চলবার লোক ছিল,—তার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল নারীর কাছে। তার মূল কারণ, নারীরা 'মা'। সন্তান জন্মানর পর তাঁরা নিজের অধিকার—স্বার্থ বা সুখ-দুঃখ নিয়ে বেশী ব্যস্ত হ'ল না; তাঁদের সুখ, আনন্দ, স্বার্থ সবই তাঁদের সন্তান। সে ক্ষেত্রে তাঁদের ধর্ম শেখানো বা ভয় দেখানো সমাজের পক্ষে সহজ হতো। সমাজের সুবিধা ছিল এই যে, স্বাভাবিক মায়া প্রবণতার জন্য মার পক্ষে সন্তানকে ত্যাগ করা এক প্রকার অসাধ্য; কেন না, তিনি নিজের মধ্যে তাকে বহুদিন বহন করেন; সেই সময় থেকেই তাঁর মনে স্বতঃই একটা মায়া জন্মায়। তারপরে সন্তানকে কোলে পাওয়ার পর মাকে দিয়ে যে কোন স্বার্থ, যে কোন অধিকার ত্যাগ করানো যায়,—তাঁর মনে মার মমতা, স্নেহ প্রবল হয় অন্য সব জিনিসের চেয়ে। কিন্তু পুরুষের তা হয় না; তার কারণ, মা সন্তানকে না দেখে,

অনুভবেই তার প্রতি মায়া পরবশ হন ; আর সেই অনুভবের কালটিও কিছু কম নয়। পিতার কাছে সেরকম স্নেহ আশা করা যায় না। তিনি তাকে দেখে ভালবাসতে পারেন,—অনুভবে স্নেহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আবার জননীর পক্ষে শিশুর লালন পালন, আর সংসার প্রতিপালন, একলা করা কঠিন। কাজেই সন্তানের জন্যই নারী পুরুষের আশ্রয়ে বা অধীনে থাকতে বাধ্য বটে। সোজা কথায়, সন্তান যখন দুজনের, তখন পরস্পরের সাহচর্য্য পরস্পরের দরকার। নারী আর পুরুষ দুজনে মিলে সমাজ সৃষ্টি করেছেন। একদিকে পুরুষ প্রবল, একদিকে নারী প্রবল। অধিকার নারীর যে কম, তা সব সময়ে নয়। কিন্তু মায়া প্রবণতার জন্য নারীরা পুরুষের নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে দুর্বল ; তাই যেখানে পুরুষ অমানুষ, সেখানে নারীত্বের অপমান হয়েছে—নারী উৎপীড়িতা।

পতিব্রত্য গুণ, আর স্ত্রৈণতা মহৎ দোষ—এটা সব সমাজেই চলে ; অথচ দুটাই কি এক জিনিস নয় ? কাজেই, স্বামী ব্যাভিচারী, আর স্ত্রী সব সময়ে সুশীলা থাকবেন,—স্বামীর স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করবেন না, শুধু চোখের জলে দিন-রাত কাটাবেন, কখনও উপায় খুঁজবেন না—এটা সব শাস্ত্রে আর সমাজে খুব মহৎ আদর্শ আর ভালো জিনিস হলেও, মানুষের মনকে বিদ্রোহী করে তোলে (অবশ্য নারীরা যদি মানুষ নামে অভিহিত হন)। মানুষ অত্যাচার বুঝতে পারলে, ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে নিজের ক্ষতি করেও অনেক সময়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকে। এটাতে তার ধর্ম-অধর্ম দেখবার, বা নিন্দা-প্রশংসা কিছু করবার নেই। এতে শুধু দেখতে পাওয়া যায় উৎপীড়িত মানবাত্মার ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে আত্মহত্যা। এ আত্মহত্যা দেহের নয় মনের। কিন্তু এই যে বিদ্রোহ, এই যে প্রতিশোধ-স্পৃহা, এটাতে কি বিশেষ ভয়ের কারণ আছে ? এ কি মানুষের নারীর মনের স্বাভাবিক ধর্ম—প্রেম, স্নেহ, মমতার চেয়ে বড় ? একি মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলিকে একেবারে নষ্ট করতে পারে ? যাতে সমাজে স্বৈরাচার, পশ্বাচার ছাড়া কিছুই থাকে না ?

আমার মনে হয়—তা হয় না। তাই যদি হতো, তা হলে ঐ সমাজেই এত কুমারী নারী, মাতৃত্বের ভাবে উদ্বোধিত হয়ে, শিশু পালন, শিশু-শিক্ষা, শিশু-সেবার জন্য নতুন, স্বাভাবিক, সৎপন্থা অন্বেষণ করে বেড়াতেন না। বিবাহিতা বা সন্তানবতী মহিলাদের কথা ছেড়ে দিলাম ; কেন না, তাঁদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। এত চিন্তাশীল, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, ধার্মিক, মহৎ লোক জন্মাতেন না, যাঁরা সমাজের হিত-চিন্তায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন।

আমার মনে হয়—বহুদিনব্যাপী পুরুষের অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা নারীত্বকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। কিন্তু তা ক্ষণিক হবে, স্থায়ী হবে না। এই বিদ্রোহ হলাহলের পর যে অমৃত উঠে আসবে, তা হচ্ছে পুরুষের সংযম, একনিষ্ঠ প্রেম, মহত্ত্ব, নারীর তেজস্বী স্বাবলম্বনশীল সতীত্ব, মধুর মাতৃত্ব। এ থেকে সত্যকে,

ধর্মকে পূর্ণ রূপে দেখা যাবে ;—আড়াল করে রেখে সমাজের পেষণে রেখে পুরুষের রক্ষার নাম দিয়ে উৎপীড়িত করে, সেই অর্ধমৃত ধর্ম—নারীত্বকে আদর্শ সত্য বলে প্রচার করা চলবে না। পুরুষ আর নারী দুটি জাত পৃথিবীতে আছে—তাদের উভয়কেই ধর্ম সমান ভাবে পালন করতে হবে।

ও সমাজের পদস্খলন, পাপ দেখলে চমকাবার দরকার নেই ; কেন না, আমাদের সমাজে ও জিনিসটি যথেষ্ট পরিমাণে আছে, নানা আকারে, সকলেই তা জানেন। যদি সমাজে যথেচ্ছাচারের স্রোত বয়,—সেটা শিক্ষার, পারিপার্শ্বিক অবস্থার, আর মা-বাপের চরিত্র সুগঠিত না করতে পারার দোষ! ওটা মুখ্য ভাবে ব্যক্তিগত দোষ বলে মনে হয়। কিন্তু গৌণভাবে দেখলে বেশ বোঝা যায়, ঐসব কারণ ওর মূল।

সেই চোখ বুজে ধর্মপালন করাকে আমি ধর্ম বলতে প্রস্তুত নই—যার মধ্যে প্রেমের, ভালবাসার প্রেরণা নেই।

আমাদের উচিত, মুক্তির ভিতর থেকে সত্য বস্তু খুঁজে বার করা ; তাই হচ্ছে ধর্ম। তাতে যদি ভুল থাকে, যদি খাঁটি জিনিস সবটা না পাই, যদি আদর্শচ্যুতি দেখি তবু বন্ধন দিয়ে রেখে অভ্যাসগত ভালো চাই না। তাই নেব, আদর্শকে বড় আসন দেব কিন্তু সত্যের চেয়ে নয়। আদর্শচ্যুতিই সব চেয়ে বড় অপরাধ নয়—যদি মনুষ্যত্ব থাকে।

আমরা শিক্ষা দেব এমন করে, যাতে সত্য বা ধর্ম অভ্যাসগত না হয়—বন্ধন-মাত্র না হয়—মানুষ মুক্ত থাকে। তারপরে যদি আদর্শচ্যুতি ঘটে, তাকে ধর্মভ্রষ্টতা বলা চলবে না ; সে মানুষ আবার নিজেকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, এই রকম হওয়া দরকার।

যাঁরা মনে করেন, এরকম বিধানে সমাজে যথেচ্ছাচারিতা কদর্যভাবে দেখা দেবে, তাঁরা ভুল করেন ; কারণ, মানুষ মাত্রেই অমানুষ নয় ; তাদের মনের গতি যতটা প্রেমের দিকে—লালসার দিকে তার শতাংশের একাংশও নেই। আমাদের সমাজে ত বিবাহ সম্বন্ধে নারীদের বিধি-ব্যবস্থা কম কঠোর নয়। কোন সত্যনিষ্ঠ সমাজতত্ত্বজ্ঞ এ কথা বলতে পারেন কি যে, আমাদের হতভাগ্য সমাজে নারীত্বহীন স্ত্রীলোকের সংখ্যা পাশ্চাত্য সমাজের চেয়ে কিছু বিশেষ কম। কঠোর ব্যবস্থা, সুকঠোর আদর্শ, অসূর্যম্পশ্য অবরোধ সত্ত্বেও যদি এমন ঘটনা দেখা যায়, তা'হলে কোন সমাজের নিয়মের উপরই আস্থা রাখা চলে না। সমাজের কঠোর পেষণ বা বন্ধন মানুষকে আদর্শ চরিত্র করতে পারে না,—ওটা নির্ভর করে বেশী চরিত্র গঠনের উপর।

এ থেকে মনে হয়, মানুষের চরিত্র গড়বার জন্য, বা মানুষকে বাঁধবার জন্য, অন্ধ নিয়ম সংযম তত দরকার নয়, যত বেশী দরকার সংশিক্ষা, পারিপার্শ্বিক সৎ

আদর্শ, চরিত্রবান্ স্নেহশীল পরিজনের মমতা ভালোবাসা। কিন্তু তাও কি মানুষের মনকে সব সময়ে বাঁধতে পারে?

সব জিনিসেরই ভালোমন্দ ব্যতিক্রম আছে। তখন দোষীকে ক্ষমা করা হয় ভালো; না হয়, বিচার করুক সমাজ। কিন্তু এক জনের জন্য সকলের শাসন বা বিচার করাকে ধর্ম বা সুবিচার বলা চলবে না,—তাকে পীড়ন বলতে হবে।

এ যুগে অবরোধহীন সমাজে যদি কোনখানে নারীত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, বুঝতে হবে, ওটা বন্ধনে থাকলেও সম্ভব হতো। অবরোধ বা শাসন দ্বারা পৃথিবীর কোনো স্ত্রী বিক্ষিপ্ত চরিত্র হবে না, এটা আশা করা মূঢ়তা।

স্বেচ্ছাচারী ও মহৎ চরিত্র নরনারী পৃথিবীতে সব যুগে সব সমাজে চিরন্তন হয়ে ছিল, আর থাকবে—এইটাই স্বাভাবিক, আর সত্য। কোন সমাজ আদর্শ গড়ে তার নরনারীকে আদর্শ মানুষ করতে পারবে না।

শুধু নারীদের সম্বন্ধে আমার বলার কারণ, ঐ চপল প্রকৃতি হতভাগিনীরা যাঁরা ভুল করেন, অপরাধ করেন, তা অদৃষ্ট থাকে না; দেখা যায়। পুরুষের পাপ গোপন থাকে। তাই পুরুষ নির্মমভাবে তাঁদের সমাজ বহির্ভূত করে নিজে সাধু হয়ে, সমাজপতি হয়ে আবার সেই নারী জাতির কাছেই স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ ভোগ করেন। আর নিজেদের চরিত্রবল না থাকার জন্য সমগ্র নারী জাতির উপর সন্দেহ করেন, অবিচার করেন; স্থলে স্থলে অতি ইতরোচিত ব্যবহার করতেও দেখা যায়।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৮

সোপেনহর যা' বলেছেন, অটো ওয়েনিনজার, লুডোভিসি যা' বলেছেন, কাইসারলিং যা' বলেছেন, এ'দের আগে পরে আরও যাঁরা দেশবিদেশের সবাই মেয়েদের সম্বন্ধে যা' কিছু এবং যা ইচ্ছে বলেছেন, এ'দের সমসাময়িকরা যা' বলেছেন, সব জড় করলে একখানা অষ্টাদশপর্ব মহাভারত বিশেষ হয় বোধ হয়; এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সে সংগ্রহটা কম কৌতূহলজনক ও কম জ্ঞানপ্রদ হয় না। অথচ একালে সেকালে মেয়েরা এরকম করে কোনো পক্ষেই—না স্বপক্ষে না বিপক্ষে—কিছুই বলেন নি; সম্ভবতঃ তাও এইজন্যে যে, বলবার মতন কিছু পাওয়া যায় নি—কিংবা বলবার যোগ্যতাই নেই।

কিন্তু যোগ্যতা থাক না থাক, নিজেদের কথা উঠলে নিজেরা কিছু বলতে পারার মতন 'বালাই' আর নেই। অন্যে তাতে যা' ইচ্ছে বলবার সুযোগ পায়। এইজন্যে অনেক সময় অসাধারণকে সাধারণের পর্য্যায়ে নেওয়া হয়, 'ব্যতিক্রম'কে নিয়ম মনে করা হয়, আর ক্রমশঃ তা' বলার গুণেই প্রামাণ্য-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে থাকে।

সংস্কার আমাদের কতখানি গড়েছে, আর শুধু আমরা কি,—সেটা আমরা নিজেরা জানি না-ই শুধু নয়—অনেক সময় ধারণা করাও শক্ত হয়। একবার এক তরুণদলের এই ধরনের আলোচনাতে একজন গুরুজন বলেন, 'মানুষের সাড়ে পনের আনাই তো সংস্কার, সংস্কারকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতেই পারবে না।' তাঁর কথাটি অনেককে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। পুরুষ কি নিয়ে জন্মায়, আর কি দাঁড়ায়—পারিপার্শ্বিকের, আবেষ্টনের, সংস্কারের—নানারকমের প্রভাবে—একটা বাদ দিয়ে অন্যটা বলাও যায় আবার বল্লেও সর্বাদিক দিয়ে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

মেয়েদের স্বভাব প্রকৃতি সংস্কারও এ নিয়ম ছাড়িয়ে গড়ে ওঠে না, কেবলমাত্র নিতান্ত শিশু ছাড়া, বন্য বর্বর সভ্য শিক্ষিত সব মানুষেরই সংস্কার আছে; সুতরাং সংস্কারমুক্ত স্বভাব আদিতে কি ছিল,—লজ্জা, নীতি, ধর্ম-নিষ্ঠা অসংস্কৃত মনে থাকে কি না, এ সব সভ্য সমাজেরই গুণ কি না, ঠিক করে বলা শক্ত। প্রকৃত মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি 'প্রাকৃত' মানুষ যে তা নয় এতে বোধ হয় সন্দেহ নেই। যাই হোক, প্রাকৃত মানুষ কিরকম হয় আমরা জানি না, এবং সংস্কারমুক্ত প্রাকৃত নারীও আমরা দেখিনি। সম্ভবত যাঁরা মেয়েদের সত্যিকারের স্বভাব কি নির্ণয় করেন, তারপর রকম রকম সংজ্ঞা আখ্যায় ভূষিত করেন, তাঁদেরও সে সৌভাগ্য হয়নি। তখন সমগ্রভাবে সারা পৃথিবীর স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে স্বভাবে যেটা নেই

বা দেখা যায় না, সেইটাই যে সত্যিকারের তাদের স্বভাব ছিল আর আছে, তা বলাও যেমন শক্ত মেনে নেওয়া তেমনি কঠিন। নিদান অনুসরণ করে অনেক সময় অন্য প্রাণীর স্বভাব থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সিদ্ধান্ত করা হয় ; সেটাও ভাববার কথা। প্রাকৃতিক জগতে আসক্তি আছে, মায়া আছে ; সংস্কার নেই। প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু জীবন-প্রবাহ :—আসক্তি মায়াও ক্ষণিক, স্থায়ী নয় :—আজ পর্যন্ত হয়ও নি। (আর এই প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসারে যুক্তি বিচার তা'হলে শুধু মেয়েদেরই উপর প্রয়োগ করা চলেনা।)

এই সংস্কারের মূলে, এক কথায় স্বভাবে, মনের অজানা কোণে মেয়েরা যে কি এবং তার কি দোষগুণ আছে, যাঁরা বলেছেন এমন দু'চারজনের কথাই আমি অবশ্য যা' দেখেছি সংক্ষেপে বলব। যাঁরা এইসব লেখকের কথা উদ্ধৃত করেছেন বা সমর্থন করেন—মেয়েদের তাঁদের কাছে নিবেদন স্বরূপ দিলাম।

সোপেনহর বলেছেন, মেয়েদের শারীরিক গড়ন লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যায় তারা না বেশী মানসিকতার উপযুক্ত, না বেশী শারীরিক পরিশ্রম করতে সক্ষম। সেই নিয়মে তারা জীবনের ঋণ সন্তানধারণ ও পালনের কষ্টে সহিষ্ণুতায়, ত্যাগ স্বীকারে এবং পুরুষের কাছে অবনমিত থেকে তাদের প্রফুল্ল সহিষ্ণু সাহচর্য্য দিয়ে শোধ করতে বাধ্য ; ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দিক দিয়ে তার কোন উপযোগিতা নেই। প্রচণ্ড দুঃখ, আনন্দ, গৌরব কোনো কিছুই তার জন্য নয়।—তারা মিথ্যাচারিণী, coquette বঞ্চনাকারিণী, 'they have no sense of justice,' বিচার-বিবেচনা জ্ঞানহীন। তারা শিশু আর মানুষের মধ্যবর্তিনী প্রাণী। তাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি দয়া সেও বিবেচনা বুদ্ধি যুক্তিহীনতার জন্য। বর্তমানকে বড় করে দেখা অদূরদর্শিতা, জন্তু জগতের মতন—সেও ঐ বিচার যুক্তি বিবেচনাহীনতার জন্য তাদের একটা সহজ চতুরতা আছে আর মিথ্যাভাষণেও অসংশোধনীয় প্রবণতা আছে। নখী, দন্তী, শৃঙ্গী ইত্যাদির মতন প্রকৃতিদেবী নারীকেও আত্মরক্ষা করতে পারার জন্য কপটতা গুণটি দিয়েছেন। এই জন্য সততাপরায়ণা নারী দেখতে পাওয়া যায় না। এই মূল কপটতা থেকেই অবিশ্বস্ততা, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যাপরায়ণতা ইত্যাদি দোষ জন্মেছে।

উত্তরাধিকারেও নারীদের দাবী থাকা উচিত নয়, কেননা তারা উপার্জন করে না। তা ছাড়া, বিষয় পরিচালনার বুদ্ধিও তাদের নেই। স্পার্টানদের পতনের অনেকখানি কারণ বোধ হয়—মেয়েদের অধিক অধিকার দেওয়া,—যৌতুক দেওয়া সম্পত্তি দেওয়া এবং প্রচুর স্বাধীনতা দান করা। পরিণাম তাদের ভাল হয় নি। ফ্রান্স-এর অদৃষ্টেও কি আছে বলা যায় না। (On Women—Essays of Schopenhauer.)

Otto Weininger বলেছেন, 'মেয়েরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ; এক—মা, অন্য—ভালভাবে বল্লে মোহিনী বা মনোরঞ্জিনী। মাতৃপ্রকৃতির নারীতে স্বার্থপরতা

সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিক ; অন্য শ্রেণীর ঔদার্য, বুদ্ধিমত্তা, সদয়তা, সহৃদয়তা ইত্যাদি দোষ স্বাভাবিক। ঐ শেষের শ্রেণীর মা বা স্ত্রী হলেও মার Instinct-হীন, মার বিকৃতি।' এঁর মতে 'মাতৃ প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ অপরের সন্তানকে হিংসা করা, পীড়ন করা, আপনার সন্তানের স্বার্থের জন্য ; অপর প্রকৃতির মেয়েদের প্রধান লক্ষণ অপরের শিশুতে দয়া দাক্ষিণ্য মায়া রাখা ইত্যাদি।' চরিত্রের উৎকর্ষ, refinement, মাধুর্য ইত্যাদি যা কিছু শেষের শ্রেণীর একটা লক্ষণ। সোপেনহরের মতানুযায়ী, এঁরও মত দু'শ্রেণী নিয়েই, মেয়েরা মোটের উপর লজ্জাসম্ভ্রমশালীনতাহীন, অসত্যপরায়ণ, সত্যাসত্যজ্ঞানহীন। মেয়েদের আত্মা নেই, soulless ইত্যাদি। (Sex and Character)

Weininger বলেছেন, 'মেয়েরা অন্তসারশূন্য, nonmoral ; শীলতা জ্ঞানহীন, নীতির ধার ধারে না, সংকীর্ণ অনুকরণপরায়ণ, vain, অবিশ্বস্ত, মিথ্যা সত্য বিবেচনাহীন ইত্যাদি।' (এক কথায় আগের দুজন যা বলেছেন তাই তিনিও বলেছেন, বলবার ধরনটা ভিন্ন, 'ভালর জন্য বলছি' ভাব। বইটার নাম দিয়েছেন (Vindication।) যাঁরা স্ত্রীজাতিকে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, ভক্তি করেছেন অনেক কাজে স্ত্রীলোকের প্রেরণা পেয়েছেন, যেমনভাবেই হোক, কবি জ্ঞানী দার্শনিক ধার্মিক যে জীবনেই হোক, তাঁদের অনেককে এই Vindication পরিশিষ্টে স্মরণ করা হয়েছে। (Women—A Vindication)

কাইসারলিং যে বই-এ মেয়েদের সম্বন্ধে এইসব স্ত্রীজাতির নীতি, ধর্ম, লজ্জা প্রভৃতির কোনো স্বাভাবিক সংস্কার নেই (নারীর মূল্যে পরিশিষ্ট 'গ' বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৬) তারা গড্ডালিকা-প্রবাহবিশেষ, দেখাদেখি সব পারে, খেলোস্বভাব, অনুকরণপরায়ণ, ফ্যাসনের জন্য সব কিছু পারে, তাদের নীতিপরায়ণতা তাদের অভ্যাসের দোষ, স্বভাবের সংস্কারের ফল নয়, গুণ নয় ইত্যাদি তথ্য বলেছেন সে বই দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি ; বিচিত্রার পাতাতেই শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র এবং শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য মহাশয়ের উদ্ধৃত মতামতই আমাদের চোখে পড়েছে।

মেয়েদের বিরুদ্ধে যাঁরা চরমভাবে বলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই কজন বোধহয় খুব খ্যাতনামা। টলষ্টয় নীটশে ও সোপেনহরের মতন অনেক জন অনেক কথা বলেছেন। "She requires a master." দাবিয়ে রাখবার জন্য— নীটশে বলেছেন, টলষ্টয় তাঁর কথা সাহিত্যে তাদের লঘু, (Gospel of Superman) বাচাল, হ্রীহীন, vain, fickle ইত্যাদি দেখিয়েছেন। ওঁরও ধারণা মেয়েদের নিতান্ত অন্তঃপুরের ছোটখাট বিষয়ে ছাড়া কোনো কিছুতে উপযোগিতা নেই। তাঁর Social Evil and their Remedy-তে এই বিষয়ে খানকতক চিঠি আর প্রবন্ধ আছে যাতে বোঝা যায়, তাঁর ঠিক মতটায় নয়, মনটায় স্ত্রীজাতির ওপর শ্রদ্ধা নেই, অবজ্ঞা আর সন্দেহই বেশী।

আমাদের পুরাণকার শাস্ত্রকারেরা এইরকম ভাবের মতামতও যে দেন নি তা নয়। নারীদের সম্পর্কে অপরপক্ষে ঐ পুরাণকার শাস্ত্রকারেরাই শক্তি, শ্রী, দীপ্তি, লক্ষ্মী, শোভা, সেবা, প্রভা ইত্যাদি নানারকম ভাবের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

এতো গেল একপক্ষের কথা। অপরপক্ষেও যাঁরা বলেছেন তাঁরা কম পূজ্য মনীষী নন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের রচনায় নারীচিত্রের অভাব নেই। শুধু কল্পনায়, গল্পে, সমস্যামূলক সৃষ্টিতে সবেতেই এঁরা মেয়েদের দেখিয়েছেন মানুষের সমগ্রতা দিয়েই; সীমা এঁকে কোনো রেখা মাঝখানে টেনে দিয়ে তাকে 'পুরুষের চেয়ে কম', মাত্র 'জীবদাত্রী', দুর্বল, লঘু ইত্যাদি বলে পৃথক করে দেখান নি। বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' নামের প্রবন্ধাবলীতে মেয়েদের যে একটুও উপেক্ষা করে যান নি তাই দেখা যায়।

এই পক্ষে হ্যাভেলক এলিস এত বিস্তৃত, গভীর, সব দেশ কাল নিয়ে, আবেষ্টন ঐতিহ্যের প্রভাব, বংশানুক্রম, প্রকৃতির প্রভাব, সমস্ত পৃথিবীর বর্বর ও সভ্যজাতি সব খুঁটিয়ে, প্রত্যেক দেশের মনোভাবের অপক্ষপাত সমালোচনা করে, সংস্কার স্বভাবকে পৃথক করে দেখে, যা' বলেছেন, তা' থেকে শুধু এইটুকু আমার জানা দরকার, যে "নারী স্বভাবতই একনিষ্ঠ, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতি, · পুরুষের দূরদর্শিতা তাকে কাছের বিষয়ে অন্ধ করে রাখে, মেয়েদের তৎপরতা সেই সব বিষয়ে তাকে রক্ষা করে।" এঁর মতে বর্বর নারী ও বন্য নারী নিজ জাতীয় পুরুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী, তৎপর। সে পুরুষ নয়, তাই পুরুষের চেয়ে কমও নয় বেশীও নয়।" সাইকলজি অভ সেক্স—পরিশিষ্ট)। লজ্জাশীলতার অভাবই যে নারী চরিত্রের বিশিষ্টতা সেটা তাঁর পুস্তকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওঁর ধারণা মানুষের সকলেরই লজ্জা আছে।

সোপেনহর বলেছেন, 'নারী স্বভাবত একনিষ্ঠ স্থায়ী প্রেমিক। পুরুষের প্রণয় কালে কমে যায়, অন্য রমণীতে আকৃষ্ট হয়, মেয়েদের পরিবর্ধিত হ'তে থাকে। সচ্চরিত্রা নারী যত সুলভ, পুরুষ সেই অনুপাতে দুর্লভ।' এঁর এই মত কম মূল্যের নয় নিশ্চয়।

Ludoviciও বলেছেন 'নারী একনিষ্ঠ।'

('বিচিত্রা' বৈশাখ ১৩৩৬)

মনে হচ্ছে কিসে পড়েছিলাম, হার্বার্ট স্পেন্সারের ধারণা সভ্যতার, লজ্জার, শীলতার (morality) ইতিহাসে মেয়েদের প্রভাব বড় কম নয়; এমনকি তাদের ভিত্তিস্বরূপ বলা চলে।

উল্লিখিত অভিমতগুলিতে দেখা যাচ্ছে অনেকের মত, মেয়েরা বিবেক-বুদ্ধি, নীতিবিচার, শীলতাবোধ, লজ্জাসম্ভ্রমজ্ঞান সত্যাসত্য বিচারের ধার ধারেন না। ওঁদের ধাতুতে ও জিনিস নেই। তাঁরা লঘুপ্রকৃতি, বাচাল, অকৃতজ্ঞ, জন্মসংস্কারে coquette, অনুদার, বুদ্ধিহীন, অনুকরণপরায়ণ ইত্যাদি। এক

কথায়, সংস্কারে স্বভাবে মানুষের যা গুণ থাকে, জন্মায়,—মেয়েদের তা থাকলেও 'মূলেই' সেটা নেই। স্বভাবতও তাঁদের কিছু নেই, সংস্কারতও কিছু গড়ে ওঠে নি। সংক্ষেপে—নিয়ম, নিষ্ঠা, নীতি তাঁরা মেনে চলেন শুধু 'ভয়ে ভক্তিতে'। অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের উপদেশের মতে 'নিত্য তাহা অভ্যাস' করেই তাঁরা নীতিবর্জিত না হয়ে সংসারধর্ম পালন করছেন। সেটা তাঁদের অভ্যাসের দোষ, স্বভাবের গুণ নয়। সবশুদ্ধ এই মত।

অন্যপক্ষে ঐ সব মতবাদীরা এ বিষয়ে সকলে প্রায় একমত যে, মেয়েরা by nature monogamic একনিষ্ঠ, বা এক-পরায়ণা।

আমাদের সমস্যা এই—

(১) যদি মেয়েরা non-moral, শীলতার instinct অবধি তাদের নেই (প্রাকৃতিক নিয়মে তাই বলে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে), পক্ষান্তরে তারা স্বভাবতই (monogamic) একনিষ্ঠ (পণ্ডিতেরা বলেছেন),—তা'হলে আসলে তারা কি? কোন্ নিয়মে তাদের নীতিপরায়ণতা অপরায়ণতা বিচার করা হবে? অভ্যাসের মানে তা'হলে কি হয়? যে স্বভাবতই নিষ্ঠাপরায়ণ তাকে কি অভ্যাস করতে হয়,—না স্বতঃই প্রবণতা থাকে? এবং মতগুলো পরস্পরকে খণ্ডন করেছে কিনা?

(২) নীতিজ্ঞানহীন হয়েই যারা সহজে, স্বচ্ছন্দে, পরিপূর্ণ প্রেমে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়—নীতির সমস্ত বিধান মেনে চলে, আর অনেকে যারা মেনে চলে না ও তার জন্য দণ্ডিতও হয়;—তারপরেও চিহ্নিত হয়ে পড়ে থাকে,—সম্ভবত সমাজের সেবাও করে থাকে;—এই দুশ্রেণীর নারীর স্বভাববিচারের মানদণ্ড কি? যদি নীতিজ্ঞান না থাকলে নেই বলা যায়, তবে থাকলে তা মেনেই বা নেওয়া কেন হবে না?

তাদের 'মূলে নেই নীতি' স্বভাবের উপর নির্ভর করেই—তাদের উপর নীতি-পালনের ভার ষোল আনা দেওয়া হয়। এবং এই Morality পালনের গুরু-ভারের দিকটা থাকে তাদের পাল্লাতেই। আর কোনো instinct সংস্কার অবধি না থাকা সত্ত্বেও—তারা সেটাকে সহজে, স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে পালন করে। এবং স্থানভ্রষ্ট হলে, আশ্রয়-চ্যুত, সমাচ্যুতও হয়। সমস্যা এই, এ দু-শ্রেণীকে এক বিশ্লেষণে এক সংজ্ঞায় শুধু একজাতীয়া বলেই অলঙ্কৃত করা যায় কি?

(৩) শিশুর কাণ্ডজ্ঞান নেই, সংস্কার নেই, অপরাধও ধর্তব্য হয় না। যে জন্মগত সংস্কারে (non-moral) শীলতাজ্ঞানহীন, অনীতি-পরায়ণ, এমন কি ও-সকল বিষয়ে ধারণাবিহীন তার দ্বারা সেই (ক) নীতি-পালনের প্রত্যাশা, (খ) নীতিভ্রষ্ট হলে গুরুদণ্ড-বিধান, ধিক্কার, ত্যাগ, (গ) আবার সমাজের সেবাই তার উপযোগিতা আছে বলে ধারণা এবং তার সেবা গ্রহণ, কোন্ নীতি অনুসারে উচিত? যার অপরাধের সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই, দুর্নীতি-সুনীতি জ্ঞানে

শিশুর মত যে সংস্কারমুক্ত ;—অথচ তা' পালন করে থাকে ; সদসদ্‌জ্ঞানহীন হলেও সততার সতীত্বের মর্যাদা রাখে—তাকে তার যা' প্রাপ্য সম্মান তাও দেওয়া হয় না, আবার 'ভীরু অভ্যাসমাত্রপালিকা' খ্যাতি-টাও তার লাভ হয়। এ অবস্থা একটি রহস্যের মতই মনে হয়।

(৪) বাহুবল, দৈর্ঘ্য প্রস্থ, তন্নিমিত্ত জয়-পরাজয়, অধীনতা-স্বাধীনতা ইত্যাদি নরনারীর সম্বন্ধের ভিত্তির মধ্যে নেই। সমস্ত পৃথিবী জয় করে এসেও মানুষের চিত্ত 'একটি প্রেমের পায়ে দিনশেষে নতশির' হতে না পেলে সব ব্যর্থ, মিছে মনে করে। নারীর চিত্তও পূর্ণতা, প্রাচুর্য, আনন্দ, সমৃদ্ধি, সমস্যার মাঝ থেকেও সেই বন্ধন ও আত্মসমর্পণের লোভ ছাড়িয়ে উঠতে পারে না, জীবনই শূন্য রয়ে যায়। আর নখী, দন্তী, শৃঙ্গী প্রভৃতির মতন—নারী পুরুষের জাত আলাদা নয়—ঠিক ছুটে পালাবার মতন—বা শাস্ত্রোল্লিখিত ব্যবধানে থাকার মতন ; এক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষে সবচেয়ে বড় জিনিস পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ হওয়া। এবং তাও নির্বিচারে। একের আকর্ষণ পৌরুষে, অন্যের কমনীয়তায়। মুগ্ধতাই শেষকথা। বলশালিতার প্রসঙ্গে বলা যায়—এ পর্যন্ত শালপ্রাংশু মহাভুজা কোনো নারী কোনো পুরুষকে পরাস্ত করে হৃদয়-বিজয়িনী হন নি ; অপরপক্ষে কমনীয় সুন্দর কোনো পুরুষও নারীর কাছে প্রশংসিত হন নি।

ক্ষমতা, শক্তিশালিতায় গামা গোবর প্রভৃতি মল্লেরা সাধারণ যুবকদের চেয়ে অনেক পরিমাণে শক্তিশালী। সাধারণের মধ্যেও অল্পাধিক বলিষ্ঠ এবং ক্ষীণবল আছে, মেয়েদের মধ্যেও সে তারতম্য বর্তমান। তা'হলে যখন দেখা যাচ্ছে, বলশালিতায় সকল মানুষ সমান হয় না, তখন খামকা প্রবল-দুর্বলের কথা ওঠার কোনো অর্থই হয় না। বলের দ্বারা মানুষের কতটুকু জয় করা যায় ? নরনারীর সম্বন্ধ তো এ-নিয়ে নয়ই। মানবেতর প্রাণীরও এ সম্বন্ধ বাহুবলের মধ্য দিয়ে নয়।

স্বভাব বা প্রাকৃতিক বিধান মানুষ কখনো মেনে চলেও নি—চলবেও না। সে চিরকাল মেনে এসেছে নিজেকে, নিজের ইচ্ছাশক্তিকে, বিবেককে,—স্ব'কে। তাকে সে গড়েছে, ভেঙেছে, মেনে চলেছে, অবজ্ঞা করেছে এই হোল তার স্বভাব, তার প্রকৃতি। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সে বিষয়ে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। পুরুষের ego বেশী নারীর কম, তাই বলে পুরুষের egoর লক্ষ্য স্বার্থপরতা নয়, মেয়েদেরও ভয় ভক্তি নয়, উদ্দেশ্য লক্ষ্য একই দু'য়ের—প্রেম ও ত্যাগ, প্রাকৃতিক জগতের স্বপ্নেও যা নেই,—কখনো থাকবেও না বোধ হয়। এই নিয়ম, নীতি, নিষ্ঠার প্রেরণা মানুষের অন্তর থেকে পাওয়া। তার সুখদুঃখ আনন্দ দায়িত্বও দুজনের কাঁধে আছে। অথচ সেই বিষয়েরই বিচারশালার সিদ্ধান্তে সেটা পুরুষের হয় সহজাত সংস্কার,— প্রাকৃতিক দর্শন মানবেতর জন্তুর স্ত্রী-প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে

superficial, non-moral ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয় মেয়েদের। যদিও moralityর বেশী দায়িত্ব সহজে নেয় ঐ non-moral জাতেই।

রাজপুত্র বুদ্ধ জগতের জন্য সর্বত্যাগ করেন, মায়ের নয়নের মণি শচীদুলাল প্রেমের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, খ্রীষ্ট প্রেমের জন্য ধর্মের জন্য ক্রুশবিদ্ধ মরণ বরণ করেন। এঁরা সব লোকোত্তর পুরুষ, মহামানব, দেবতা। সতী, উমা, সীতা এঁরা রাজকন্যা, রাণী মীরাবাঈ, গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা এঁদের ত্যাগ সহিষ্ণুতা প্রেম কোন্ মানদণ্ডে বিচার হবে? মহামানবতার তো কিছুই এঁদের জাতে নেই। কোন সংস্কার এই ত্যাগ এই নিষ্ঠাগভীর মধুর ত্যাগধর্মী প্রেমে সীতা সতী মীরাবাঈকে অনুপ্রাণিত করেছিল, মীরাকে বৃন্দাবনের পথে পথে "মেরে গিরিধারী লাল ঔর দুসর ন কোই" বলে নিয়ে বেড়িয়েছিল, বিষ্ণুপ্রিয়ার স্তব্ধ মূক বেদনাকে বহন করেছিল? একেই বা কোন্ পর্যায়ে ফেলা যাবে?

যে অজ্ঞাতপিতৃক সন্তানের জননীর কথা সমস্ত পাশ্চাত্য জগতকেও আশ্চর্য করে দিয়েছে তিনি 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের মতন 'বিধর্মী' 'অমাবস্যার চাঁদ'। এইটুকুই তাঁর ঠিক সংজ্ঞা। আর ওরকম অমাবস্যার চাঁদ যে নিত্য উদয় হয় না এও সত্য। সম্ভবত তিনি প্রকাশ্যে যা বলেছেন তা ঠিক তাঁর অন্তরের সত্য নয়।

শ্রীঅষ্টাবক্রের কথার উত্তর আছে। মেয়েরা 'মা' চিরদিন থাকবেন, আছেনও। পুরুষ তার পর্বত প্রমাণ আত্মম্ভরিতার আড়াল থেকে মাকে দেখতে না পেতে পারে, প্রণাম করতে ভুলে যেতে পারে। সভ্যতা সমাজ সংসার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; সংশয়ের অন্ত নেই। মা, দয়িতা, দুহিতার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক দয়া দাক্ষিণ্যেরও নয়, বিচারেরও নয়। মানুষের পরিচয়ের সোনার কাঠি মানুষের হাতে নেই। প্রত্যেক আবেষ্টন, মনের তারে প্রতিটি আঘাত, এক এক বারের স্পর্শ তাকে ক্রমাগত নতুন করে তোলে। মেয়েরাও এই মানুষই। সমাজ-বিজ্ঞানে মনো-বিজ্ঞানের এখনো এটা জানা বাকি আছে। অনেক সময় তাঁরা যা বলেন তা শুনে মেয়েরা আত্মবৎ মন্যতে জগৎ বলে চুপ করে থাকেন। মেয়েদের কথা মেয়েরা জানেন ততটাই, পুরুষ যতটা নিজেকে জানেন। প্রভেদ শুধু ভাবে, প্রকাশের ধরনে।

কবি চণ্ডীদাসের গীতকথা আছে "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। যদি এই মনোভাব নিয়ে, অথবা Havelock Ellis-এর মতন মায়ে যেমন সন্তানকে স্নেহ মুগ্ধ ভালবাসায় নিরীক্ষণ করেন তেমনি করে কেউ অভিমত দিতে পারেন তাঁরই চরিত্র বিচারের অধিকার থাকে।

বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৩৬

সংস্কার মানুষের আছে, থাকেই।

বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ,—বহুবিবাহ—বিধবা বিবাহ—বাল্য বিবাহ—ইত্যাদি প্রসঙ্গে তো কর্তা-সংস্কার আর তাঁদের ইহকাল পরকালের অভিভাবকরা। সংস্কার যা' বলেন অর্থাৎ কর্তারা যা বলেন তাই 'করা' নিয়ম।

পরীক্ষা ও বিচার চলছে ঐ মেয়ে নামীয় পদার্থের ওপর, বহুদিন যুগযুগান্তর কাল ধরে। কথাগুলো শুনলে নির্বোধরা রাগ করেন, বুদ্ধিমানরা বলেন, 'আমরা তোমাদের ঠকিয়ে এসেছি চিরদিন? কেন করতে দিয়েছিলে? তোমরা 'বণিকের মানদণ্ডকে পোহালে শর্বরী,—রাজদণ্ডরূপে' নিজেরাই নাওনি? নিজেদের আরামের বিলাসের, স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধার জন্য?' 'কাঁকন' 'লোহা' 'কাজল-লতা' নিয়ে, একরাশি স্বাচ্ছন্দ্য, দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে, অবাক হয়ে বসে থাকে তারা,—জবাব আসে না মুখে। মনেই পড়ে না, কিছু জবাব আছে। গাড়ী ঘোড়া, মোটর, অষ্টাঙ্গে সোনা রূপা কি নেই আমাদের? অভাব কি? 'সর্ষেপড়া দেয় না মাথায়? যেন সেই 'সর্ষেপড়া' পেয়ে চুপ করে যায়,—কথাও বেরোয় না।

সরকারের কাজের একটা মস্ত খুঁত আছে সেটা ধরি কিন্তু. সে কথা যাক। আদমসুমারীর রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই, বাঙলাদেশে লাখ কতক বিধবা আছে তার মধ্যে ১।২।৩।৪।৫ থেকে ৯০ বছর অবধি বয়স পাওয়া যায়। কেউ বলছেন তাকে ভালো,—কেউ বলছেন তা মন্দ,—কেউবা কিছুই বলেন না। থাক গে। সরকারের ও রিপোর্টটার দোষ ধরিনি, ওটা নিখুঁত।

কিন্তু ওরা ছাড়া বাকি লক্ষ লক্ষ সধবা আছে,—বিবাহিতা আছে,—তাদের হিসেবেই গোল রয়ে যাচ্ছে চিরকাল ধরে। আসছে বারে যেন ঐ ত্রুটীটুকু সেরে নেন।

সেটা হচ্ছে, ঐ বিবাহিতাদের মধ্যে কতগুলি পরিত্যক্তা তার হিসাবটা সরকার বাহাদুরের কৃপায় যদি আলাদা করে লেখা হয়।

ঐ বিধবাও নয়, সধবাও নয়,—কুমারীও নয়, পিতৃ-অন্নভুক্ বা পিতৃকুলের ভিক্ষান্নভুক্, সিঁদুর লোহাভূষিতা সসন্তান অথবা নিঃসন্তানা যে জীবগুলি, তাদের সংখ্যা আলাদা করে তালিকায় যদি প্রকাশ করা হয়, দেখা যাবে লক্ষাধিক ঐ 'কেউ নই' শ্রেণীর জীব পাওয়া যাবে। যাঁদের স্বামীরা আবার কেউ বিবাহ করেছেন, কেউ করেন নি, কেউ কিছু, কেউ অন্যরকম—সব আর বলার প্রয়োজন দেখি না।—ওঁরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন—যেমন পাঁচ জনে করে। ঘরে

তাঁদের অন্নবস্ত্র থাকে। কিন্তু ওই যে ওঁদের একদিন উৎসব করে ঘোষণা করে ও হস্তান্তরিত করে একটি জীবকে ঘরে আনা হয়েছিল সেটির সঙ্গে ওঁরা যে সম্পর্ক তুলে দিয়েছেন তার কথা গাঁয়ে ঘরে সবাই জানতে পারে,—সমাজেও হয়ত টের পায় ;—কিন্তু কেউই জানে না। অর্থাৎ লজ্জিত করবার মতন করে ধিক্কৃত করবার মতন করে—কেউ জানতে পারে না। যেহেতু আমাদের সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ নেই। গর্ব করে ঘরে বাইরে দেশ বিদেশে আমরা জানাই, আমাদের সমাজে বিবাহ আছে বিচ্ছেদ নেই ;—আজীবন—আমরণ আমরা ওকে বেঁধে রাখি।

হাততালির অভাব হয় না ঘরে বাইরে।

শুধু সেই শাঁখা সিঁদুর পরা—শির বেরকরা বাসন মাজার ছাই লাগা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কড়াপড়া হাতে কারা একবার চুপি চুপি চোখ মুছে নেয়। 'মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না।' আদর্শ তো আছে একটা ;—এই জীবনটাই কি সব! মনে মনে বিধাতাকে গাল দেয়।

এই একটা জিনিস কিন্তু কারুর চোখে পড়ে না, পড়েনি, সেটা হচ্ছে ঐ বিবাহচ্ছেদ আছে এবং সে পুরুষগুলি 'পৌরুষ তান্ত্রিক' নীতিচর্যা এবং পছন্দ নির্বাচন এবং সুবিধা সুযোগ নিয়ে বিবাহচ্ছেদান্তে জীবধর্ম পালন করছেন।

যাক, তাঁরা যা ইচ্ছে করুন না করুন আমার কিছু বলবার নেই ;—আমার বক্তব্য হচ্ছে বিবাহচ্ছেদ আছে। মেয়েরা দোষ না করে বিনাদোষে, অকারণে, এমনি পরিত্যক্তা হয় ; প্রহৃত, অপহৃত হলে পরিত্যক্ত হয় ; লোকাপবাদে, কুলাপবাদে কুলদোষে পরিত্যক্তা হয় ; অবাধ্যতায়, রূপহীনতায়, পিতার অর্থহীনতায়, পিতার ঔদ্ধত্যে পরিত্যক্ত হয়। অনেক সময় সন্তানশুদ্ধ, অনেক সময় বালিকা অবস্থায়। তার সন্তানের ভাবনায় স্বামী বা তাঁর বাড়ীর কারুর দায় থাকে না ; সন্তান না হলে সেই বালিকা হতভাগিনীর জন্যও কারুর মাথাব্যথা হয় না।

দেখা যাচ্ছে বিবাহচ্ছেদ আছে যদি তবে এত তর্ক বিতর্ক কেন?—পুরুষরাও তর্ক করেন স্বপক্ষে বিপক্ষে ; মেয়েরা সব সময়েই প্রায় বিপক্ষে ; ওঁদের বোধহয় যুক্তি কলসীর আঘাতকারীর সঙ্গে প্রেমের মত। এবং চিরদিন কলসীর কানার আঘাত খেয়েও থাকেন।

বিবাহ সম্বন্ধে এক পক্ষের বহু বিবাহ, পরিত্যাগ করে বিবাহ, মৃত্যুর পর বিধবা হতে কোনো বাধা নেই। তাতে নারীর অমর্যাদা, তার কষ্ট, তার মৃত স্মৃতির অসম্মান করা হয় না। কিন্তু তর্কের আসরে উৎপীড়িতার বা পরিত্যক্তার জন্য ছেদ প্রথার কথা উঠলে নানা উত্তরে অত্যুচ্চশিখরস্পর্শী কিংবা উত্তুঙ্গ আদর্শের গৌরীশৃঙ্গের ব্যাখ্যায় দেশ মুগ্ধ হয়ে যায়। জীবন তো এইটেই নয়। 'সে মন্দ বলে তুমি মন্দ একি আদর্শ হ'ল ইত্যাদি।

আদর্শ যাঁরা মেনে চলেন, চলতে বলে সুখী হন ; তাঁদের কথা আমরা বলতে

বাসিনি। আমাদের চোখে পড়ে পরিত্যক্তার দাসত্ব জীবন, নৈতিক জীবন; আর অনেক সময় একেবারে নিরন্ন অবস্থার ফেরেই ঐ নৈতিক দুর্গতি। যা' হয় তা স্বামী সন্তান থাকলে হ'ত না ; অথবা অন্নচিন্তা অস্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে ঘট্‌ত না। কখনো বা দেখা যায় সে অসহায়, কখনো বা প্রলোভিত করা হয়, কখনো বা আপনি স্বভাব বশে দুর্নীতির পতনের পথে নেমে যায়।

অনেকে যুক্তি দেখান, সাধারণতঃ গড়ে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে বাস করে। দুজন দুর্জন হলে ২০ জন সজ্জন। সে ক্ষেত্রে এই রকম যদি "বিবাহচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত হয় তাতে অনেক সময় সামান্য কারণে য়ুরোপ আমেরিকার মতন অবাধে এই জিনিসটি ঘটতে থাকবে।" এবং তাতে সংসার নীড়ের শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

অপর পক্ষেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। মেয়েরা সাধারণতঃ সজ্জন। ২০ জনে পাঁচ জন অসজ্জন অর্থাৎ শতকরা ওরা কুড়িজন দুর্জ্জন হতে পারে এরা একজনও হয় কিনা সন্দেহ। এবং নীড় আর স্বামী সন্তান প্রীতি, আর পুরাতন নিষ্ঠা মেয়েদের মনে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী, অনেক গভীর। সংসার যাত্রার পরে লোভ ঝোঁক ও তাদের খুব বেশী। সে ক্ষেত্রেও সামান্য কারণে, অকারণে, যখন তখন তাকে ত্যাগ করে—'চ্ছেদ' হীন বিবাহ বন্ধনের অপর নিশানা থেকে অপর পক্ষ নতুন প্রীতিতে, সখে নতুন জীবনের সন্ধানে যান ; আর পরিত্যক্তার সংসার নীড়ের শান্তি তো দূরের কথা, অন্নজলও তাদের দুর্ল্লভ থাকে, যখন তাদের অকারণে কারণ সহ, (ওপরে বলে এসেছি সব) তুচ্ছ কারণে, খেয়ালে, ত্যাগ করার যুক্তির ক্ষেত্রে ঐ কথাই কি বলা যায় না যে, 'চ্ছেদ'টি ঘট্‌তে দিলে অল্পকারণেই তা ঘটতে থাকে ! আর সচরাচর 'বিবাহ বিচ্ছেদ' নয় 'স্ত্রী পরিত্যাগ' (কাঁঠালের আমসত্ত্ব !) ঐ রকম তুচ্ছ কারণেই করার চলন আছে।

যাই হোক, তাকে তো বিলেতি বিবাহবিচ্ছেদ বলা যায় না ; আমাদের সান্ত্বনা আছে !

আইন নামক বস্তুটিকে এসব বিষয়ে এই বিষয়ের কর্তৃপক্ষরা মানতে নারাজ ; অপছন্দ করেন।—ওঁদের ধারণা আইন থাকলে এর sacredness অথবা গাম্ভীর্য পবিত্রতা মাধুরী নষ্ট হয়ে যাবে। চুপি চুপি স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে হয়ত সেটা থাকে।

সাধারণ পরিণাম আর পরিণতি কি হয় এই বিষয়ের সচরাচর তাই দেখা যাক। মেয়েরা পরিত্যক্তা হয়ে সমস্ত পরিজনের পায়ের নীচে থাকে ; দীনতা হীনতা স্বীকারের শেষ থাকে না। সসন্তানারও ওই অবস্থা, তবে সে আশা করে একদিন সংসার আবার গড়ে তুলবে, যদি ভগবান দৈব সহায় হন। কিন্তু নিঃসন্তানারা বেশীর ভাগ নানা রকমে ব্যতিব্যস্ত প্রলোভিত হয় ; হয়ত সামাজিক ভাবেই দুর্নীতি পরায়ণ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় ; অনেক সময়ে যে এটা সসন্তান

মেয়েদেরও ভাগ্যে ঘটে না তা নয়। অনেক সময় তারাই পরিজনের পীড়নে নিজের দুর্বলতার মোহে কড়া থেকে আগুনে ঝাঁপ দেয় একেবারে, পথের মাঝে এসে পড়ে তা ছাড়া আর্থিক বিষয়ে এরা একেবারে নিরুপায়। দু'চারখানা অলঙ্কার কিংবা সামান্য দু'পাঁচশো টাকা। তাও সদয় স্বজনগণ সে ভার মুক্ত করে দেবার চেষ্টা করেন। এদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই, অধিকার নেই।

আইন আছে যে নিরপরাধা মেয়ে, পরিত্যক্ত হলে সে যদি অসৎ না হয়, তো গ্রাসাচ্ছাদন সে পেতে পারে। যাক্, আমি ভাবি সে নিরপরাধা হল যদি, তো পরিত্যক্ত হবে কেন? মানুষের জীবনে প্রয়োজন গ্রাস এবং আচ্ছাদনের আছে মানি, অত্যন্ত প্রয়োজন তাও জানি; কিন্তু তার যদি স্বামীর সমস্ত অভাব পূরণ করবার ক্ষমতা থাকে সে পরিত্যক্তা হতেই বা যাবে কেন? রূপ না থাকলেও তার স্বামী সন্তান নিয়ে ঘর করবার সাধ থাকতে পারে, থাকা উচিত। এর স্বাভাবিক জবাব পাওয়া যায় না, কেননা, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। এবং আইনের মতে সে ঐ অশন বসন পায় কিনা, দেওয়া হয় কি না তাও অবশ্য ঠিক নেই। সবচেয়ে সুবিধা পরিত্যক্তার অপরাধ কি তা' বলবার দরকারও করে না। কর্তার ইচ্ছে,—পছন্দর ওপর কথা নেই। শুধু দেখি, উৎপীড়িতা, বিবাহক্ষেত্রে উৎকোচের অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ ঘরের কুমারী ও বিবাহিতা কিংবা অপহৃতা, পতিতা এই পাঁচ শ্রেণীর পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসে দেশ শব-সাধনা করে আধ্যাত্মিক মোক্ষ লাভের ধ্যানে মগ্ন; তার মাঝখানে যে কটি পারে পৌরুষ-ভদ্রতায় দিনগত পাপক্ষয় করতে পরে। ঐ প্রত্যেকটির দুর্দশার প্রতিকারের জন্য আইন নেই, ভদ্রতা নেই, সাহায্য নেই। বিজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিদ্ লোকে বলেন, 'সব কিছুতে আইন আনলে অত্যন্ত বিশ্রী লাগে।' তা লাগে। কিন্তু ভায়ে ভায়ে বিবাদে তো আইন বাদ দেন না? বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি ছাড়েন না। আইনের সাহায্য দরকার হয়—মানুষের বিপদের সময়ে,—প্রয়োজনের সময়ে,—অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য; মানুষ যখন খোস মেজাজে, বাহাল তবিয়তে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে তখন সে কোন কথাই ভাবে না। আমরা যে কথা বলছি—যাদের জন্য-তারা স্বামী সৌভাগ্য ব ন্তা, সোহাগিনী, সুখী মেয়ের কথা নয়—যারা ঐ চুপি চুপি পরিত্যক্তা হয়ে নানাবিধ ভাবে কষ্টে জীবন যাপন করে—অনেক সময় নিজের মর্যাদাও রাখতে পারে না। এবং সমস্ত সমাজ তার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ দরকারও মনে করে না। আর পরিত্যাগকর্তার মা বাপ উদ্যোগী হয়ে কিংবা সে নিজে উদ্যোগী হয়ে পুনশ্চ বিবাহ করে। মস্ত সুবিধা, এদেশে আবার বহুবিবাহ সিদ্ধ। ওসব প্রতীচ্য দেশে আবার বহু বিবাহের সুবিধা নেই। তারপর প্রয়োজন হলে পরিত্যক্তাকে সেবার্থে আনাও যায়; মৃত্যুর পর তার তুচ্ছ অলঙ্কারকটিও নেওয়া যায়। সে যে 'সালঙ্কারা সম্প্রদত্তা' হয়েছিল! তাতে অধিকার আছে!

বোধহয় মেয়েদের জন্য আইন নেই। অনেকে বলেন অল্প সংখ্যক পরিত্যক্তার

বা উৎপীড়িতার জন্য এত আন্দোলন আলোচনা দরকার করে না। হয়ত না কিন্তু আমাদের মত এই এবং সেটা আইন হওয়া উচিত, যে ঐ অল্পসংখ্যক স্বামী ব্রহ্মচর্য-পালন করবেন কঠোরভাবে।—বিবাহচ্ছেদ যদি একেবারে না থাকত—আমাদের বলবার কিছু ছিল না—বিবাহিতারা আমরণ নিজেদের শপথ প্রতিপালন করতেন। এদেশে একতরফা বিবাহচ্ছেদ আছে, এত সহজে, ঠিক প্রতীচ্য দেশের মতই সহজে কিংবা তারও চেয়ে বেশী সহজে; কেন না সেখানে স্ত্রীকে বা স্বামীকে ছাড়াছাড়ির কারণ দেখাতে হয় কোর্টে। এখানে তার কোনো প্রয়োজন হয় না—আমার 'পছন্দ' হ'ল না, কিংবা আমার পিসিমা মাসিমা মা বাপ বোনের ভাইয়ের 'ইচ্ছা' নয় আমি ওকে নিয়ে ঘর করি। কখনো সে কালো, কখনো শিক্ষিত, কখনো অশিক্ষিত, কারণ নেই, যুক্তি নেই, কৈফিয়ৎ-এর প্রয়োজন নেই, আবশ্যক নেই; শুধু গাড়ীব মাথায় বাক্স চাপিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে পাঠান বা পিত্রালয়ে আসার পর আর খবর না নেওয়া; উদ্দেশ্য সিদ্ধ। যথাকালে 'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিমন্ত্রণ' পাবেন পিতৃকুলের সবাই 'শুভ কার্য্যটি সবান্ধবে' সম্পন্ন করে যাবার।—

আমাদের কিন্তু সান্ত্বনা আছে যে এটি খাঁটি দেশী জিনিস, পিলে লিভার ম্যালেরিয়া কালাজ্বর বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মতন একেবারে স্বদেশী ব্যাপার; বিলেতী নাম গন্ধ নেই। যদি ওটি ডাইভোর্স হত, অথবা 'বিলেতী বিচ্ছেদ' না হয়ে মুসলমানী 'তালাক' হত, তাহলে এমন দেশী ভাবটি থাকত না।

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রস্তাবটি মহিলাদের কলিকাতা কংগ্রেসে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বরোদা রাজ্যে প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত করেছে। তাঁরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। আমাদেরও খোঁজ করে দেখা উচিত। ঐ রকম কত মেয়ে পল্লী পিছু আছেন, এবং কি তাঁদের অপরাধ, তাঁদের স্বামীরা কি কারণ দেখান; এবং কি তাঁদের জীবিকা, অভিভাবক কেউ আছেন কি না, স্বাবলম্বী হবার মত কোনো শিক্ষা উপায় জানেন কি না, নৈতিক সম্মানে রাখবার মত অবস্থা কিনা—সব।

এবং কঠোর আইন হওয়া উচিত কোনো পুরুষ স্ত্রীকে নিরর্থক ত্যাগ করে বিবাহ করতে পারবেন না। নইলে বিবাহচ্ছেদ ঐ 'সোনার পাথর বাটি' হয়ে—সমাজে সম্মানিত হয়ে থাকবে। এই শ্রেণীর 'সহজ ত্যাগ প্রথা' ও সমাজে কত অনাচারের সহায়তা করে সমাজপতিদের তা' জানা আছে।

জনকতক দুশ্চরিত্রের জন্য পতিতা সমর্থন, জনকতক খামখেয়ালীর জন্য পরিত্যক্তার দল, সেন্টিমেন্টের জন্য নানাবিধ অত্যাচার সহিষ্ণুতার উচ্ছেদ না করলে এই দুর্ভাগা দেশের 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' এমন দিন আসবে। স্বপক্ষের অন্যায়ের সমর্থন যাঁরা করেন তাঁরা ভুলে যান তার মূল্য দিতে হবে।

স্বদেশ, কার্তিক, ১৩৩৮

অসবর্ণ-বিবাহ

ক'বছর ধরেই এই জিনিসটা নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমতের জন্য বহু আলোচনা হয়ে গেছে ; এবং আইনও পাশ হয়েছে। বিধিটা খুব মনোমত হয়নি—সাম্প্রদায়িক ও ধর্মমতের ভেদস্থলে। তাই কখনো সুবিধে হিসেবে চলেছে, আবার—চলেওনি।

বিবাহ বিষয়টা সবটাই তো এক সংকল্পে হয় না। ও জিনিসটা কোন দেশে পূর্বরাগ, কোনদেশে অনুরাগ, সুবিধে, সংস্কার জড়িয়ে চলে। কাজেই তার সম্বন্ধে চট্‌ করে একটা কথা বলা যায় না ; আর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত বিষয় বলেও সবাই মেনেও নিতে পারেন না।

কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ওটা আমাদের দেশে ছিল। পৌরাণিক শাস্ত্র সংহিতা উদ্ধৃত করে সংস্কার ক্ষেত্রে যাঁরা সব বিষয়ে নিজেদের নিশ্চিন্ত করতে চান, তাঁরা অসবর্ণ-বিয়ে সেকালের দেশে কালে এবং পাত্রে অজস্র দেখতে পাবেন।

সেকালের শাস্ত্রে লোকাচারে দেখা যায়, হিন্দুদের আট রকমের বিবাহপ্রথা ছিল—আর্য, ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, পৈশাচ, পাশব, আসুর ও রাক্ষস। এর মধ্যে প্রথম চারটি ভদ্রসমাজের যোগ্য এবং চলিতও ছিল। আর্য, ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য—এই তিন রকমের বিয়ে, মা-বাপের মতে দান-সম্প্রদান হিসেবে চলিত ছিল—যেমন, সালংকারা কন্যাদান, পুণ্যার্থে কন্যাদান ইত্যাদি। গান্ধর্ব-বিবাহটা পাত্র-পাত্রীর নিজের মতে স্বেচ্ছায় হত। পুরাণে এসব বিয়ের কথা দেখে থাকবেন অনেকেই। শেষ চারটি যাকে বিবাহ বলে ধরা হয়েছে, আসলে সেটা হচ্ছে হরণ বা অপহরণ, কন্যাকে জোর করে চুরি করে পাত্রের ঘরে নিয়ে যাওয়া। ওটাকে বিবাহ বলা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় যে, অপহরণ করে নিযে গিয়ে তাকে অনায়াসে অবশেষে পরিত্যাগ করা থেকে—সামাজিক মৃত্যু থেকে—রক্ষা করার জন্য। শাস্ত্রতঃ তাই তার সন্তানকেও পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রথা ছিল।

শেষ চারটির কথা থাক। প্রথম চারটিতেও তিন রকম ভাগ ছিল, (১ম) সবর্ণ-বিবাহ, (২য়) অনুলোম, আর (৩য়) প্রতিলোম। অনুলোম হচ্ছে—উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের মেয়েকে বিবাহ করা ; আর প্রতিলোম হচ্ছে, উচ্চবর্ণের মেয়ের নিজের চেয়ে নিম্নবর্ণের পাত্রকে বিবাহ করা। সবর্ণ মানে তো জানাই আছে, স্বজাতে বিয়ে।

এই সব বিবাহপ্রথা কবে অবধি, অর্থাৎ কতদিন আগে পর্যন্ত, আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তা' ঠিক বলা যায় না ; কেননা, সেকালের কাব্য, কাহিনী, কথা থেকে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়,—অসবর্ণ তো দূরের কথা, সবর্ণ-বিবাহও বিভিন্ন প্রদেশীয়ের মধ্যে চলিত ছিল না এখনকার মতনই। যেমন, পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের সঙ্গে নাগপুরী ব্রাহ্মণের, দক্ষিণী ব্রাহ্মণের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণের, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে কনৌজী ব্রাহ্মণের, বাঙালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে অবাঙ্গালী ব্রাহ্মণের। এর উপরে আবার বারেন্দ্র, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী তো আছেই জানা কথা। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি শুধু ব্রাহ্মণ বলে লিখলাম, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতী''র মধ্যেও ঠিক ঐ প্রথা আছে। কালক্রমে এক দেশে বাস করলেও এদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানের প্রচলন হয় নি।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, সবর্ণ-বিবাহও এখন আমাদের দেশে সব জায়গায় চলিত নয়। অথচ সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ বা সংহিতা ঘাঁটলে দেখা যায় যে, সেকালে আমাদের দেশের বিবাহপ্রথা য়ুরোপের বা মুসলমান সমাজের মত না হোক্—নানাজাতি ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও খুব বৃহৎ পরিসর নিয়ে প্রচলিত ছিল। সেকালের সংহিতা মতে যে সব বিবাহ সম্প্রদান বা কন্যাদান হিসেবে চলত, যেমন, প্রজাপত্য, ব্রাহ্ম, আর্য, তাতে অনুলোম-প্রতিলোম সবর্ণ-অসবর্ণ সমস্যা তোলা বড় একটা হতোনা। ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়েরা কন্যাদান করেছেন, ব্রাহ্মণকন্যা অন্যজাতিকে বরণ করেছেন। গান্ধর্ব বিবাহে তো নানাজাতের পাত্র পাত্রীর স্বমতের কথা। আর যদিও সবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রের মতে প্রশস্ত, কিন্তু অসবর্ণকেও অসিদ্ধ তাঁরা বলতেন না। প্রজাপত্য, ব্রাহ্ম, আর্য, এই যে কটি বিবাহপ্রথা, যা মা-বাপ স্বজন গুরুজনের মতে হ'তো,—তাতেও সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ; কিন্তু অসবর্ণাও সিদ্ধ। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথা থেকে আমরা যা দেখতে পাই, তাতে বোঝা যায় যে, শাস্ত্রের মতামতে তখন কিছু যেতো আসতো না। আসলে লোকাচার ও দেশাচার অনুসারেই শাস্ত্রসঙ্গত সবর্ণ-বিবাহ আর অসবর্ণ-বিবাহ হতো এই দুয়েরি আজকাল চলন নেই। যদি সবর্ণ-বিবাহ চলত, বিভিন্ন প্রদেশীয় ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা থাকত না ; আর যদি অসবর্ণ-বিবাহ চলত, তা'হলেও এক-দেশবাসী এক-ভাষাভাষী ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে বৈবাহিক আদান-প্রদানে শাস্ত্র বাধা দিতেন না। কেননা ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রী, ক্ষত্রিয়া পত্নী, আর অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণী ও অন্যবর্ণা পত্নীর কথা দর্শন-পুরাণে দুর্লভ নয় ; এবং শাস্ত্রবিধানে তাঁদের সন্তানদের অশৌচ দায়ভাগের ব্যবস্থাও সুলভ। এক কথায় বর্ণভেদ যেটা এখন আছে, রয়েছে—সেটা সেকাল-কার বা শাস্ত্রমতের নয়। এটা কবে হয়েছে তাও জানা নেই, কিন্তু মেনে নেওয়া হয়। দেখা যায়, অসুবিধা বা সুবিধার দিক দিয়েই যে লোকাচার আর দেশাচার গড়ে ওঠে, এও একটা সত্য। তার দিকটা দেখে সেটা বদল করা যায় কিনা সেইটিও ভাবা দরকার। যখন কোনো নিয়ম প্রথা গড়ে ওঠে বা ভেঙ্গে যায়,—তার ভেতরের

কথা হচ্ছে মানুষের নিজের প্রাণের দরকারের তাগিদ। দরকারে যা গড়ে ওঠে, আবার দরকারেই তাকে ভাঙতেও হয়। অনেক অসুবিধা যে প্রথাকে ত্যাগ করিয়েছিল, যেমন, যানবাহন, দারিদ্র্য, অপরিচয়, মায়া ইত্যাদি তার সেই অসুবিধার ক্ষেত্র এখন আর নেই হয়ত; তখন আর তাকে নেওয়া যায় কিনা,—বিচার করে আলোচনা করে দেখাতে ক্ষতি নেই, লাভই আছে। এই সত্যকেও ভুললে চলবে না।

তাই এর আলোচনা হওয়া উচিত। অনেক সম্প্রদায় এ প্রথা নিয়েছেন; কিন্তু বিশাল হিন্দুসমাজ নেয় নি, অথচ গোঁড়াদের পক্ষেও নেওয়া অশাস্ত্রীয় নয়। প্রথম কথা, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সবর্ণ বা এক-প্রদেশীয়দের মধ্যে অসবর্ণ—এই দু'রকমের বিবাহেই লোকে আগে ভাবে মনে মনে মিল হবে কিনা, মিশ খাবে কিনা। পূর্বরাগ বা অনুরাগ যাকেই হোক্ প্রধান স্থান দিলেও, সচরাচর সংস্কার, স্বভাব, সমাজকে সাধারণ লোকেরা ছাড়িয়ে অতিক্রম করে যেতে ইচ্ছে করে না। যেখানে গান্ধর্ব বা পাত্র-পাত্রীর পূর্বরাগে বিবাহ, সেখানে প্রেম অনেক অনেক সমস্যাকে মীমাংসা করে দেয়; সে ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ব্রাহ্মণ-খৃষ্টান কোনো বিবাহই অসম্ভব নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সম্প্রদান বা বাপ-মার অথবা অভিভাবকের নির্বাচন, সেখানে সর্বপ্রথমে লোকের মনে সংশয় ওঠে—ঐ সামাজিক আচারে ব্যবহারে মিশ খাবে কিনা; সেইদিক্ থেকেই অসবর্ণ-বিবাহই বা কতটা সম্ভব আর সুবিধাজনক, আর সবর্ণ এবং স্বজাতি মিলনেই বা কতদূর সুবিধা ইত্যাদি। সংস্কাররক্ষা হিসেবে এ ক্ষেত্রে 'বর্ণ' বলে কোনো সংস্কার নেই; 'জাতি' সংস্কারই সব প্রধান।

সমুদ্র উপকূলবর্তী নদীমাতৃক দেশের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণেরা প্রায়ই আমিষাহারী, তেমনি পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার অনেক দেশের অনেক ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য (বেনিয়া) প্রমুখ জাতি ঘোর নিরামিষাশী; বাঙ্গলায় বৈশ্য শ্রেণীর মতন কোনো বিশেষ জাত নেই; অন্য দেশে বেনিয়া ভাটিয়া আগরওয়াল ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের বৈদ্য কায়স্থ বা সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক জাতির আকাশপাতাল ভেদ। আমাদের দেশের কায়স্থ মধ্যপ্রদেশ যুক্তপ্রদেশের অন্য প্রদেশের লালাদের সঙ্গে নামে সমজাতি হলেও, আচারে এত অমিল, এত ভেদ যে, সবর্ণ স্বজাতি বলে কেউ কারুকে গ্রহণ করতে পারেন না। আমিষাশী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে অহিংস অন্য-প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—ব্রাহ্মণই বলে না।

এখন আহার আচার-ব্যবহার তো এক দেশীয়ের সঙ্গে অন্য দেশীয়দের মেলে না দেখতে পাই, কিন্তু আরো মেলেনা ভাষায়। আলাপ হয়ত বিজাতীয় ভাষায় করা যায়, কিন্তু যেখানে প্রাদেশিক সবর্ণে বা অসবর্ণে বিবাহ হয়েছে—তাঁদের প্রীতি ও মিলনের ভাষা হয়েছে বিদেশী ভাষা; কারুরই মাতৃভাষা নয়। ক জই

তাঁরা শিক্ষিত, অথবা ইংরাজী-শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে পড়েন। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশীয় বা সবর্ণে যদি মেলে না—স্বভাষী, স্বপ্রদেশবাসী, সম-আচারসম্পন্ন জাতে তো শাস্ত্রমতে বিবাহের কোনো বাধা নেই। মনে রাখতে হবে, বর্ণ এবং জাত সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু; আমরা যে 'জাতি' মানি, 'বর্ণ' সে জাতি নয়।

যাঁরা সব বিষয়ের মতামত শাস্ত্রমত থেকে ছেঁকে ফিল্টার করে নিতে চান, তাঁরা দেখবেন—প্রথমতঃ, সবর্ণ এবং অসবর্ণ দু'রকমের বিবাহই সমাজে লোকাচারে সিদ্ধ ছিল; দ্বিতীয়,—নরনারীর যে কোনো রকম, উৎপীড়িত বা সম্প্রীত, মিলনকেই বিবাহ বলে নেওয়া হতো, অনার্য বিবাহ প্রথাও চলত। এক কথায়—নানা রকম নাম দিয়ে তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক সহজ করে রেখেছিলেন, নখী-দন্তীর মতন ভয়াবহ বা প্রাসাদেব সঙ্গে আঁস্তাকুড়ের সম্বন্ধ করে রাখেন নি।

এই প্রসঙ্গে নারীর সম্বন্ধে এবং তার বিবাহ বিষয়ে কথা কইতে হলে আরো দু'একটি কথা আলোচনা হওয়া দরকার। তা হচ্ছে, সমাজে পুরুষের আর মেয়ের অবস্থা ভেদ। সমাজে পুরুষের সামাজিক অবস্থান (position) এক রকমই থাকে; কিন্তু মেয়ের অবস্থান বদলায়। অর্থাৎ মেয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়, পরিত্যক্ত হয়—পুরুষ হয় না। যার জন্যই হোক, যে কারণেই হোক, এক শ্রেণীর মেয়ে সমাজ বহির্ভূত হয়ে যে নিন্দিত জীবন যাপন করে, আর সেই নিন্দিত অস্তিত্বের দ্বারা সমাজের তথা পুরুষের সেবা করে, সেটাকেই মানুষের সঙ্গে মানুষের নখী-দন্তীর সম্বন্ধ এবং প্রাসাদের সঙ্গে আঁস্তাকুড়ের সম্বন্ধ বলা চলে। এই জিনিসটা সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ অনেকের মতে, থাকবেই; এবং প্রাচীনকাল থেকে এখন অবধি আছেও। কিন্তু সে অপ্রাসঙ্গিক। আমার আলোচ্য বিষয় শুধু এই যে, প্রাচীনকালে সংহিতাকার শাস্ত্রকারদের মতে যে আট রকমের বিবাহপ্রথা ছিল, তাতে শেষ চার রকম অর্থাৎ আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ ও পাশব বিবাহ অনেকটা বোধ হয় এই নিন্দিত শ্রেণীর সংখ্যা যাতে অতিরিক্ত না হয়,—পুরুষের প্রবলতায় বা অনাচারে তারই জন্য। ঐ বিবাহ-প্রথা যদি প্রচলিত থাকত, তাহলে যে সমস্ত হৃতা অপহৃতা মেয়ের বিবরণ আমরা পড়ি, আর তাদের ভবিষ্যৎ জীবন যে কি হবে নিশ্চয় জানি, তার ইতিহাস অন্য রকম হতো মনে হয়। যাক্, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ই আবার দেখা যাক।

দেখা গেল শাস্ত্রে সবই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ তাঁরাও ভাবতেন; নানাদিক দিয়ে ভাবতে জানতেন, আলোচনা করতেন। যাঁরা শাস্ত্রসঙ্গত শাস্ত্রানুগত করে, প্রাচীন পুরাণ উদ্ধৃত করে সব বিষয় ভাবতে, সংস্কার আলোচনা করতে ভালবাসেন, তাঁরা একটু নেড়েচেড়ে দেখলেই সবই দেখতে পাবেন। আর যাঁরা সাময়িক লোকাচারকে শাস্ত্র মনে করে অনেক রকম কথা বলেন, তাঁরাও নানারকম

প্রথা পদ্ধতি দেখবেন। কিন্তু যাঁরা নিজেদের মতে, বিবেচনায় আস্থা রাখেন, যুগ পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন না, তাঁরাও যে কোনো পথ নিতে পারেন না। তাঁদের ভাবা উচিত, যুগে যুগে লোকাচার যা নিষেধ করে, পরবর্তীযুগ সেইটেই প্রতিপাল্য মনে করে। কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিযুগেই কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আর সেইটেই হ'ল আসল কথা; প্রাণের জীবনের পরিচয়।

যদি সমাজ অথবা সমষ্টি বা বহুজনমত, বিবাহ বিষয়ে সংস্কার করতে চান, তা'হলে শাস্ত্রমতে যাকে অনুলোম ও প্রতিলোম বলে সেই প্রথাই নেওয়া ভাল। কেন না বিদেশীয় সবর্ণের চেয়ে অসবর্ণ সম-আচার-ব্যবহার সম্পন্ন একপ্রদেশ-বাসীতে বিবাহসম্পর্ক মনে হয়, অভ্যাস আচার সংস্কারের দিক্ থেকে ভাল এবং সুবিধার। প্রীতির কথা বল্লাম না, কেননা প্রীতি বা পূর্বরাগ স্বদেশ বিদেশ স্বভাষী অন্যভাষী না বাছতে পারে; এবং প্রীতি চিরন্তনী, সে থাকবেই, বাধাও না মানতে পারে মিলনাকাঙ্ক্ষায়।

ভারতবর্ষের সমস্ত জাতকে যদি রাজনীতিক অভিসন্ধিতে এক করে বাঁধতে হয়—তো সেটা হিন্দু মুসলমানের বিবাহ বন্ধনে সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও তত নয়, যতটা সেটা সম্ভব সবর্ণ-অসবর্ণ সম-আচার-সম্পন্ন বিবাহে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চবর্ণে এত ভেদ আর নেই যে, বৈশ্য মহাত্মাজী, বা কায়স্থ বিবেকানন্দ যে কোনো ব্রাহ্মণের প্রণম্য নমস্য না হতে পারেন। রাজনৈতিক লাভের দিক দিয়ে, হিন্দু মুসলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ হলে, যে অদ্ভুত ভেদনীতিক ভেদসমস্যার জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে ওঠা গেছে, হয়তো সেটার মীমাংসা হয়। কিন্তু মুসলমানী স্ত্রী ও হিন্দু স্বামী অথবা মুসলমান স্বামী ও হিন্দু স্ত্রী, 'গোবর গঙ্গাজল' 'মোগলাই খানা' 'পূজা আহ্নিক' 'নেমাজ ওজুতে' খাপ খাইয়ে নিতে পরস্পরকে পারবেন বলে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয় একেবারে অত চরমপন্থায় না গিয়ে, আপাততঃ একপ্রদেশবাসী অসবর্ণ বা বিভিন্ন প্রদেশীয় সবর্ণ, অথবা সম-আচার শিক্ষা-সম্পন্ন জাতে বৈবাহিক সম্বন্ধ চলন হলে ঐক্যও হতে পারে এবং মহত্তর বৃহত্তর এক হিন্দু জাতিরও সৃষ্টি হতে পারে। আর কথা এই যে, আমরা ছোট সবর্ণ অসবর্ণ ভাঙতে পারছি না—এক ধর্ম এক পৌরাণিক জাতি সংস্কার সত্ত্বেও, সেক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুর আর মুসলমান মুসলমানের সমস্ত পারিপার্শ্বিককে, সংস্কারকে, স্বভাবকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন আশা করাই যেন দুরাশা মনে হয়। সংস্কার উভয় পক্ষেরই দৃঢ়মূল।

কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ আর সবর্ণ বিয়েতে সে বাধা নেই। তাছাড়া চরিত্র, পৌরুষ, স্বাস্থ্য, শ্রী, বুদ্ধিমত্তা, কার্যকুশলতা হিসেবে এক এক দেশের এক একটা বিশিষ্টতা আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে যা নেই, উত্তর-পশ্চিমবাসীর হয়তো তা আছে; আবার উত্তর-পশ্চিমবাসীর যেসব গুণের অভাব

আছে, পূর্ব-দক্ষিণবাসীর হয়তো তা অনেকটা আছে ; সেটা বিবাহ সম্পর্কে বংশানুসর হতে পারে।

আধুনিক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য প্রাচ্যদেশে, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, আরব্য-পারস্য ও সমস্ত ইয়ুরোপ আমেরিকায় এভাবের বিবাহপ্রথা নেই। যেখানে পূর্বরাগ সেখানেও না, যেখানে অনুরাগ সেখানেও না। এসব দেশে ছোট ছোট আর্থিক বা লৌকিক সংস্কার ছাড়া প্রায় সর্বত্র এক ধর্ম জাতি হলেই বিবাহ হতে পারে, এমন কি এক ভাষাভাষী না হলেও। তাইতে জাতিও স্বার্থরক্ষাপর হয়, মিলও থাকে। ভেদটা 'বোনিয়াকী লেড়কীর' মতন বিশেষরূপে বিভেদ হয়ে দাঁড়ায় না।

জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

সমাজের একটি অন্ধকার দিক

মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তার আবার দু'ভাগ—স্ত্রী ও পুরুষ। কিন্তু তাতে মানুষের সমস্যা মেটেনি, কে স্ত্রীজাতির মধ্যেও দাগ কেটে দু'জন করেছে। একজন হল পুরুষের ঘর-সংসারের গৃহিণী বা সন্তানের জননী-সেবিকা তার নামই হল সতী। আর অন্য হল তার প্রমোদ বিলাসের সঙ্গিনী, বহুবল্লভা গৃহধর্মহীনা এক নিঃসঙ্গ নারী—তাকে অসতী বলা হল।

কেন এই ভাগ হল, কবে থেকে হল, এ কবেকার কথা, তার ইতিহাস কেউ জানে না, বোধ হয় মানুষ যত কালের তত কালই এ ভাগ আছে।

স্বর্গেও এই দু'ভাগ ছিল, এই বহুবল্লভারাও ছিলেন, ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী, সরস্বতী আদি দেবীরাও ছিলেন। সেখানে তাঁদের নাম ছিল অপ্সরা। চিরযৌবনা, অপরূপ রূপবতী নৃত্যগীত গরীয়সী তাঁরা। স্বর্গের দরকারে মর্ত্যে নেমে এসেছেন কখনও কখনও। সুধী তপস্বীদের মনোহরণ করেছেন। সেখানে সন্তানের মাও হয়েছেন, আবার সন্তানকে মর্ত্যে ফেলে রেখে স্বর্গে ফিরে গিয়েছেন নিজেদের রূপযৌবন অক্ষুণ্ণ রেখে। কিন্তু তাঁরা ভাগ্যবতী। তাঁদের মর্ত্যলোকের মত লোকে পতিতা বা বেশ্যা বলেনি। তাঁদের সন্তানদের রাস্তায় ফেলে দেয়নি। অথবা প্রাণ নষ্ট করে দেয়নি। লাস্য-লীলায় তাঁরা বহুবল্লভা হলেও দেবতাদের কাছে বা পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁরা ঠিক পতিতা ছিলেন না এবং তাঁদের সন্তানরাও পতিত হননি। তাই স্বর্গ-পতিতা মেনকার কন্যা শকুন্তলা—যাঁর নামে ভারতবর্ষ সেই ভরত রাজার জননী হতে পেরেছিলেন। উর্বশী পুরূরবার প্রিয়তমা প্রেয়সী ছিলেন। দণ্ডী রাজারও প্রেয়সী হয়েছিলেন। আরও অনেক জায়গায় স্বর্গে-মর্ত্যে তার বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যান্য অপ্সরা মেনকা-রম্ভাদেরও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়।

বাইবেলে পাওয়া যায় বিখ্যাত পতিতা মেরী ম্যাগডালিনের কথা। আরও আছে নিশ্চয়। কোরাণেও স্বর্গের পরী হুরীদের কথা আছে। কিন্তু একজন নারীকে এমনভাবে আলাদা করা হল কবে থেকে আর কেন হল সেটাও মানুষ চিরকাল ভেবেছে।

পণ্ডিত হ্যাভলক এলিস সাহেবের সাইকলজী অফ সেক্স-এর বিরাট পতিতা খণ্ডের অধ্যায়ে পাই সর্বকালের সর্বদেশের পতিতাদের বিচিত্র বিবরণ। অনেকেই তা পড়েছেন।

তাঁর মতে এই প্রথা মানুষের মতই পুরাতন। আদি ইতিহাস এর পাওয়া যায়

না। আর নর-নারীর পাতিত্য সম্বন্ধে তাঁর পক্ষপাতও কারুর ওপর নেই। তিনি নিরপেক্ষভাবে সমাজের উপর ডাক্তারের মত ছুরি চালিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের স্বভাবের বিশ্লেষণ করেছেন। নর-নারী ভেদ করেন নি। আদিম সমাজ মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র প্রথা প্রচলন করেছেন।

সাধারণ মেয়ে কেন পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করে—তাও কয়েকটা মোটামুটি সংক্ষেপ অভিমতও তাঁর এখানে বলি। এই জীবিকার গোড়ার কথা হল অর্থনৈতিক পরাধীনতা যার জন্য মেয়েরা বিপদের দিনে পথে নেমে আসে দেহকে মূলধন করে।

তিনি বলেন—

(১) দারিদ্র্য, দুর্দিন এবং অনাথ হলে মেয়েরা এ পথে এসে পড়ে। তারপর দেহকে জীবিকা করে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফেরার পথ তাদের আগেও থাকে না, পরেও থাকে না। অন্নের দায়ে সমাজ ফিরিয়ে নেয় না।

(২) পারিবারিক নির্যাতন পীড়ন নারীকে বিপথে আনে। এখানেও ফিরে যাবার পথ নেই। সমাজ ফিরিয়ে নেয় না।

(৩) প্রেমের প্রলোভনে ক্ষণ বিপথে এসে পড়ে। পরে প্রবঞ্চিত ও নিরুপায় হয়ে জীবিকা করে নেয় পতিতা-বৃত্তিকে এবং না পায় প্রেম না পায় পবিত্র জীবন এবং এই তৃতীয়বারও বলি সমাজ ফিরিয়ে নেয় না। অথচ সমাজ তাদের রাখে অসদুদ্দেশ্যে। সাধারণ হিসাবে তাঁর মত এই—তারা এই জীবিকা গ্রহণ করলেও তাদের সকলের মনে এই জীবিকায় শ্রদ্ধাও নেই, এই ব্যবসাকে ভালও বাসে না। পারিবারিক জীবনে আর ফিরে আসার পথ থাকে না বলেই এইভাবে তারা থাকে। এ জীবনধারা তাদের কাম্যও নয়, আনন্দেরও নয়। এই অবস্থায় সন্তানদের এই জীবিকা তারা দিতে চায় না—এই তার একটি প্রমাণও বটে।

কিন্তু লেখক আরও বলেন, এ ছাড়াও 'জাত-পতিতা' শ্রেণী বলে এক শ্রেণী আছে। যাদের মনের গড়নই এই জীবনযাত্রা গ্রহণ। তারা পবিত্র সমাজবন্ধন স্বামী, সন্তান কোন বন্ধন রাখতে চায় না। তাদের রুচি বহুবল্লভা বন্ধনহীন বাধাহীন মুক্ত দেহ-লাস্য-লীলায়।

তাঁর মতে এদের সংখ্যা বেশী না হলেও এরা আছে। কৌতূহলী ও বিশেষজ্ঞরা হ্যাভলক এলিসে সমাজের বহু বিচিত্র তথ্য পাবেন যা খুব কম জায়গায় আছে।

এরপরে সম্প্রতি ১৯৫৫ সালের প্রকাশিত "Women of the Street" নামের একটি বইতেও পাই লণ্ডনের কয়েকটি পল্লীর পতিতা-বৃত্তির ইতিহাস। "নিতান্ত আধুনিক কাহিনী" বইখানা সম্পাদনা করেছেন C. H. Rolph.

এঁরা পর্যবেক্ষণ আর অনুসন্ধান করবার জন্য এই বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম হল—(ক) পতিতা মেয়েদের পূর্ব জীবনের ইতিহাস।

(খ) কেমন করে ও কি জন্য তারা এই পতিতা জীবিকা গ্রহণ করল।

(গ) তাদের রোগের বিষয় সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া।

দ্বিতীয় হল সাধারণ সমস্যা—

(ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য—এই জীবিকা নেওয়ায়।

(খ) কোন রকম দাগী অপরাধের সঙ্গে এই জীবিকা নেওয়ার যোগাযোগ আছে কিনা?

(গ) আইন ও পতিতা-বৃত্তির আলোচনা।

এ ছাড়া এই পর্যবেক্ষণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে যৌন-ব্যাধির বিস্তৃতির দমন। প্রায় ১৫০টি কেস এঁরা ভাল করেই দেখেছেন। এমন কি ওদের দলে মিশে গিয়ে বন্ধুত্ব করে দেখেছেন। তার মধ্যে ৬৯টি কেস বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

মোটামুটি তথ্য অনেক পেয়েছেন। পর্যবেক্ষণকারিণীর মতেও (deciding) নিশ্চিত উদ্দেশ্য হল এই জীবিকা গ্রহণ করার একেবারে—অর্থনৈতিক। যদিও এই ব্যবসার কারণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দু'দিক দিয়েই এঁরা আরো আলোচনা করেছেন। মোটামুটি এঁদের মতে এই ব্যবসাটি একেবারে ব্যবসার ভিত্তিতেই পতিতা-সমাজ দেখে।…খরিদ্দার যা চায় সে তা দেয় এবং উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করে…। এবং তার একমাত্র 'বিক্রেয়' বস্তু হল তার দেহ।

এঁরা আরো বলেন যে, এই পতিতাদেরও একটা নিজস্ব সমাজ আছে, তার নিয়ম-কানুন আছে, সেই সমাজ জীবনধারার মূল ভিত হল যে, একটি তার প্রিয়পাত্র ব্যক্তি (জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ ছাড়া) যাকে সে পছন্দ করে বা ভালবাসে ও তার সন্তানাদি। তাদের নিয়েই তাদের এই সমাজ গড়ে উঠেছে। যদিও সেই লোক অনেকেই দুষ্কৃতকারী অথবা অপরাধী ও পলাতক। তবু একটা সামাজিক বন্ধন তাদের নিজস্ব ধরনের আছে। অনেকের মত যে, পতিতরা পতিতভাবেই থাকে একেবারে পৃথকভাবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণকারের অভিমত যতই বিভিন্ন রকম ও ধরনে মিশে গোঁজামিল দেওয়া তাদের সেই সমাজ হোক, একটা সমাজ ওদের আছে।

এঁদের পতিতাদের সঙ্গে এই দেখাশুনা ও আলোচনা করে যা মনে হয়েছিল তাও শোনবার মত আশ্চর্য। ইনি বলেছেন, প্রথমে আমার মনে হল 'কেন এরা পতিতা জীবিকা নিল?' তারপর মনে হল 'কেন এই এরা স্বাভাবিক নারীদের মত হয় না?'

পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁর মনে সিদ্ধান্ত ছিল, এটা সমাজের অনুশাসনীয় ব্যাপার। কিন্তু পতিতাদের সঙ্গে মিশে মনে হল এ সমস্যা ব্যক্তিগত মানুষের। বিশেষভাবে মানুষেরই

বোঝাপড়ার ব্যাপার। প্রধানতঃ যদিও সামাজিক বোঝাপড়ার কথা নিয়েই এই রিপোর্ট লেখা হয়েছে।

তাঁরা বলেন, কয়েকটি প্রধান কারণ আছে পতিতা-জীবিকা গ্রহণের কিন্তু তাই থেকে এক কথায় কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না।

সেই কয়েকটি প্রধান কারণ হল এই—

(১) শিশুকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত (আনসেটল্ড্) জীবনযাত্রা, স্থিতিহীন জীবন। যা এই পথে টেনে আনে, হয়ত—পিতৃমাতৃহীন, নয়ত তারাও ভাল নয়।

(২) বাড়ীরই পরিবেশ খারাপ। লক্ষ্য স্নেহ যত্নহীন গৃহ। যাকে ঘরবাড়ী বলা যায় না।

(৩) কুসঙ্গ কুসঙ্গী, তার মন্ত্রণা পরামর্শ একটা বিশেষ কারণ। যা না হলে অনেক মেয়েই এ পথে হয়ত যেতই না।

এবং যাদের কথা এই বইতে বলা হয়েছে তারা বেশীর ভাগই শ্রমিক শ্রেণীর ও দুঃস্থ ঘরের নারী। এতেই বোঝা যাবে দারিদ্র্য ও লক্ষ্যহীন জীবন প্রায়ই এই পথে টেনে আনে। এতো পণ্ডিত ও সমাজকর্মীদের মতামত ও তথ্য সামান্য দিলাম।

নানা সাহিত্যে, সমাজে ও দেশে এ নিয়ে আলোচনা আছে। তার মধ্যে সাহিত্যে পাই কুপ্রিনের লেখা 'য়ামা দি পিট্' এ শুধু পতিতাদের জীবন কথা। তথ্য ও সত্যময় কাহিনী। তাতেও রয়েছে ঐ জীবনের ও জীবিকার উপর তাদের বিতৃষ্ণার কথা। সহজ জীবনযাত্রা তাদেরও কাম্য। প্রেমের ও গৃহ-জীবনের কি আকাঙ্ক্ষা। এখন এ ছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় কোন কোন ধর্ম সম্প্রদায় কিন্তু পতিতা মেয়েকে ঘরে নিয়ে ঘরের গৃহিণীও করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় সমাজ বহির্ভূতা গায়িকা, বাঈজী শ্রেণী নর্তকী, ক্রীতদাসী, হরণ করা, ধর্ষণ করা মেয়েকে তাঁরা বিবাহ করেন অনেক ক্ষেত্রেই। এবং সেই মুহূর্তে তারা পর্দানসীন বিবি হয়ে যায়। বেগমও হয় বারবিলাসিনী। হয়ত উচ্চশ্রেণীর মুসলমান সেটি পছন্দ করেন না। কিন্তু দেখা যায় অনেক জায়গায় এ প্রথা আছে। নিজেদের দ্বারা, অপহৃত ও ধর্ষিত নারীকে তাঁরা পতিতা স্তরে পৌঁছে দেন না। অশুচি মনে করেন না। সেই নারীর সন্তানরা পিতৃনাম পায়—পরিচয় ও সম্পত্তির অধিকারও পায়। এটা বড় কম কথা নয়। একমাত্র দেহজীবিকা করে সেই ধর্ষিতা বা অপহৃতা নারীকে বেঁচে থাকতে হয় না। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ে ধর্ষিত মেয়েকে বিবি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সকলেই জানেন ঔরংজেবের উদিপুরী বেগমের কথা। এই বেগম ছিলেন জর্জিয়া দেশের একটি সুন্দরী বালিকা। জাহানারা দারা সুজা তাঁকে কিনে

নিয়ে বেগম বানাল। দারার হত্যার পর ঔরংজেবও তাঁকে তাঁর অন্যতম বেগমরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সন্তান কামবক্স 'শাজাদা' নামেই অভিহিত ছিলেন। (রাজসিংহের ভূমিকা থেকে স্যার যদুনাথ লিখিত) এতে দেখা যাবে যদিও পতিতা সমস্যা সব সমাজেই আছে তবু বহু সম্প্রদায় মাঝে মাঝে তাকে ঘরে নিয়ে গ্রহণ করেছে। পড়েছিলাম বর্তমান রাশিয়ায় পতিতা বৃত্তি নেই। পতিতা পল্লী এবং ঐ জীবিকা তুলে দেওয়া হয়েছে আইন করে। তবু বলতে পারেন অনেকে কিন্তু পতিতা নারী আছে। সে কথা আলাদা। সেতো দুর্বল নারী চরিত্র ও পতিত পুরুষ চরিত্র মানুষের থাকতেই পারে। কিন্তু একজনকে চিহ্নিত করে জীবিকা ও উপভোগের জন্য পৃথক করে না রাখা ঐটা খুব বড় কথা। ভ্রষ্ট জীবনের সন্তানের দায়িত্ব সেখানে মা-বাপকে নিতে হয়। তারা না থাকলে না পারলে ষ্টেটও নেয়।

আধুনিক আর কোন দেশে এ প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানি না।

যাই হোক, এ-সব তো আলোচনার দিক। সত্য উপায় বা পন্থা কি ভাবা উচিত সমাজকর্মীদের, রাষ্ট্র-কর্মচারীদের। যদি সত্য সত্য নারীর এই হীন জীবিকা সংস্থানের ব্যবসাকে উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে বিশেষ পরিকল্পনা করে কিছুটা সময়ের মধ্যে আইন করে এই জীবিকা বা ব্যবসা তুলে দেবার ব্যবস্থা করা ভাল। যাতে যারা ঐ জীবনযাপন করে তাদের সন্তান-সন্ততি উত্তরকালে যেন এ জীবিকা গ্রহণ করতে না পারে।

যুগ-ধর্মে এমন নানা জীবিকা মেয়েদের করায়ত্ত হয়েছে, একমাত্র গৃহধর্মই জীবিকা বা আশ্রয় নয় এবং বিবাহও নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে। আগের দিনের মত গোঁড়ামো নেই। মেয়েরা উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষা পেয়ে ভদ্র জীবন যাপন করতে পারে এবং নানা শ্রেণীর বিশেষতঃ নিম্নস্তরের অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে বোঝা যায় তারা কোন এক সময়ে পেটের দায়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল আর ফিরতে পারেনি। কেউবা সেই থেকে দিনে চাকরী বা দাসীগিরি করছে, রাত্রিটি অন্য ভাবে কাটিয়েছে। অনেকে কোন বিশেষ পুরুষের সঙ্গে থাকে। তারও কারণ এই যে, বড় সহরে বিদেশী বহু মানুষ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা পরিবার নিয়ে থাকতে পারে না। পরিবারবর্গ থাকে গ্রামে। তারা কিছু সংখ্যক পুরুষ সহরের বস্তী জীবনে ঐ ভাবে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম অনুসারে অনেকে বিবাহও করে।

মোট কথা পতিতাও যেমন আছে, পতিতাদের মধ্যে গৃহ-জীবনের মোহও বড় কম নেই। যদি ফিরে যেতে পারত তাহলে হয়তো বেশী সংখ্যায় মেয়েই ফিরে যেত এবং পতিত পুরুষও চিহ্নিত না হলেও আছে এ-ও জানা কথা। তারাই এদের সঙ্গে থাকে। এবং এত সভ্য সমাজ স্থান দিলে এবং অর্থ থাকলে ও সাহস থাকলে অনেক সময় দেখা যায় পতিত মানুষও পতিত হয়ে থাকেনি। উঠতে পেরেছে।

একটি পুরাতন গল্প বলে আমার বক্তব্য শেষ করি।

নাম-ধাম বলা ঠিক হবে না। তারা এখন সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ।

কাছাকাছি পশ্চিমের এক ভদ্রলোক বাস করতেন একলা। কেমন করে তাঁর এক নিম্নশ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তার ছিল কিসের এক দোকান। ক্রমে তার সন্তানাদি হল। বিবাহ হয়নি অবশ্য। কিন্তু পিতা তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেন। এক ছেলে ডাক্তার হয়। মেয়ে জননীর মত কিন্তু হিন্দুস্থানী থেকে যায়। মায়ের জীবিকাই নেয় দোকানের কাজ।

এখন ছেলে কৃতী হলে ভদ্রলোক বাঙ্গালাদেশে এসে নিজেদের স্বজাতি থেকে ভাল মেয়ে খুঁজে বিয়ে দিলেন। ছেলে ডাক্তার, বাপও কাজ করেন, পদবীও জানা। কুটুম্ব পক্ষের কোনো সন্দেহ হল না। উচ্চবর্ণও বটে।

এখন বারো তেরো বছরের মেয়েটি শ্বশুর বাড়ী এসে শাশুড়ী ননদ ও বাড়ীর অদ্ভুত পরিবেশ দেখে অবাক হয়ে গেল। পরে বুঝতে পেরে কেঁদে-কেটে আকুল হল। ক্রমে তার বাপের বাড়ীর লোকেরাও বুঝতে পারলো। এবং তারা ভেবে চিন্তে সম্পর্ক আর এদের সঙ্গে রাখল না। মেয়েটি নিরুপায় বেদনায় এই ঘরকরনাই করতে লাগল। স্বামী তার ভালই ছিল। ক্রমে তার সন্তানও হল কয়েকটি। এবং শ্বশুর-শাশুড়ীরও মৃত্যু হল।

এঁরা কিন্তু আর দেশে গিয়ে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিলেন না। কাশীতে গিয়ে ঠিক নিজেদের ধরনের ঐ সকল অর্ধপতিত সমাজের ছেলে-মেয়ে খুঁজে মেয়ে-ছেলেদের বিয়ে দিলেন। অনেকেই জানেন এই ধরনের সমাজ আছে অনেক তীর্থস্থানে। খুব সম্পন্ন অবস্থা তাঁদের। তাঁদের পারিবারিক কথা অনেকেই জানলেও, ভাল ডাক্তার, তাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার রাখতেই হয়। ডাকা হয়। এই ধরনের পরিবারের কথা ক্রমে ভুলে গেলো লোকে, বিবাহাদিও চলে যাবে সম্ভবতঃ। কিংবা আরো কৃতী ধনী হলেও লোকে ইচ্ছা করে ভুলে যাবে মূল দোষের কথা।

কিন্তু এ থেকে যা দেখা যাবে তা এই ভদ্রলোকটির সমাজ নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটলেও মানবধর্ম নীতির সত্য জ্ঞান তাঁর ছিল। স্ত্রী ও সন্তানদের উপর তিনি যথোচিত কর্তব্য করেছিলেন। কয়েকটি পতিতা বা পতিত জীবন সমাজের উপর ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত দুষ্কৃত জীবন নিয়ে পালিয়ে যাননি।

কিন্তু বেশী বলার দরকার কি, পতিতা বৃত্তি ও পতিতা পল্লী উঠে গেলেই সমাজের ও গরীব তথা পুরুষেরও কল্যাণ। এবং শাস্ত্র ও সমাজ ঘাঁটলে বিচিত্র তথ্যের অভাব হবে না। বেদব্যাস, শুকদেব, পঞ্চপাণ্ডব, পাণ্ডু, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, বিদুর এঁরা বিবাহ বন্ধনের বাহিরের সন্তান—ক্ষেত্রজ বা জারজ যাই বলুন পিতৃনাম আছে কিন্তু। নাম ধর্ম জ্ঞান কর্ম হিসেবে এঁদের চরিত্র চিরকালের ইতিহাসে রয়ে গেছে।

আবার শাস্ত্রে আছে আট রকমের বিয়ে, বারো রকমের সন্তান। অনেকেই জানেন। তার মধ্যে প্রজাপত্য, আর্য, ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব হলো ভাল বিয়ে—সম্বন্ধ করে বিয়ে। আর পিশাচ, রাক্ষস, পাশব, আসুর হলো হরণ করা, ধর্ষণ করা বিবাহ।

যদি এই ধরনের বিয়ে সমাজে চলত তাহলে হয়ত পতিতা সমস্যা এমন তীব্র হত না।

অনেকের মত পতিতা শ্রেণী থাকা ভাল বিশাল সমাজের সেফ্টী ভাল্ভ হিসাবে। জিজ্ঞাসা করি কাদের জন্য? কি জন্য? কয়েকটি অসৎ চরিত্র মানুষের জন্য কি? এবং পতিতা বৃত্তিতে উপার্জন হতে পারে কিন্তু চিরদিন নয় এবং রোগের দুর্দিনও আসতে পারে সে কথাও ভাববার। আমার বিশ্বাস পতিতারাও পতিতা বৃত্তি সমর্থন করেন না। এই চিহ্নিত জীবিকা না থাকাই সুস্থ ভদ্র-সমাজের লক্ষণ। কিন্তু এতো আমি আলোচনাতে আমাদের বিষয়বস্তু থেকে অনেকটা সরে এসেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় নানা বিপর্যয়ে পদচ্যুত নারী ও বালিকাদের সুপথে রাখা। যারা পঞ্চাশের মন্বন্তরে গৃহহীন হয়েছে, যারা দেশ বিভাগের অঘটনে গৃহচ্যুত আত্মীয় স্বজনহীন হয়েছে, যারা অপহৃত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের বিষয়। তাদের বহু জনকে তাঁরাও জীবিকার পথ-নির্দেশ করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন।

আমাদের মনে হয়, মহিলা সমিতি যেভাবে কাজ করে চলেছেন সেটিই আরো বেশী বিস্তৃত ভাবে করলেই সমিতি আরো অনেক মেয়েকে জীবিকা, শিক্ষা, আশ্রয়, কাজ দিতে পারবেন, তার রুচিমত ক্ষমতা অনুযায়ী এবং বিবাহও দিতে পারবেন। কেননা, এ পর্যন্ত যে ক'বছরের রিপোর্ট পড়া হল তাতে দেখা যাচ্ছে এ ভাবের বহু কাজ সমিতি করেছেন।

শেষ কথা এ সম্বন্ধে এই বলা দরকার, মেয়েরাই নিজেরা এই সমস্যার প্রসার বন্ধ করার চেষ্টা করুন। যেভাবেই হোক নারী তার ঘর, স্বামী, সন্তান পাক। প্রয়োজন মত ভদ্র জীবিকা পাক। একবার বিচ্যুতি ঘটলে যেন চিরজীবনের মত পতিতা না হয় জীবিকা অভাবে। গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে এই নিয়ে আলোচনা করা হোক। মূল সমিতি এবং ছোট ছোট সমিতি গড়ে তুলে এই আন্দোলন করুন। আমরা নিশ্চয়ই সফল হব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ যতই পতিত-চরিত্র হোক, সুযোগ-সুবিধা পেলে তার নিজের অন্তরের পবিত্র ও মহত্ব জেগে উঠবেই। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পুরাণের পিঙ্গলা প্রমুখ পতিতা, বৌদ্ধ গাথায় পাওয়া কত পতিতার দেখা পাই যারা ধর্মে কর্মে মহৎ হয়ে উঠেছেন। তুলসীদাসের মনোহরণ জন্য আনা নারীটিকেও স্মরণ করা যায়।

যুগান্তর সাময়কী, ১৯৫৭

পতিতা প্রসঙ্গে

[ইদানিং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পতিতাদের নিয়ে আলোচনা চলছে। বিষয়টির সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এ পৃষ্ঠায়ও আলোচনার সূত্রপাত করা হ'ল—বৌঠাকুরাণী]

পতিতাদের ইতিহাস পৃথিবীর মতই পুরাতন। স্বর্গেও দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় তাঁরা ছিলেন দেবতাদের চিত্তবিনোদনের জন্য অপ্সরা নামে। দেবতাদের ইঙ্গিতে ও প্রয়োজনে মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গের জন্য মর্ত্যে নেমে আসতেন। মানবী রূপে ঘরকরনা করে গেছেন মানুষের সঙ্গে। এবং সেই স্বর্গীয়া পতিতাদের সন্তানাদি পৃথিবীতে অপাংক্তেয় ছিলেন না দেখা গেছে। (বিশ্বামিত্র মেনকার কন্যা শকুন্তলা, উর্বশী-পুরুরবার পুত্র আয়ু প্রভৃতি স্মরণীয়।) মর্ত্যের পুরাণের মানুষেও দেখা যায় যযাতি যযার এক কন্যা মাধবীর আটবার বিবাহ হয়। দাসরাজ নন্দিনী মৎস্যগন্ধার (শান্তনুরাণী সত্যবতীর) 'কানীন'-পুত্র মহামুনি ব্যাসদেব সমাজে সসম্মানে স্বীকৃত; ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু কুন্তী মাদ্রীপুত্র পঞ্চপাণ্ডবও ইতিহাসবিশ্রুত ক্ষেত্রজ পুত্র।

যদিও কুন্তী ভোজনন্দিনী থাকার সময়ে কুন্তীর কানীনপুত্র কর্ণ জননীর কাছেই অস্বীকৃত। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে সে সময়ের সমাজেও পরস্পর বিরোধী ইতিহাস ও তথ্য পাওয়া যায়, যাতে দেখা যাবে সতীত্ব ও পতিত্যের গণ্ডী বারে বারেই খণ্ডীত হয়েছে, যা একেবারে অলঙ্ঘণীয় ব্যাপার ছিল না। এছাড়া শাস্ত্রবিধানে পতিতা এবং নারী সমস্যার আরো সমাধানের সূত্র ও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। যা'হল আট রকমের বিবাহ এবং বারো রকমের সন্তান সমাজে স্বীকার করে নেওয়ার শাস্ত্র বিধান। আট রকমের বিয়ের প্রথম চারটি বিয়ে হ'ল প্রজাপত্য, ব্রাহ্ম, আর্য, ও গান্ধর্ব। প্রথম তিনটি সম্বন্ধ করা বিবাহ। গান্ধর্বটি হ'ল পূর্বরাগসম্মত বিবাহ। শেষ চারটি বিয়ের নাম আসুর, রাক্ষস, পাশব, পিশাচ। এগুলি ঐ নামেই হরণ, অপহরণ, অনিচ্ছুক বিবাহ ও ঐ ধরনের বিবাহের ইঙ্গিত বহন করছে।

এটাকে এককথায় মনে হয় সমাজে নারীর নানা বিপন্ন অবস্থাতে 'পতিতা' না করে রাখার এবং সেই অবস্থার সন্তানদের স্বীকার করে নেওয়ার বেশ খানিকটা সমাধানের চেষ্টা ও প্রয়োগ। যেন শেষ চার রকম বিয়েতে আর বারো রকম সন্তানে তারই বিকল্প সমাধান।

এখন পতিতা প্রসঙ্গে সাইকলজী অব সেক্স-এর লেখক পণ্ডিত হ্যাভলক এলিস

সাহেবের অভিমত একটু সংক্ষেপে দেখা যাক্। তিনি তাঁর বইয়ের পাঁচটি বিরাট খণ্ডের একটি খণ্ডে শুধু পতিতাদের কথাই বলেছেন। তাতে সুসভ্য, সভ্য, অসভ্য, আদিম জাতি, বনবাসী, বর্বর প্রায় সব মানব সমাজেরই পতিতাদের বিচিত্র ইতিহাস আছে। আদিম জৈবতন্ত্র, মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র কোনো সমাজের কথাই বাদ যায় নি।

তাঁর মতে এই প্রথা মানুষের মতই চিরকালের পুরাতন প্রথা। আদি ইতিহাস এর পাওয়া যায় না। সাধারণ মেয়েরা কেন পতিতাবৃত্তিতে আসে তার সম্বন্ধে তিনি বলেন, (১) দারিদ্র্য, দুর্দিন এলে, অনাথ হলে তারা এ পথে এসে পড়ে। আর ফিরে যাবার পথ না পেয়ে দেহকে জীবিকা করে নেয়। (দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্র-বিপ্লব?) (২) পারিবারিক নির্যাতন পীড়নে এসে পড়ে। (৩) প্রেমের মোহে ক্ষণিক প্রলোভনে এসে পড়ে। পরে প্রবঞ্চিত হয়ে এই জীবিকা পথে আসে, আর ফেরবার পথও পায় না। কিন্তু এ জীবনযাত্রা তাদের কাম্য অথবা সুখের বা আনন্দের নয়। তারা তাদের সন্তানদের এ জীবিকা নিতে দিতে চায় না এই হ'ল তার প্রমাণ। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, এরা ছাড়াও একটি পতিতা শ্রেণী আছে যাদের জাত পতিতা বলা যায়। তাদের মনের গড়নই এই জীবনযাত্রা গ্রহণ। তাদের রুচি বহুবল্লভা লাস্যময় বন্ধনহীন বাধাহীন জীবনে। কোনো পবিত্র বন্ধন তারা চায় না। খুব বেশী সংখ্যায় না হলেও এই শ্রেণীর মেয়ে আছে।

এটুকু হ'ল মোটামুটি পতিতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ও উক্তি।

এর পরেই জানাই কিছুদিন আগের ১৯৫৫ সালের Women of the Street নামের একটি বইয়ের কথা। বইখানার সম্পাদনা করেছেন C. H. Rolph। লণ্ডনের কয়েকটি পল্লীর পতিতাদের তখনকার আধুনিক ইতিহাস। পুলিশ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা।

এঁরা এই পর্যবেক্ষণকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম হ'ল (ক) পতিতাদের পূর্ব জীবনের ইতিহাস। (খ) কেন ও কেমন করে এই জীবিকাতে এলো। (গ) তাদের রোগ-ব্যাধির খবরাখবর।

দ্বিতীয় হ'ল সাধারণ সমস্যা (ক) এই জীবিকা নেওয়ার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উদ্দেশ্য। (খ) কোনো অপরাধ বা দুষ্কৃতির সঙ্গে এর যোগ আছে কিনা। এঁরা প্রায় দেড়শো তথ্য সংগ্রহ করেন। তার মাঝে ৬৯টি তথ্য ভাল করেই পেয়েছেন। পর্যবেক্ষণকারিণী এদের দলে একেবারে মিলে মিশে এদের বিশ্বাস অর্জন করে তবে এর সন্ধান পেয়েছিলেন। এরা কারুকে বিশ্বাস করে না। তাঁকে নিজের লোক ভেবে নিয়েছিল, ধরতে পারেনি। এঁর মতে এই ব্যবসার নিশ্চিত (deciding) উদ্দেশ্য হ'ল অর্থনৈতিক। এ ছাড়া এর মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দিকও দেখেছেন। মোটামুটি তাঁদের মত এই যে, এই

জীবিকাকে পতিতা সমাজ একেবারে ব্যবসার ভিত্তিতেই দেখে। খরিদ্দার যা চায় সে দেয়। বিক্রেয় বস্তু হ'ল তার দেহ।

এঁরা বলেন, কিন্তু এর অন্যদিকে এদের একটি নিজস্ব সমাজ আছে। সেই সমাজের গৃহে তাদের একটি প্রিয়পাত্র থাকে (যার সঙ্গে জীবিকার কোনো সম্পর্ক নেই) তাদের তারা ভালবাসে এবং তাদের সন্তানাদিও আছে। এবং এই ধরনের পরিবার বা লোক নিয়েই তাদের একটি নিজস্ব সমাজ গড়ে উঠেছে, যাদের মধ্যে পলাতক দাগী অপরাধীদেরও পাওয়া যায়। দেখে শুনে তাদের মনে হয়েছিল যতই বিভিন্ন ধরনের হোক, গোঁজামিল থাক, তাদেরও একটি নিজস্ব সমাজ আছে। সন্তানদের বিবাহও দেয় নিজের মত সমাজে।

এদের এপথে আসার প্রধান প্রধান কারণ তাঁরা পেয়েছেন কিছু। কোনো সিদ্ধান্তে আসেন নি। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি কারণ পেয়েছেন। (১) ছোট বেলা থেকেই বিক্ষিপ্ত, স্থিতিহীন, পিতৃমাতৃহীন জীবন এই পথে টেনে এনেছে। (২) কিংবা পিতামাতা স্বজনই অত্যাচারী খারাপ। (৩) কুসঙ্গ, কুসঙ্গীর প্ররোচনা একটি বিশেষ কারণ। নইলে অনেকে হয়ত এই পথে যেতই না। এগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার ও ঘটনা।

এ বইতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা প্রায়ই শ্রমিক ও দুঃস্থ শ্রেণীর মেয়ে।

যাই হোক, তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল 'কেন এরা খারাপ হ'ল? সকলে কেন এ পথে আসে না?' 'কেন এরা স্বাভাবিক জীবনে আসে না।'

যাই হোক, কিছু সামাজিক, কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে হ'লেও তাঁরা দেখেছেন দারিদ্র্য ও লক্ষ্যহীন জীবনই তাঁদের এই পথে টেনে এনেছে। মোটামুটি পণ্ডিত হ্যাভলক এলিস সাহেব এবং এই বইয়ের লেখকের বিশেষ মতভেদ নেই দেখতে পাওয়া যাবে দারিদ্র্য ও অভাব প্রসঙ্গে।

মুসলমান সমাজে 'পতিতা' নীতি খুব কঠোর সবসময়ে নয়। তাঁদের সমাজে নর্তকী, গায়িকা, বাঈজী শ্রেণীকে বিবাহ করার প্রথা আছে। খুব উচ্চশ্রেণী (রইস)রাও তা' করেন। এবং অনেকে অপছন্দ করলেও সমাজে তাঁরা বিবি, পর্দানশীন বেগম হয়ে যান। সন্তানাদি ও পিতৃ-পরিচয় ও সম্পত্তিতে অধিকার পান। অপহৃতা ধর্ষিতা মেয়েকেও তাঁরা বিবাহ করেন। ঔরংজেবের উদীপুরী বেগমের কথা সবাই জানেন। তিনি ছিলেন জর্জিয়া দেশের একটি সুন্দরী বালিকা। দারাশুকো তাঁকে কিনে নিয়ে বেগম করেন। দারার হত্যার পর তিনি ঔরংজেবের বেগম হন। শাজাদা কামবক্সের জননী হন। (সার যদুনাথের রাজসিংহের ভূমিকা থেকে)।

এতে দেখা যায় সমাজে পতিতা সমস্যা আছে যেমন, বহু সমাজ তাদের গ্রহণও করে।

বর্তমান রাশিয়ায় জীবিকা হিসাবে পতিতাবৃত্তি নেই। পতিতা পল্লীও

নেই। নব্য রাশিয়ায় প্রথম দিকে বিবাহের বন্ধন ও মুক্তি কিছু সহজ ছিল। যদিও সন্তানের দায়-দায়িত্ব প্রত্যেক মা-বাপকে নিতে হত। এবং বিবাহ বিচ্ছেদের বিচারশালায় বিচারক থাকেন নারী পুরুষ সমান ভাগে, বিচারে সমান দৃষ্টি রাখার জন্য।

ভারতবর্ষে একটি মাত্র সম্প্রদায়ে একটিও 'পতিতা' নেই। সে হচ্ছে পার্শী সমাজ।

এঁরা সংখ্যায় দু' লক্ষের কিছু বেশী হয়ত। কিন্তু খুব সম্পন্ন ধনী সমাজ এবং খুব শিক্ষিত। আর খুব দৃঢ়বদ্ধ সমাজ। সেইটাই কি এর কারণ ? তাহলে স্বেচ্ছায় পতিতা বৃত্তি নেয়,—রোগের চেয়ে দারিদ্র্য অভাবের যুক্তি প্রবল মনে হয় না কি ?

এখন আশীষ সিংহ মহাশয়ের অভিমত হল মেয়েরা নিজেরা স্বেচ্ছায় পতিতা বৃত্তি নেয়,—রোগ বার্ধক্যের বিভীষিকা সত্ত্বেও।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে এ নিয়ে বহু ভাষায় বহু তর্ক হয়ে গেছে। আমাদের বাংলায়ও এক সময়ে পুরানো 'বিচিত্রা', 'উত্তরা', 'ভারতবর্ষ', 'ভারতীর' পাতায় এ তর্ক দেখা যাবে। তাতে এ মতও দেখা যাবে 'সমাজের সেফ্টী ভাল্ভ' হিসাবে তাদের প্রয়োজন কত। যদিও যাদের নিয়ে এ তর্ক তারা এ বিষয়ে কোনোদিন কিছু বলেনি।

কিন্তু ঐ প্রয়োজন ? ওটা কাদের ?

এখন অবশ্য কিছু মেয়ে একথা ভাবছেন।

তাই আমাদেরও মনে হয়, প্রথমতঃ, যারই প্রয়োজন বা জীবিকার দরকার হোক কিংবা কারুর নিজের "স্বেচ্ছায়" হোক এই দেহ-জীবিকা সমাজে থাকা উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি রাশিয়ার মত একটা বিচিত্র জাতি ভাষা মিশ্রিত বিশাল মহাদেশ সমাজ থেকে এটা উঠিয়ে দিতে পেরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই বিষয়ে অনেকেরই অভিমত ঠিক নয়। সত্য নয়। নারী স্বেচ্ছায় দলে দলে পতিতা হতে চাইলে এটা উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হত না। তৃতীয়তঃ, কিছু কুচরিত্র অসৎ মানুষ নরনারী সব সমাজেই থাকতে পারে। তার জন্য সভ্য মানুষের সমাজে একটি চিহ্নিত পতিতা সম্প্রদায় রাখা অন্যায়। অনেকে জানেন অন্য কয়েকটি দেশেও এ প্রথা ওঠানো হয়েছে।

আইন করে বহু নির্দোষ জীবিকার উচ্ছেদ নিত্য চোখে পড়ছে। বিবাহ সংস্কারও হয়েছে। এটাও রেখে দেবার মত এত কিছু দরকারী মহৎ ভালো জীবিকা নয়। এর উচ্ছেদ করা উচিত আইন করেই, সমাজের দৈহিক ও নৈতিক দুই উপকারের কারণেই।

গত ১০ই পৌষের দৈনিক বসুমতীতে একখানি চিঠিতে দেখলাম 'পতিতা প্রসঙ্গে' একটু আলোচনা রয়েছে। তার আগেও নাকি একখানি চিঠি ঐ বিষয়ের সম্পর্কে বেরিয়েছিল আমার কাগজওয়ালার কৃপায় সেদিনের বসুমতীখানি আমার হাতে পেঁাছোয়নি। তাই আলোচনায় কি ছিল জানতে পারিনি।

দ্বিতীয় পত্রখানির লেখক শ্রীযুক্ত বিমল দে মহাশয় যা বলেছেন ও মন্তব্য করেছেন তার খানিকটা স্বীকার করে নিলেও তাঁর কথা সব ঠিক নয়; সে কথা-গুলির জবাব দিচ্ছি আগে।

দে মহাশয়ের মতে "আমাদের সমাজে আইন করে কোনো ব্যাপারেই সমাধান সম্ভব হয়নি।" তার সঙ্গে 'ছানা', 'সোনা' (মুদীখানা)কে এনে ফেলেছিলেন! পঞ্জিকার 'স্ত্রী-তৈল-মৎস-মাংস' নিষেধের মত। তাই আগে 'ছানা', 'সোনা' এবং 'মুদীখানার' বিষয় শুধু একটু বলছি—কেন না ওগুলি জীবন্ত মানুষ নয়; বিক্রেয় জড়বস্তু ও মানুষক্রেতার ব্যাপার। নারী জাতি তথা পতিতা বা সতী নারী 'মাছ-মাংস-তৈল' ও 'ছানা', 'সোনা', 'চালের' মত জড়বস্তু নয়। যদিও তাঁরা আমাদের শাস্ত্রে এবং অনেক সমাজেই—সভ্য সমাজেও—সম্পত্তির তুল্য ব্যবহৃত হতেন 'ক্রীত', 'বিক্রীত' হতেন। সেদিনও প্রাচ্য দেশগুলিতে ১৫।১৬।১৭ শতক অবধি এই অবাধ বাঁদী বা বন্দিনী দাসী ক্রীতদাসী ব্যবসায় ছিল। কিন্তু তা তো নয়! পিতা-পতি-পুত্রের দ্বারা রক্ষিত বলেই তো সম্পত্তি মনে করা একালে চলে না।

এখন তাঁকে জানাই, আমাদের সমাজে আইন করে কি কি প্রথার সমাধান হয়েছে।

(১) সহমরণ বা সতীদাহ। (স্ত্রী জাতীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা) ১৮২৮ সাল। রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮২৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর সময়ে এ প্রথা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। এবং সে সময়েও "অতঃপর ঐ হতভাগিনীরা বেঁচে থেকে সমাজে যে কি 'অনাচার' অধঃপতন ঘটাবে" ভেবে ঐ আইনের তৎকালীন সমাজের বিরোধী পক্ষেরাও 'শিউরে' উঠেছিলেন ভয়ে। তার আগে অবধি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে তাদের বৈধব্যের পর মরা ও বেঁচে থাকার দাবী ও ইঙ্গিত ছিল বলিষ্ঠ পুরুষ সমাজের হাতেই! এবং এই আইন পাশ না হলে তাঁরা এখনো মরতে থাকতেন চেলাকাঠ-বাঁশ সহযোগে ও ঢাক-ঢোলের বাদ্যের সাহায্যে।

(২) ১৮৫৫ সাল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫৫ সালে বিধবা বিবাহ বিল পাশ হয়। বিবাহে ইচ্ছুক বিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ রইল না। হয়ত যে বিবাহগুলি না হলে অনাচার-ব্যাভিচারই প্রশ্রয় পেত কিংবা সুকঠোর ভাবে আবাল্য বালিকাগুলি গৃহবন্দিত জীবন যাপন করত। মনে রাখতে হবে শিশু বিধবা তখন অনেক বেশী

ছিল। এক বছর থেকে দশ বছর অবধি। আইন পাশ হওয়াতে ইচ্ছুক যারা অনেকেই সহজ পবিত্র ও প্রয়োজনীয় গৃহজীবন পেয়েছেন।

এ সময়েও বহু লোক 'শিউরে' ওঠেন ও আকুল হন। সমাজ ও গৃহধর্মের কথা ভেবে।

(৩) ১৮৭২ সাল।

কেশবচন্দ্র সেনের আন্দোলনে অসবর্ণ-বিবাহ আইন সিদ্ধ করার জন্য সিবিল ম্যারেজ বিল 'তিন আইন' নামে পাশ হয়। যদিও হিন্দু শাস্ত্রে এই অসবর্ণ-বিবাহ সবাই জানেন নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু লোকাচারে তা অসিদ্ধ আর অনাচার মনে করা হত। (আমি পূর্বে বলেছি)। এ সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ ('সাধারণ' ও 'নববিধান') জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিবাহের পক্ষে উদ্যোগী ছিলেন। যদিও হিন্দু সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজ এই আইনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অনেক সময়ে এই ধরনের বিবাহ সমস্যায় মানুষ জাতিচ্যুত, সমাজ বহিষ্কৃত হয়ে যেতেন। ধর্মান্তরিত হতে হত। মেয়েরা তো একেবারেই 'পতিতা' হয়ে যেতেন। ('কালা-পাহাড়' স্মরণ করুন জাতিচ্যুতিতে) এই আইনে তার সমাধান চেষ্টা হল। উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

(৪) (সাল) গত শতকের শেষ দিক।

নারীর বিবাহিত অথবা দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করার অনুকূল বয়ঃপ্রাপ্তি বিল।

(৫) এই শতকেরই ১৯৩০।

'সারদা' বিল। হরবিলাস সারদা মহাশয়ের শিশু ও বাল্য বিবাহ সংস্কার বিল।

মেয়েদের চৌদ্দ ও ছেলেদের আঠারো বছর বয়সের আগে বিবাহ নিষিদ্ধ করার বিল। ভারতের বহু প্রদেশে থালায় বসিয়ে শিশু পুত্র কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল দুগ্ধপোষ্য পর্যন্ত।

(৬) এরপর স্বাধীন ভারত। এ সময়েও আইনগত সংস্কার হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভালো ভালো তিনটি বিল পাশ হয়েছে।

(ক) হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের বর্ণ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক বিবাহ বিল।

(খ) নরনারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের সমান অধিকার।

(গ) মেয়েদের পিতা ও শ্বশুর স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার।

* * *

এতে মোটামুটি বিমলবাবু দেখতে পাবেন আইন করে সংস্কার করায় সব সময়ে খারাপ হয় না।

(১) সতীদাহ উঠে গেলেও মেয়েরা জীবন্ত পুড়ে না মরলেও 'অসতী' হয়ে যান নি।

(২) বিধবা মাত্রেই বিয়ে করতে ধাবমান হননি।

(৩) অসবর্ণ-বিয়ে বরং অনেক অনাচার কমিয়ে দিয়েছে।

(৪) পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ হওয়াতে ধনী ও রাজা-মহারাজাদের ভোগ্য নারীশালা ও 'হারেম' প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে।

(৫) বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নরনারী সহজ দাম্পত্যজীবনই যাপন করেন হাজারে হাজারে কলহ-বিবাদ থাকলেও।

শেষে বলি, বিমলবাবু বলেছেন "নারীরা বড় বড় কথা বলেন" ইত্যাদি।

এর উত্তরে বলি, মেয়েরা 'বড় বড়', 'ছোট-বড়' কোনো কথাই বলতে কোনদিন ভরসা করেন নি। তাঁরা জানেন তাঁদের 'ছোট মুখে' (স্ত্রী শূদ্র) বড় কথা মানায় না। পুরুষেরা সহ্য করতে—সত্য হলেও—পারেন না। নৈর্ব্যক্তিক ও মানবিক দৃষ্টিতে নিতে পারেন না তাঁদের বক্তব্য।

কিন্তু জানাচ্ছি আমার ঐ সব কথাগুলি আমার নিজের কথা নয়—সমাজ-বিজ্ঞানী পণ্ডিত, সত্য ও তথ্য সংগ্রাহক সমাজহিতৈষীদের আলোচনা ও অভিমত এবং আমাদের শাস্ত্রের নানা দিকের কথা।

এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। পত্রিকান্তরে আলোচনা হয়েছেও। সেই সূত্রে এটা লেখা হয় এবং এই নারী বিভাগের তীক্ষ্ণধী সম্পাদিকাও সেটা প্রকাশ করেন।

এখন লেখক মহাশয়ের মত হচ্ছে—এর জন্য দরকার ঃ

(১) সুস্থ শিক্ষার পরিকল্পনা, (২) যৌন শিক্ষার ভয় দূর করা, (৩) অর্থ-নৈতিক বৈষম্য দূর করা, (৪) পতিতাদের সমবেদনার চোখে দেখা।

তারপরে বলেছেন, 'সর্বোপরি তাদের দেহ-ব্যবসায় বন্ধ করে অন্য বৃত্তিতে নিয়োগ করার মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব।'

এখন আমরাও তো 'সর্বোপরি ঐ বৃত্তির উচ্ছেদই আইনসঙ্গতভাবে হোক' এই কথাই বলেছি মনে হচ্ছে।

শুধু বলা হয়, সেই উচ্ছেদ করার জন্য আইনের কথা। যা অন্য কোনো কোনো দেশে প্রয়োগ করে সুফল হয়েছে এবং ঐ বৃত্তিতে থাকতে থাকতে শিক্ষাদান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হতে পারে কি ? এবং ও বৃত্তির পথে তার নানা পন্থা ও ধারা ও ক্রম আছে—নিশ্চয় সেটাও বিমলবাবু জানেন।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মেয়েদের এই পথে আসার প্রধান কয়েকটা দিক আছে —(১) অভাব ও দুঃখের জন্য—কারণ অর্থনৈতিক, (২) প্রেমভিত্তিক প্রলোভন, (৩) অপরাধগত, (৪) শেষ জীবনে জীবিকাগত, যাতে বয়স্কা পতিতারা 'ইমমরাল ট্র্যাফিকের' সুযোগ নিয়ে এই ধারা চালু রাখে। যাতে তাদের জীবিকাও (ব্যবসায়) বজায় থাকে। মোটামুটি তাঁদেরি মতে এর সামাজিক ক্ষতির প্রধান প্রধান দিক হল—(১) নৈতিক ও সামাজিক, (২) রোগ বিস্তার, (৩) অপরাধী মানুষদের

গোপন আড্ডা বা আশ্রয়. (৪) অসহায় ও নির্বোধ তরুণী নারী সংগ্রহ করে ব্যবসা যা দেশদেশান্তরগত ও প্রায় পৃথিবীব্যাপী।

* * *

এই চিরকালের সমস্যার নিরাকরণ সহজে হবে না সবাই জানে। এবং যদি উচ্ছেদের ব্যবস্থা না করে (আইনতঃ) 'পতিতা-পল্লী' রেখে শুধু প্রচার আর ভালো করার চেষ্টা হয়, তাতে কিছু হয় না তাও দেখা গেছে। এক সময়ে কিছু উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবক এই নিয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। বাংলাদেশেই ১৩৩০।৩৫ সালে মনে হয়। কি কাজ হয়েছে বলা বাহুল্য।

* * *

পতিতারা পতিতা-পল্লীতে থেকে ঐ জীবিকা নির্বাহ করতে থাকলে এবং 'চিহ্নিত' থাকলে তারা ভালো 'জীবিকা' ও 'জীবনের' ধারা কোথায় পাবে বা কি করে নেবে ? বড় বড় কথা বলা মেয়েদেরও তো সে পল্লীতে গিয়ে পৌঁছতে পারা সম্ভব নয়।

এই সূত্রে গান্ধীজীর অনেক আশা ও সাধনার 'হরিজন'দের কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর মতে 'হরিজন' মানে তখন ছিল 'দেবতাদের আশ্রিত' (দেব প্রসাদ) দিল্লীর 'হরিজন আবাসের' কথা বলছি। খাস দিল্লীতে গান্ধীজীর 'হরিজন ফাণ্ড', 'হরিজন পত্রিকা', 'হরিজন কলোনী' জ্ঞাত প্রসিদ্ধ বিষয় হলেও তাদের উন্নতি তা কতখানি করতে পেরেছে বলা শক্ত। আলাদা নাম দিয়ে শুধু একটি আভিধানিক নতুন শব্দ ও তার 'মানে' সৃষ্টি হয়েছে। এবং তাদের সমাজে মিশে যাবার বাধা হল ঐ হরিজন 'নামই' বা সংজ্ঞা। 'হরিজন' ফাণ্ডের অগাধ টাকা। তিন-চার কোটির কম নয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে শুনে এসেছি আড়াই কোটি টাকা ছিল। গান্ধী স্মারকনিধি তার 'অছি' বা ট্রাস্ট্।

'হরিজন কলোনী'ও দেখে এসেছি বাল্মীকি আশ্রমে। দোতলা ভালো ভালো বাড়ী। বয়স্ক ও বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। তাতে আড়াইশ তিনশ ঘর তখন হরিজন ছিলেন। ছাত্রছাত্রী হিসেব মত ঘরপিছু কম করে তিন চারটি হওয়া উচিত ছিল। 'এবং বয়স্ক অন্ততঃ প্রতি পরিবারে দু'-তিনজন করে।

কিন্তু তা সম্ভব হত না। তাদের জীবিকার কাজে তারা সকালে সবাই বেরিয়ে যেত, শিশু আর নিতান্ত বালক ও স্থবির বুড়ো-বুড়ী ছাড়া।

কাজেই সকালের স্কুলে ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশী বালক-বালিকা থাকত না।

সন্ধ্যায় বয়স্ক শিক্ষায় ১৪/১৫ জনের বেশী আসতে পারত না।

পাকা বাড়ী ছিল। স্কুলও ছিল। কিন্তু নামও হরিজন, জীবিকাও হরিজনের, অর্থাৎ ঝাড়ুদারের। হয়ত জমাদারের জীবিকা নির্বাহী জাতি ভেবেই তাদের সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। ভালো বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও ভালো শিক্ষার

অন্য জীবিকাব কাজের সন্ধান অন্যমুখী সৎসঙ্গের সন্ধানও তারা পায় নি। যদিও তাঁতশালা, চরকা দু'চারটি ছিল সাজানো প্রদর্শনীতে।

এককথায় হরিজন নাম দিলেও তাদের কাজ, জীবিকা, সামাজিক অবস্থান যেখানে ছিল সেইখানেই অনড় অচল করে রেখেছে। শুধু তাদের 'নামই' বদলেছে। অর্থাৎ 'হরিজন' মানে ঝাড়ুদার। 'হরিজন পল্লী' অর্থে 'জমাদাব নিবাস'।

* * *

কাজেই মনে হয় পতিতা-পল্লী তথা দেহ-জীবিকা বজায় থাকলে কোনো সদুপায় কাজে লাগবে না তাদের সন্তানদের এবং তাদের নিজেদেরও।

সবশেষে বলি "পতিতা বৃত্তি আইনের দ্বারা বন্ধ হলেও লেখক বলেছেন যে, 'ঘরে ঘরে······কি হবে তা' ভাবতে শিউরে উঠি।"

এটা সমাজেব নর-নারী নির্বিশেষে একটি অশালীন অসঙ্গত ইঙ্গিত ও উক্তি নয় কি?

বসুমতী

সহ-অধ্যয়ন

সহ-অধ্যয়ন বা কো-এডুকেশনের কথা উঠলেই আগেই মনে আসে আশ্চর্য হয়ে তা'হলে কি এই কিছুদিন আগেই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত কিনা, আর ঐ শিক্ষার প্রচার হলে সেটা কি ধরনের হবে ; কতটা তার সীমা, তার বেড়ার উচ্চতা কতটা, এই সমালোচনার সীমানাটা আমরা পার হয়ে গিয়েছি। নইলে এই নিয়ে আলোচনা ক'বছর আগেই তো কম দেখা যায়নি (এখনো মাঝে মাঝে ওঠে)। মনে হতে পারে আশার সঙ্গেই, তাহলে হয়ত এতদিন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ানো গেছে, যেখানে কিছুটা জনমত শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা মেয়েদের পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত, আর সেটা পাওয়া এবং দেওয়ার পরে যে সব অসুবিধা আছে, তার কতকটা কিসে নিরাকরণ হয়, সে কথা ভাবেন। সহ-শিক্ষার কল্পনা মনে হয় এতেই এসেছে।

কিন্তু এই সহ-অধ্যয়নে আজকালকার এই মতামতও সংস্কারগত আপত্তি ওঠ্‌বার বছর কয়েক—প্রায় ৫।৭ বছর আগেই কলিকাতায় কয়েকটি বেসরকারী কলেজে (স্কটীশচার্চ তাদের মধ্যে একটি, যাতে এখন শতাধিক ছাত্রী পড়েন) মেয়েরা খুব অল্পসংখ্যায় প্রবেশ করেছিলেন। অনেকেই তাদের মধ্যে অন্য প্রদেশিনী এবং ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও হিন্দু নাম নিয়ে দু'একজন (সম্ভবতঃ দু'-একবছর আগে পরে ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের মেয়ে) ছাড়া বড় বেশী কেউ ছিলেন না। এখন সম্ভবতঃ মেয়েদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, স্থাপনের সুযোগ ও অর্থাভাব, নানা অসুবিধার জন্য এই ক'বছরেই অনেকগুলি মেয়ে ছেলেদের কলেজে ঢুকেছেন। আর তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু নামেই আছেন। সামাজিক জাতি সংস্কার, সম্মান, নাম, পুরাতন প্রথা একই ভাবে আছে। এতে মনে হয়, সহ-শিক্ষার সমর্থন পরোক্ষভাবে সমাজে চলেছে (অবশ্য খুঁড়িয়ে), সমগ্রভাবে খুব অল্পসংখ্যাতেই তবু চলেছে।

শিক্ষায় বাংলাদেশ কত পেছিয়ে আছে, সভ্যদেশের তুলনায় ভারতবর্ষে কোথায় আছে, এতো নানাদেশীয় শিক্ষার আলোচনায় আমাদের জাতীয় অজ্ঞতার সমালোচনায় আমাদেরই নিরুপায় একচেটে আলোচ্য বিষয় বললে হয়। আর তার মেয়েরা কোথায় আছেন, তাদের অশিক্ষার অবস্থা কি রকম, সে আলোচনাও হয় মাঝে মাঝে। তবু আরও মেয়েদেরও যথাসাধ্য করা উচিত।

ওপরে বলেছি, কয়েকটা কলেজে মেয়েরা পড়তে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সেটা কলেজেই চলেছে, স্কুলে নয়। তবু মেয়েদের এই কলেজে পড়া আর শিক্ষিত

হওয়া বা লেখাপড়া শেখা ও স্ত্রীশিক্ষার গতানুগতিক গণ্ডীর সীমা নানা বাধা সত্ত্বেও একটু একটু করে সরছে, এই থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তাতে মনে হয় যে শিক্ষাটা পাওয়া উচিত, তা শিক্ষিত-মন-সম্মত হয়ে আসছে। অথচ সহজ-ভাবে তা লাভের উপায় দেখতে পাওয়া যায়না, এটাও সকলের চোখে ঠেকছে।

দেখতে পাওয়া যায়, ছেলেদের জন্য নগণ্য পল্লীতেও পাঠশালা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় থাকেই, সেক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় থাকে না। (আর ইচ্ছা থাকলেও পৃথকভাবে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করাও একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তাই সেটা ঘটেও না।) তারপর ছেলেদের জন্য হাইস্কুল একটু বড় গ্রাম মাত্রেই আছে, তাতেও মেয়েদের জন্য ছোট পাঠশালা নেই। এর পর সাবডিবিশান সহরে, মাঝারি সহরে ছেলেদের স্কুল তো একটির বেশী থাকেই। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজও থাকে প্রায়। কোনো রকমে বাড়ীতে থেকে মফঃস্বলের ছেলেদের পড়বার সুযোগ কিছুদিনও দেবার জন্য তখন অবধি অভিভাবকদের ভাবতে হয় না। যেমন করে হোক, তারা খানিকটা শিক্ষার সুযোগ পায়। যেটা প্রতি গণ্ডগ্রামে পাঠশালা, স্কুল, প্রতি গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং অনেক বড় সহরে কলেজ থাকাতে তারা পায়।

এই থেকে দেখতে পাওয়া যাবে সাধারণভাবে এই সুযোগ মেয়েদের নেই। অথচ আজকালকার দিনে এটা চলন হয়েছে কয়েকটি দিক থেকে; প্রথম অনেক বয়স অবধি অবিবাহিত থাকায়, দ্বিতীয়, অনেকে বিবাহ দিতে না পারায়; যে কারণেই হোক মেয়েদের অনেক সময় উপার্জন করার তাগিদে, আর শিক্ষা লাভ করার আগ্রহে। এই শিক্ষা লাভের আগ্রহই হওয়া উচিত এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যে। কিন্তু এইটে উপলব্ধি করবার আগেই আমাদের দেশে অধিকাংশ সাধারণের বিয়ে হয়ে যায়, তাই এইটেই সব শেষের দিকে পড়ে।

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ দেখা যায়, মেয়েরা কোনোক্রমে বাড়ীতে বা পাঠশালায় বর্ণ পরিচয় করে তারপর বিবাহ হয় তো ভালো, না হয় তো অনেক বয়স অবধিও ঐভাবেই লেখাপড়ার সমাপ্তি করে চুপচাপ থাকে। পল্লীগ্রাম থেকে যদি সহরে আসি, তা হলেও মেয়েদের পৃথক স্কুল স্থাপনের খরচ, স্কুলের গাড়ী, পর্দার সজ্জার জন্য খরচ, অর্থাভাব ইত্যাদি নানা কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠা ঘটে ওঠে না। তারপর যদি বড় সহরে স্কুল যা থাকে মিশনারী মেয়েদের কল্যাণে বা ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়, তাতেও ঐ গাড়ী, তার ফী শুদ্ধ স্কুলের বিপর্যয় দক্ষিণা এবং মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ এই তিন জুটিয়ে পড়ানোর মত মনোবৃত্তি এবং অবস্থা খুব কম লোকেরই থাকে।

সহ-শিক্ষার যদি কোনো কারণে বিশেষ দরকার থাকে, তা'হলে এই কারণে। শিক্ষা জিনিসটা যত সহজে ও সস্তায় যত বেশী জনকে দিতে পারা যায় ততই রাষ্ট্রের ও সমাজের আদর্শের পক্ষে ভালো। এই ভালোটা যে মানুষের সতাই

দরকার সেটা মনে করে নিতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, আপাততঃ সহ-শিক্ষাতেই আমরা এই সুযোগটা পাই ; এর (এই সহশিক্ষার) চলন হলে পল্লীগ্রামের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই ব্যবস্থায় একই ব্যয়ে এই স্কুলের সাহায্যে প্রাথমিক, মধ্যশিক্ষা এবং ম্যাট্রিক অবধিও অনায়াসেই পড়তে পারবে এবং যেখানে যে সহরে কলেজ আছে, তাদের ভাইয়েরা আত্মীয়েরা পড়ে থাকেন, অথচ তাদের সে শিক্ষা পাবার কোনো পথ নেই, কলিকাতা ছাড়া ; সে ক্ষেত্রে এর চলন হলে শিক্ষার ব্যয়, অভিভাবকের তত্ত্বাবধান এবং আত্মীয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ায় তিনরকম দুর্ভাবনার দায় এড়িয়ে মেয়েদের মানুষ করে তোলবার সুযোগ পাওয়া যাবে। বিদেশে শিক্ষার ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণের দায় আর ঘরের আবেষ্টনের প্রভাব থেকে দূরে রাখার যে শঙ্কা তাও কমই হবে।

কিন্তু এসব তো গেল সহ শিক্ষার সুবিধার দিক।

অসুবিধার দিক দেখবার লোক কম নেই। বরং বেশী তাঁরাই। এই সুবিধা অসুবিধার দিকের কয়েকটি আলোচনা সম্প্রতি চোখে পড়েছে। তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহ শিক্ষার পক্ষে নন। তাঁর কিছুদিন আগের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতায় তাই দেখা গেল। সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি কোথাও দেখা যায়নি, আংশিক যা' দেখা গেছে, তাতে তিনি আশঙ্কা করেন, এতে জাতির চরিত্র লঘু হয়ে যেতে পারে। পাশ্চাত্য সমাজের শিক্ষার প্রভাবে পড়ে প্রাচ্য সমাজের ও চরিত্রের গড়ন বদলে যেতে পারে এবং নীতি ও সতীধর্ম সম্বন্ধে তাঁর পাশ্চাত্য সমাজের নরনারীর ওপর খুব সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা নেই। এই তাঁর বক্তব্যের সার মনে হল। এর পরেই মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাসের লেখাটি চোখে পড়ল সহশিক্ষার সপক্ষেই তাঁর মত। সাধারণতঃ পৃথক স্কুল কলেজের সংখ্যাল্পতার জন্য মেয়েদের পড়ার অসুবিধা, উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থিনী কম, সেজন্য যার প্রয়োজন সেও সুযোগ পায় না, এ ছাড়া যে সহরে বা গ্রামে পৃথক স্কুল কলেজ নেই এবং বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শেখবার মত অবস্থা নয় বা সুযোগ নেই, কেন না মেয়েদের অনেক বাধা। এই সব স্থলে তার কো-এডুকেশন পাওয়াই সব চেয়ে সুবিধার উপায়। নীতি সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন। কিন্তু এর অভিমত কো-এডুকেশনের পক্ষেই।

তারপর পূজার আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সামান্য একটু বলেছেন শিক্ষা সম্বন্ধেই। তিনিও কো-এডুকেশনের পক্ষে। তাঁরও মত এতে সাধারণ ভাবে অনেক মেয়ে লেখাপড়ার খুব বেশী সুযোগ পাবে, জাতির পক্ষে যেটা দরকার এবং লাভ।

এ তো যাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কথা। সাধারণ যাঁরা বলেন না, বা বলেন নি, কিন্তু সমর্থনও করেন না ; আর কেন করেন না পরিষ্কার করে বলতে পারেন না তাও, তাঁদের সংখ্যাই আরও বেশী। তাঁদের পক্ষের জনমত হচ্ছে এই

যে নৈতিকতার হানি হবে। এই নীতিহানি সম্বন্ধে সাধারণতঃ নীতির দিক দিয়ে যা কথা ওঠে, তা প্রায়ই জাতিবর্ণ, আর সংস্কারের কথা মনে করে। কিন্তু নীতি যা বস্তু সংস্কার সে জিনিস নয় ;—এই নৈতিকতার হানি আর সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ একই কথা নয়। প্রথম তো কো-এডুকেশনের সুযোগ যাঁরা দিয়েছেন বিদ্যালয়ে, তার মধ্যে শান্তি-নিকেতনে আমাদের বাংলাদেশেরই, এর বিষয়ে অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এখানে সহশিক্ষার আর মেলামেশা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের বা ছেলেদের সম্বন্ধে নৈতিকতাহীনতার কথা শোনা যায় না। অন্যত্র বম্বেতে আছে—হয়ত আরও এক আধ জায়গায় আছে। কলিকাতায় কয়েক বছর ধরে কয়েকটি কলেজে মেয়েরা পড়ছেন। এসব ক্ষেত্রেও এই নীতিহানির বা গ্লানির কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এখন আমাদের মনে হয় এই সমস্ত কিছু সত্য,—কিছু কাল্পনিক ধারণার দোহাই ছেড়ে এটা নিয়ে সুবিধা সুযোগ উন্নতি আর অবনতির এদিক দিয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা হওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে আর একটা দিক আছে, যা অবাস্তব মনে হলেও অবাস্তব ঠিক নয়। তা হচ্ছে, সাধারণের আর অসাধারণ অনেকেরও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেবল একটা ভয় আছে। ঐ ভয় অনেকটা সেই ধাতের, যে ভয় আমাদের মনে সমাজের নীচু স্তরের অথবা অশিক্ষিত স্তরের লোকেদের শিক্ষা দিতে আছে,—যে ভয় আমাদের কর্তৃপক্ষরা আমাদের সামরিক শিক্ষা দিতে পারে,—সে ধরনের ভয় সর্বত্রই ক্ষমতা-পন্নদের থাকে—ছোট বড় সব জায়গায় অক্ষমকে চির অক্ষম ও মুখাপেক্ষী করে রাখার লোভে,—সেই ভয়টা আমাদের বেলাতেও আছে।

যদিও এটা স্ত্রীশিক্ষার কথা, সহ শিক্ষার বিষয় নয়।

তবু আমাদের মনে হয় ঐ নীতিহানির আশঙ্কা আর এই স্ত্রীশিক্ষাতে নিজ সম্পর্কীয় চিন্তার বা কাজের অথবা কোন কিছুর স্বচ্ছন্দ আলোচনার যে ভয় আর অপছন্দ ভাবটা কর্তৃপক্ষের মনের মধ্যে মূল বিস্তার করে আছে, এই দুটো মিশিয়ে মনের মধ্যেই এর বাদানুবাদ চলে। সেইজন্যই অধিকাংশ লোক আর স্বজনরা এই সম্বন্ধে পরিষ্কার স্পষ্ট মতামত দিতে পারেন না। আর দুর্নীতি নীতিহীনতার কথা সমাজের পক্ষের মানুষের পক্ষেও একটা এত বড় বিপদ, যে তার সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত করলেই প্রতিবাদ করাও হয়,—কাজও হয়।

কিন্তু সত্যই সহশিক্ষা নীতিহীনতার সহায় কিনা ভাবনার বিষয়। সহশিক্ষা পাশ্চাত্যদেশে যেখানে চলছে, সেখানকার কথা যাঁরা জানেন ভালো করে, তাঁরা আলোচনা করতে পারবেন। আমেরিকায় অনেকদিন চলেছে। সেখানকার কথাও আশা করি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলবেন।

সহশিক্ষাতে যে নীতিচ্যুতির কথা ওঠে তার কথা শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস বলেছেন এতে সাধারণতঃ অভিভাবকের ভয় পাছে অবাঞ্ছনীয় বিবাহ ঘটে।

প্রথমেই তো এই কথার উত্তরে বলা যায়, যদি বিবাহই হোল, তা নীতিচ্যুতি কোথায় ? ভয় তো মানুষের অবাঞ্ছিত স্বেচ্ছাচারকে, বন্ধনযুক্ত মিলনকে কি নীতিহীন বলা যায় ?

এই শঙ্কিত মনোভাবে নীতিকে কি ভাবে নেওয়া হয়, সেটা দেখা যাক।

এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহ মানে স্বজনের বা অভিভাবকের অনভিমতে বিবাহ ; সেটা (১) অসবর্ণ হতে পারে, (২) সবর্ণ প্রাদেশিক হতে পারে, (৩) প্রাদেশিক অসবর্ণ হতে পারে, যেমন—বাংলার ব্রাহ্মণ ও অন্যদেশের বৈশ্য, (৪) একেবারে অন্য ধর্মাবলম্বী বিদেশী জাতি যথা মুসলমান, য়ুরোপীয়ান, বর্মী, জাপানী, চীনা যাই হোক। প্রথম তো এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে মনে রাখতে হবে ঐ বিবাহ কথাটি। কেননা যে ক্ষেত্রে বিবাহ হচ্ছে, সে যতই অবাঞ্ছনীয় হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য আর কাজ ভবিষ্যৎ বংশীয়ের মঙ্গল, সেটা এই বন্ধনের বা মিলনের পরিপন্থী হচ্ছে না। যেমনই হোক তাদের একটা সমাজ এবং আশ্রয় আছেই। এ তো গেল সমগ্র ভাবের সব বিবাহের কথা। এছাড়াও চতুর্থটি ছাড়া আর তিনটি অনেক সময় লোকাচার হিসেবে অবাঞ্ছনীয় হতে পারে ; অশাস্ত্রীয়ও নয়, আর অবৈধও নয়, অচলও নয়। হিন্দু শাস্ত্রে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ এবং সবর্ণ-বিবাহ আছে, এই সব বিবাহের পদ্ধতি আছে আট রকমের। তাদের নাম—আর্য, প্রজাপত্য, ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর, পিশাচ ও পাশব। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহ মানে অভিভাবকের অপছন্দে বা অনভিমতে বিবাহ। যাই হোক, এটা যখন বিবাহ, তখন নীতির দিক থেকে সর্বদা নিন্দনীয় বলা যায় না এবং সহশিক্ষার সমর্থক পক্ষের এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের একটা বড় জবাব এই যে, এ পর্যন্ত কো-এডুকেশনের সুযোগ বা দুর্যোগ না ঘটা সত্ত্বেও এই ধরনের অবাঞ্ছনীয় বিবাহ—অসবর্ণ, সবর্ণ, বিদেশী, বিজাতি সব বিবাহই ঘটেছে, অনেক স্থলেই ও অন্য সূত্রেই আর সহশিক্ষার মাঝেও ইতিমধ্যেই ওরকম বিবাহ বরং অনেক হয়নি। এর পরে অনেকে বলেন, মেয়েদের ও ছেলেদের চরিত্রে নীতির লঘুত্বের কথা। সেদিন স্কটীশের প্রিন্সিপ্যাল অ্যারক্যুইট সাহেবের রোটারী ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে একটি দুটি লাইন তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, "কয়েক বছর আগে সেণ্ট এণ্ডরুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় জে. এম. ব্যারি বলেছিলেন, স্কটল্যাণ্ডে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আর একটি পঞ্চম বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, সে হচ্ছে অগণিত দরিদ্র ছাত্রদের পারিবারিক জীবন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র নয়। গৃহও শিক্ষার অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র।" আমাদের দেশেও পরিবার আর পারিবারিক জীবন বলে একটা জিনিস আছে এবং তারও প্রভাব বালক-বালিকাদের জীবনে একটু আছে বলা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার (যদি মন্দ প্রভাব থাকে) প্রভাবই একমাত্র প্রভাব নয়, একথার বিরুদ্ধ মত অতি অশ্রদ্ধেয়। চরিত্র আর নীতি এমন জিনিস

যা অনেকটাই পারিবারিক আর সামাজিক প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। সহশিক্ষার সহায়তাতে সেই নীতিবোধ বা চরিত্র যে একেবারে শিথিলমূল হয়ে গিয়ে যথেচ্ছাচার করবে, এমন অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপর আর সহশিক্ষার উপরও না আসাই উচিত। আর এও সঙ্গে সঙ্গে বলা উচিত, যদি এমনই হয় যে পৃথক ও আড়াল করে রাখা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নীতিবোধ রক্ষা করা যাবে না, তাহলে এমন সুনীতির বিশেষ মূল্য নেই এবং বিশেষ দরকারও নেই তার বোধ হয়। ঐ বক্তৃতারই আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্র বিপ্লববাদী, তাই হলে ছাত্র মাত্রেই ওরকম মনে করা অন্যায়।" আমরাও বলতে পারি, সহশিক্ষার যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় আচরণ দেখা যায় সেটা সকলের পক্ষেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এও অমূলক, কেননা আগেই বলেছি যে, সব সময়ে অবাঞ্ছনীয় (অভিভাবকের মতে) মিলন ঘটেছে—তার সহায়তা সহশিক্ষার পন্থায় হয়নি। (আর তা সুনীতিও নয় এও মনে রাখা দরকার।) আর সহশিক্ষার দ্বারা যদি কোন ঐ 'অবাঞ্ছনীয়' ঘটনা ঘটে থাকে, তা আইনতঃ সিদ্ধ, নীতিও বটে। 'অবাঞ্ছনীয়' আর অবৈধ এক জিনিস নয়।

সহশিক্ষায় নৈতিক পতনের শঙ্কায় যেটুকু আমার বলার প্রয়োজন ছিল, বলেছি। কিন্তু সহশিক্ষা যে একটু আধটু চলে এক এক জায়গায় তার কথা বলতে ভুলেছি। সহশিক্ষা মেয়েস্কুলে অনেক সময়ে অনুমোদিত হয়। গাড়ীতে দেবার জন্য, পথে একলা ছাড়তে ভয়ের জন্য অনেক সময় অনেক মা-বাপ ছোট ছোট ছেলেদের দিদিদের স্কুলে দিয়ে থাকেন। এরা ১০।১১ বছর পর্যন্ত মেয়েস্কুলে পড়তে পায়। সংখ্যায় অবশ্য খুব কম করেই যায়। এ ছাড়া গ্রাম্য পাঠশালায়, পল্লীগ্রামে প্রাথমিক স্কুলে আর সহরেও ছোট ছোট ছেলে এবং মেয়ে একসঙ্গে পড়ে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক ছোট স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ায় খেলায় ড্রিলে বাধা নেই। শান্তিনিকেতনে স্কুলের মধ্যে প্রায় ১৩ বছর অবধি বালক বালিকা একসঙ্গে পড়ে। এর পরে পৃথক ক্লাস করে পাঠ নেয় শুনেছি। আবার বিশ্বভারতীতে একত্র পড়ানো হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—সহশিক্ষা থাকায় নীতিহীন বলে কিছু হয়নি বরং পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে বেশ ভাল ও আনন্দময় হয়েছে বলে শোনা যায়। আর ছাত্রছাত্রীতে নিঃসম্পর্কতার মাঝেও বেশ সহজ বন্ধু মনোভাবও জন্মেছে দেখা গেছে।

এখন স্কুল কলেজের সংখ্যার হার অশিক্ষিতের সংখ্যায় তলিয়ে উপায় দেখতে গেলে আমাদের চোখে সর্বপ্রথমে পড়ে, আমাদের অর্থও নেই, সহায়ও নেই। অথচ অশিক্ষিতের সংখ্যা প্রচুর। এর নিরাকরণের ঐ একটিমাত্র উপায় আছে 'সহশিক্ষার সুযোগ নেওয়া। বাংলাদেশে কতকগুলি প্রাথমিক, মধ্য-

ইংরেজী, কয়টি বা হাইস্কুল আছে মেয়েদের ও পুরুষদের, তা গত আশ্বিনের জয়শ্রীতে বেরিয়েছিল। মেয়েদের ক'জনের আর ছেলে কত জনের অক্ষর পরিচয় আছে আর নেই, শিক্ষা কতদূর কার আছে, নেই—এও দেখতে বেশী খোঁজ করতে হয় না সে মাসের রিপোর্টেই দেখা যাবে। এই লক্ষ লক্ষ 'মূঢ় মূক ম্লান মুখে ভাষা' দেবার কথা মনে আনা যায় একমাত্র উপায়ে এখন, যতক্ষণ না হাতে অন্য উপায় আসে, ওই সহশিক্ষা অন্ততঃ স্কুলে ১৩ বছর অবধি একত্রে, তারপর পৃথক ক্লাশ করা উচিত (যদি এখন আপত্তি থাকে কিছু অভিভাবকদের) আবার কলেজে একত্রে। আমাদের মনে হয় এতে নীতিহানি না হয়ে লাভই হবে। সহজভাবে দেখতে শিখবে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে। আর এক স্কুলে এক পল্লীর এক পরিবারেব শিশু ও বালক বালিকা পড়াতে কোনও ক্ষতি নেই, কোন বাড়ীতে ও পল্লীতে তারা অনেক সময়েই একত্র খেলা করে থাকে।

যাদের দেশে শিক্ষা বলতে নিরক্ষরতা নাম ঘোচানো বোঝায় এখনো যাদের দেশে সেই শিক্ষারই বিস্তারের জন্য যা খরচ হওয়া উচিত, স্বাস্থ্য ও জ্ঞানলাভের জন্য যা করা উচিত, স্বাস্থ্যোদ্ধাব যা পাওয়া উচিত, তাদের দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য আয়ুর জন্য যা হওয়া উচিত, তাব একটিও হয় না; সে দেশে অক্ষব পরিচয়ের জন্যই স্বল্পব্যয়ে এই শিক্ষা লাভের সুযোগ না নিলে আগামী আরও দশবার আদমসুমাবির রিপোর্টেও অর্থাৎ আরও শ' খানেক বছর আমরা আমাদের অশিক্ষিত সঙ্কীর্ণ মন ও মত, কল্পিত নীতিবাদ লোকাচারপরায়ণতা, অদৃষ্ট-বাদ নিয়ে ২৩৷৷ বছরের আয়ুকে ১৩৷৷ এ নিয়ে ঠিক সনাতনভাবে বেঁচে থাকব সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে পতিতার সংখ্যা যত, সেই অনুপাতে যদি পতিত অর্থাৎ অসচ্চরিত্রের সংখ্যা করি, তাহলে সংখ্যাটা বেশ মোটা রকম হয়। বলা উচিত এরা—এই মেয়েরা ও পুরুষেরা অধিকাংশই মূর্খ, মেয়েরা প্রায়ই নিরক্ষর, সমাজে মেলামেশা করার অবকাশ তারা পায়নি, পায় না। নৈতিকতার যে ত্রুটির জন্য বেচারী শিক্ষা প্রণালী ও তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষিতরা দায়ী হয়, নিন্দিত হয়, এরা সে দুর্যোগের মাঝে পড়ে নি; সনাতন অশিক্ষা পুরাতন পর্দা, চিরন্তনী মূর্খতা তাদের নিবিড়ভাবে ঘিরে জড়িয়ে আছে, তবু তাদের পতন-প্রবৃত্তি আছে এবং পতিত হয়, অতঃপর পতিতভাবেই জীবন যাপন করে। এতে বোধ হচ্ছে শিক্ষা এবং সহশিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে পতনের ও নীতিহানির কারণ হয়, তা নয়।

আর তাহলে এতদিন যুগযুগান্তর যখন এই একই এক্সপেরিমেণ্ট মানব জাতির তথা নারী জাতির চরিত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আর অপ্সরা আদি এই নানা নাম্নীদের নামে তার পরীক্ষা-ফল প্রমাণ হয়েছে; (জানা যাচ্ছে অনীতি দুর্নীতি পালন আছেই) এখন না হয় ও পরীক্ষা বিচার কিছুদিন বন্ধ রেখে

বিধাতার ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্য পরীক্ষার অধীন করা যাক না। দেখা যাক বিষে বিষক্ষয় হয় কি না। মানুষের নীতিবোধও প্রবল নয়।

পরিশেষে আর একটি কথাও বলা দরকার। সেটা হচ্ছে এই ঃ—অনেকে বলেন যে, (১) মেয়েদের লেখাপড়া বা উচ্চশিক্ষার কি এমন দরকার,—সে তো কাজ করতে যাবে না, বা চাকরী করে সংসার প্রতিপালন করবে না, অতএব মেয়েদের লেখাপড়ায় কি উপকার দিবে! (২) আর স্বামীরা বা অন্য সকলে এই লেখাপড়া চান না। লেখাপড়া অথবা শিক্ষার প্রয়োগ দু'রকমের, একটা মুখ্য অন্যটা গৌণ। যেটা মুখ্য, সেটা হচ্ছে নিজের মনের জন্য, জ্ঞানের জন্য, কালচারের জন্য, (কিন্তু এইটা হয়েছে গৌণ)। আর যেটা গৌণ সেটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শিক্ষার কার্যকারিতার দিক, ঐ উপকারে লাগার দিক অর্থ অর্জনের ক্ষমতা (এইটেই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরে নেওয়া হয়)। এঁদের ঐ প্রথম আপত্তির জবাব হচ্ছে, মানসিক উৎকর্ষতে মেয়েদের নিজেদের প্রয়োজন আছে, তাঁরা সেটা বলে এবং সেটাতে অভিভাবকের বা কারুর আপত্তি থাকা অন্যায়, উচিত নয়। তাঁদের আপত্তি তোলার অধিকার থাকাই উচিত নয়। যদি শিক্ষা পাবার সুযোগ থাকে। দ্বিতীয় কথার উত্তর এই, একজন মানুষের মানসিক প্রয়োজনকে আর একজন মানুষ নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়ে চেপে দিতে পারেন না। সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয়ও বটে। এ'ছাড়াও মেয়েদের শিক্ষা লাভ সুমাতৃত্বের জন্য দরকার, আত্মরক্ষা করার জন্য দরকার এবং মানসিক শক্তি, বুদ্ধির মার্জনার জন্য প্রয়োজন আর অনেক সময়েই জীবিকা সংগ্রহের দরকার পড়ে ; এর জন্যও মেয়েদের 'আওতায়' মানুষ করে রাখার চেয়ে একটু শক্ত করে মানুষ করাই উচিত। কেন না পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র প্রথায় উত্তরাধিকারও তো নেই ; আর দান- -স্ত্রীধন বিষয়েও তো তাঁরা কঠোর নিয়মানুবর্তী। মেয়েদের স্বচ্ছন্দ জীবন ধারণের সব কটা প্রণালীই অভিভাবকের অত্যন্ত শীলযুক্ত শিষ্ট সদয় ব্যবহারের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অন্যরূপ হলে বলবার কিছু অধিকারও থাকে না। শিক্ষার দরকার এ'র জন্যও এবং ঐ শিক্ষার জন্য স্বল্প ব্যয়ে তা' হবার একমাত্র উপায় সহশিক্ষা।

এখন লিখতে পড়তে জানা মেয়ের সংখ্যা (শিক্ষিতা নয়) দিই, "১৯২১ সালে ৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের মেয়েদের মধ্যে হাজারে ২১ জন লিখন পঠনক্ষম ছিল। ১৯৩১ সালে ৩১ জন ছিল।"

(প্রবাসী, ১৩৪০ অগ্রহায়ণ)

অর্থাৎ শতকরা তখন আমাদের দু'জন প্রায় ছিল, হাজারে গিয়ে ২-এর ওপর ১ ছিলেন। এখন এক আধ দিন নয়, দশ বছরে আমাদের শতকরা ঐ প্রায় ১ জনই বেড়েছে। এও লিখতে পড়তে পারা শুধু গড়ে। লিখনপঠনক্ষম পুরুষ হচ্ছেন বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান মিশিয়ে ১৮০ জন হাজারে। ১৯২১ সালে ছিলেন ১৮১ জন। এক্ষেত্রে একজন কমেছে আবার।

এই তো আমাদের অক্ষর পরিচয়ের নমুনা বা বর্ণ-পরিচয় জ্ঞান। মনে হয়,—যদি ছেলেমেয়ে এক স্কুলে পাঠশালায় পড়ার প্রথা চলে, তা হলে প্রতিযোগিতায় ছেলেরা স্বভাবতঃই মেয়েদের চেয়ে ভালো আর বড় হতে চাইবে। এতে শিক্ষার প্রসার হতে পারে উভয়তঃই। এ-ও অনেক লাভ।

এই লেখার পরে গত ২রা ডিসেম্বর স্কটীশচার্চ কলেজের প্রতিষ্ঠাদিন উপলক্ষ্যে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ আর্কুহার্ট বলেছেন, "কুমারী সুজাতা রায় বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে মেডেল পেয়েছেন এবং বর্তমান বৎসরে যে সব ছাত্রী আমাদের কলেজ থেকে পোষ্টগ্রাজুয়েট শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতে গেছেন, তাদের সম্বন্ধেও আমাদের গর্ব অনুভব করবার কারণ রয়েছে। দুই বৎসর আগে আমাদের কলেজের কুমারী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পেয়েছেন। ইনি বর্তমানে দর্শন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমাদের এই কলেজের আরো দুজন ছাত্রী দর্শনশাস্ত্রে ও ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। কুমারী চামেলী দত্ত পদার্থবিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইনি দুই বৎসর পূর্বে আমাদের কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

ছাত্রীদের কৃতকার্যতার বিষয়ে আমি এও বলতে পারি যে গত বৎসরের অভিজ্ঞতা অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা সহ-অধ্যয়নের সার্থকতা সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত করেছে। স্ত্রীলোকদের জন্য কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-লাভের পথ বন্ধ না করা পর্যন্ত উহাই বঙ্গের শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের এক মাত্র সম্ভবপর পন্থা। শুধু মাত্র মেয়েদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত কলেজ সমূহের সার্থকতা যতই থাকুক না কেন, বর্তমান অর্থসংকটের সময় উহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ছেলেদের কলেজে মেয়েদের স্বতন্ত্র সময় ক্লাশ করার কোনো মূল্য আছে কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। এতে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র জীবনের কোন সার্থকতা হয় না; এর দ্বারা দিনের অস্বাভাবিক সময় পর্যন্ত লেকচারে ভিড় জমে যায়। আর অবশিষ্ট সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা থেকে বিরত থাকে এবং বিশেষভাবে যারা হোস্টেলে থাকে, বাড়ীতে থাকে না, তারা নিজেদের কোনো উন্নতির কাজও করতে পারে না।"

জয়শ্রী, ১৩৩৯

অওরৎ ও হাতিয়ার

লেখাটার ওপরকার নাম দেখে বলা বাহুল্য বোঝা যাবে এদেশী নাম নয়।

কিন্তু নারী বা অওরৎ সকল দেশেই আছে, যতবারই (বলতে গেলে প্রত্যহই) নারীহরণ, নিগ্রহ, অত্যাচারের কথা পড়ি, মনে পড়ে যায়, ঐ অওরৎদের দেশের কথা।

এই অভিনব আশ্চর্য কাহিনীর মত সত্য ঘটনা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হয়ে চলেইছে, আর শাস্তি, আন্দোলন, আশ্রমবাস, পরিত্যাগও সঙ্গে সঙ্গে চলছে, অথচ বন্ধও হয় না, বন্ধ হবার কোন গতিকও দেখা যায় না। এর মূলে যে কি কারণ, এর নির্ণয় করলে তবে এর প্রতিকার হয়তো হয়, তার সময় হয়তো সরকারী মতে আসেনি ; কিন্তু এই নিতান্ত নির্জীব নিরীহ ভীরু মেয়েদের মতকে জনমতে নিয়ে চলা উচিত, আর এই ঘটনা হওয়া সম্বন্ধে চুপ করে থাকা উচিত নয়। যারা হৃত হয়, অপমানিত হয়, 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা' হয়ে জাত, মান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, ভবিষ্যৎ সব হারিয়ে বসে রইল—এক-কথায় সব হারিয়ে,—(কেন না ছোঁয়া গেলেই তো গেল!) ঐ ঘায়ের মতই অস্পৃশ্য ঘৃণ্য অবস্থায় আমরণ বেঁচে থাকবে তার মধ্যে আমাদের দু'দশজন সহরবাসিনীদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই বলে তো নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। দিনে দিনে পতিতার সংখ্যা, আর অনাচারের সংখ্যা আরও বেড়েই চলবে তাতে।

বাঙ্গলায়, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, পাঞ্জাবে, রাজপুতনায় পর্দানসীন হিন্দু-মুসলমান মেয়েও আছে, আবার গরীব অরক্ষিত কায়িক পরিশ্রমে দিনাতিপাত করে এমন মেয়েও আছে। হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা কোথাও কম-বেশী সংখ্যা, কোথাও সমান সংখ্যা তাও আছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের মেয়েদের মত এমন লাঞ্ছনার কথা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব মেয়ে—আর কোথাকার কাগজে বেরোয় না। আমার মনে আছে, বছর কয়েক আগে রাজপুতনায় বাড়ীর এক চাকর লোকের বসতি পল্লী থেকে বেশ খানিক দূরে তার বাড়ী করেছিল। কাছাকাছি তার বাড়ীর থেকে ছিল স্টেশন, আর একদিকে ছিল সুতোর কল, জলের কল (Water Works)। তার কুলীমজুরের সংখ্যা কম নয়। মাঝখানে মাঝখানে ছোটখাটো বস্তি। তার মাঝে একটু ঘনগোছের ঝোপে ঝাড়ে কাঁটাবনে ভরা বনও আছে। রাত্রের পথে ছোট বাঘ, চিতাবাঘেরও দর্শন দুর্লভ নয়।

বাড়ী যায় সে অনেক রাতে। তার চার পাঁচটি মেয়ে আর স্ত্রী, আর পুরুষ নেই বাড়ীতে।

বাঙ্গলাদেশের বাসি কাগজে পুরানো খবর পৌঁছায়, তবু দেশের কথা পড়ে পড়ে আশ্চর্য হই। একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার ঘরের মেয়েদের যে সে একলা ফেলে রেখে সেই ভোরে চলে আসে, আর রাত্রি ১০টা ১২টায় যায়, তারা কেমন করে একলা থাকে?'

সে দুঃখিতভাবে বল্লে—'কি আর করব, চাকরী করতে হবে তো!'

তাদের বিপদের কথা, ভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বাঙ্গলা দেশে স্বামীর পাশ থেকে, বাপের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তো!

এবার সে বল্লে—'হাতিয়ার আছে ঘরে। প্রতিবেশী আছে পাশে, তাদেরও হাতিয়ারশূন্য ঘর নয়।' (হাতিয়ার অর্থে অস্ত্র।)

এমন নিশ্চিন্ত আশ্বস্তির সুরে সে বল্লে, 'হাতিয়ার আছে ঘরে'—যে আশ্চর্যও লাগল, আনন্দও হ'ল।

তাকে দেখে খুব মহাবীর বলে মনে হ'ত না। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ ৪৫ বছরের প্রৌঢ়। তার মেয়েদেরও রাজপুত মেয়েদের মত বীরাঙ্গনা ভাবার অবকাশ ছিল না, কেননা দেখেছিলাম তাদের চেহারা, ক্ষীণাঙ্গী বালিকা মাত্র। জাতে নাপিত, নরুণধরা জাত। ওখানে বাসনমাজা জাত; ক্ষত্রিয়োচিত কাজও নয়, নিতান্ত অবীরাদের মত কাজ। অতি নম্র গরীব স্বভাব। কিন্তু তার আত্মরক্ষা করবার, আত্মসম্মান রক্ষা করবার উপায় আছে ঘরে। ক্ষমতা তার আছে কিনা সেও জানে না, আমরাও জানি না, কিন্তু সে জানে উপায় আছে। প্রতিপক্ষ কেউ থাকলে সেও জানে, উপায় আছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই প্রতিপক্ষের সেটা জানা। যা হোক, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হাতিয়ার আছে তোদের?' বল্লে, 'বর্শা, তলোয়ার, ছোরা, বন্দুক, লাঠি এই সব।' তাই হাসলেন, বল্লেন, 'সেকেলে দেড়মণি বন্দুক তুলতে পারিস?'

আমরাও হাসলাম, বল্লাম, 'চালাতে পারিস?' 'হাঁ—সক্‌তা!' অর্থাৎ পারি। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে বললে, 'পারি।'

এই পারার কথাই হচ্ছে গোড়ার কথা। শুধু গোড়ার নয়—মাঝের শেষের সবই। প্রতিকার করবার যার ক্ষমতা আছে, তাকে প্রতিপক্ষ ঘাঁটায় না, এ যুদ্ধ-লিপ্সুদের মধ্যেও দেখা যায়—কাপুরুষদের মধ্যেও আছে।

তাই এ 'সক্‌তা' কথাটির অত মূল্য।

অনেকেই হয়ত জানেন না, রাজপুতনায় অস্ত্র আইন নেই। তলোয়ার, কিরীচ, ছোরা, বন্দুক, বর্শা—যাই হোক, সেকেলেই হোক, আর একেলেই 'হাতিয়ার' হোক, ওদের ঘরে ওরা রাখতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। নিরীহ মালীর ঘরে, তাঁতী, তেলী, নাপিতের ঘরে, কুমারের ঘরে—নিতান্ত নিরীহ গরীব চাষী কৃষাণদের ঘরেও হাতিয়ার থাকে। মরিচাপড়া তলোয়ার, বর্শা, ছোরা, মাটির দেওয়ালে,

ঘরের কোণে, ময়লা কাপড়ের সঙ্গে, ঝুড়ির সঙ্গে, কাস্তে কোদাল খুরপোর সঙ্গে আছে। আর খড়ের চাল বাঁশের আগল দেওয়া ঘরে স্ত্রী কন্যা নিয়ে হয়ত আরও সব পরিজনদের নিয়ে দীন গৃহস্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

যদি কেউ আক্রমণ করে, হাতিয়ারে আত্মরক্ষা করবে, প্রতিপক্ষকে ঠেকাবে, না পারলে মেয়ের হাতিয়ার দিয়েই মরে সম্মান মর্যাদা রক্ষা করবে। পাট ক্ষেতে, ধান ক্ষেতে, নৌকার পরে নৌকা করে দিনের পর দিন একটি মাত্র নারীর ধর্ম, মান, দেহ, মন, আত্মাকে অসংখ্য দুর্বৃত্ত দুরাচারের হাতে ছিন্নভিন্ন হতে দেবার সুযোগ নেই। সে কিছু না পারুক, মরতে পারবে ওদের হাতে পড়বার আগে।

কাগজে দেখলাম, সেদিন পার্লামেন্টে এই কথা উঠেছে, সহকারী ভারতসচিব মহাশয়ের জবাব—"না, কোথায় বেশী! প্রতি বছরেই যেমন হয়, তাই!"

এই প্রসঙ্গে 'দেশ' লিখছেন, ১৯৩২ সালের বাঙ্গলা পুলিশের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নারীহরণ ও নারীনির্যাতন সম্পর্কে লেখা হয়েছে—"নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচারমূলক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যাইতেছে। ১৯৩২ সালে ঐ দুই শ্রেণীর অপরাধে ২৩৪ ও ৪৫৯টি মোকদ্দমা সত্য বলিয়া রিপোর্ট করা হইয়াছে। (১৯৩১ সালে উহাদের সংখ্যা ছিল ২১২ ও ৩৮৭।) ...বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলী জেলায় যথাক্রমে ২১, ২০, ১৭টি এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িয়েছে।"

বাঙ্গলা সরকার এর ওপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"এই অপরাধ ৯৪টি বেড়েছে, এর প্রতিকারের জন্য জোর তদন্ত করা হবে।" এবং অন্যত্র বলেছেন—"পুলিশকে এবিষয়ে অবহিত হতে।"

ভারত সরকার, বাঙ্গলা সরকার, আর বাঙ্গলার লোকের এ বিষয়ে মতামত ও প্রতিকার চেষ্টা যেমন গয়ংগচ্ছভাবে চিরকাল হয়, তাই হচ্ছে এবং আমরাও কাগজে একটি করে ঘটনা পড়ছি এবং শিউরে উঠছি। কিন্তু সত্যিকার প্রতিকার যে কবে হবে, আর কাকে বলে, আর কেনই বা হয় না—এর কারণ কোনখানে তাই ভাববার।

যদি দেশ দেশান্তরে চেয়ে দেখি, যদি যুগান্তরের ইতিহাসের পাতা খুলি, যদি স্বাধীন দেশের নারীকে দেখি, তাহলে আমাদের ঐ চোখে পড়ে, আত্মরক্ষা এবং আততায়ীকে তখনি প্রতিরোধ করবার জন্য তাদের ঘরে উপায় ছিল এবং আছে। তাদের 'হাতিয়ার' ছিল বা আছে এবং তাই পুরুষের শৌর্য আছে এবং নারীর মান আছে। এদেশেরও এক এক সময়ে কেউ কেউ (চপলাসুন্দরীরা দুজন) বঁটী দায়ে আত্মরক্ষা করেছেন। অথচ বিছানার নীচে, হাতের কাছে, পুকুর ঘাটে, ক্ষেতের পথে তো মানুষ আঁশ বঁটী বা তরকারী বঁটী কিংবা দা, কাটারী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না এবং দা ও বঁটী কিছু এমন অস্ত্র হাতিয়ার জাতীয় জিনিস নয় যে, ইচ্ছামত চালনা করতে মানুষ অভ্যস্ত থাকবে, অথবা অনেককে ঠেকাবে

এবং আরও এককথা, সেটি প্রতিপক্ষের হাতেও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে যদি গ্রামবাসীর ঘরে শাসন করবার মত অস্ত্র থাকে, তাহলে হয়ত এই অতিশয় কলঙ্ককর, রাষ্ট্রের—সমাজের—মানুষের—নিবীর্য অখ্যাতিকর, নিন্দার্হ, ঘৃণিত, কলঙ্কের কাহিনী আর পড়ে জেনে শিউরে উঠতে হয় না। দুর্বৃত্তের দণ্ডও হয়, ভয়ও হয় ও শ্রেণীর দুর্বৃত্তেরা কাপুরুষ হয় স্বভাবতঃই।

এই নিরস্ত্র, নিবীর্য, বহুদিন নির্বল জাতের স্বভাবতঃই অস্ত্রশালী কিংবা একাধিক প্রতিপক্ষের কবলে গিয়ে পড়তে ভয় হয়। সেখানে অস্ত্র থাকলে নিবীর্য লোকেরও 'মরি বাঁচি' মনোভাব একটা জাগে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যুও হয়। সেদিনও কাগজে পড়লাম, একজন মেয়ের আত্মীয়ের মৃত্যু-কাহিনী। অন্যদেশী মুসলমান মেয়ে, কাশ্মীরি মেয়ে, শিখ মেয়ে, পাঞ্জাবী, বিহারী, রাজপুত মেয়ে, গরীব সকলের খুব পর্দা নেই, সুশ্রী সুন্দরী বাঙলা দেশের চেয়ে অনেক বেশী, অনুপাতে হিন্দু মুসলমান, দুশ্চরিত্র পুরুষও নিশ্চয়ই ওদেশে আছে; কিন্তু আশ্চর্য তাদের দুশ্চরিত্রতা এবং দুষ্টবৃত্তি বাঙলার মত এমন হীন চরম পৈশাচিক নয়। একে পাশব বলাও যায় না, কেননা পশুরাও প্রাকৃতিক নীতি মানে, পশু জগতেও এত হীনতা দেখা যায় না। এখানকার ঘটনা পশু জগতের সীমাও অনেকদিন অতিক্রম করেছে।

বাঙলা দেশের মেয়ে অরক্ষিত, পুরুষ নিবীর্য, সরকার উদাসীন, গ্রামবাসী নিরস্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান আত্মকলহ কখন জাগে, তার ভয়ে আড়ষ্ট, তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঐ ঘটনা চলছে। কারু কন্যা, স্ত্রী, বোন নিয়ে দিন কাটানো শক্ত।

শিখদের আছে কৃপাণ, রাজপুতদের 'হাতিয়ার' থাকেই, নেপালীদের আছে কুকরী, অন্য জাতিদের লাঠি আছে; পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহারের গ্রামের মেয়েদের ছেলেদের সকলেরই দূরপথের সম্বল লাঠি।

শুধু বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের হাতেও কিছু নেই, ঘরেও কিছু নেই এবং অন্তরে দিন দিন পশুবৃত্তি জেগে উঠছে। নারী দেহ এদের কাছে কি, তার সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না। এর প্রতিকার অবলাশ্রম এবং আশ্রয়চ্যুতাদের রক্ষাগারই শুধু নেই; সেতো পরের কথা. যা করবার তার জন্য।

এর জন্য জিজ্ঞাস্য এই, দিনের পর দিন এই রকম আর কতদিন ধরে চলবে? সমস্ত ভারতবর্ষের মেয়েদের নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দিক থেকে এই প্রশ্ন ওঠা দরকার।

এর জন্য শাস্তি, পুলিশ, বিশেষ ধারা, বিশেষ পুলিশ, বিশেষ শাস্তি, বিশেষ নিয়ম কেন হবে না? যে নারীর উপর একদল ইতর ঘৃণ্য অত্যাচার করবে, তার দেহ মন সমাজ আশ্রয় থেকে টেনে নিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে, তাদের সেই সুযোগ না হওয়ার জন্য, ভবিষ্যতে আবার না হয় তার জন্য, সেই সব গ্রামে কি ব্যবস্থা

হয়েছে ? শুধু ঐ শ্রেণীর অত্যাচারের দমনের জন্য বিশেষ পুলিশ সেই সব গ্রামে কেন থাকবে না ? এবং তাদের কঠোর দণ্ডই বা কেন হবে না সকলেরই ? কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত আমীর আলী মহাশয়ও এই অপরাধের জন্য গুরুদণ্ডের কথা বলেছিলেন মনে হচ্ছে।

এছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এমন ইতর অত্যাচার হয়, নৃশংস নারী-লোলুপতা আছে, এ আলোচনা প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে হওয়া উচিত। সেই সব ক্ষেত্রে কি উপায় নেওয়া হয় দমনের, অথব সেই সব ক্ষেত্রে যদি এরকম ব্যাপার না হয়, তারই বা কি কারণ, এও দেখা দরকার।

(মনে হয়, আরও একদিক এর আছে, দেশে কর্মশিক্ষা নেই, ধর্মশিক্ষা নেই, বীরধর্ম, চর্চার সুযোগ নেই, লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নেই, আনন্দের চর্চার কেন্দ্র নেই, সমাজের ভদ্র-আবেষ্টন নেই, তাই এরা একমাত্র হীনবৃত্তি নিয়ে কাপুরুষের মত নারীর উপর দুর্বলের উপর অত্যাচার করে।)

ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে দেখলাম, সরকার এই শ্রেণীর অপরাধের শাস্তি ও দণ্ডের বিষয়ে দেশবাসীর মত চেয়েছেন। তাতে খুলনাবাসীদের মত বেত্রদণ্ডের সপক্ষে। 'মডার্ণ রিভিউ' বলেন "বেতমারা বর্বরোচিত দণ্ড হলেও এক্ষেত্রে বিশেষ করে দলবদ্ধভাবে যখন এই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তখন হওয়া উচিত।" এ ছাড়াও 'মডার্ণ রিভিউ' বলেন, "যে ক্ষেত্রে অত্যাচারিতা মেয়েটিকে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাদের সাহায্যকারীদের সম্পত্তি যা থাকে, তা বাজেয়াপ্ত করা উচিত শাস্তির সঙ্গেই এবং প্রয়োজন হলে দলবদ্ধ অত্যাচারের ক্ষেত্রে 'ষ্টেরিলাইজেশনের'ও আমরা বিশেষভাবে ও একান্তভাবে পক্ষপাতী।

আমাদের বক্তব্য, যদি গ্রামবাসীর নিরস্ত্রতার সুযোগ ওরা দলবদ্ধভাবে নেয় তাহলে সশস্ত্রতার সুযোগ দায়িত্বসম্পন্ন গ্রামবাসীদের পাওয়া উচিত। অথবা বিশেষ পুলিশ বা চৌকীদার বন্দোবস্ত করা দরকার এবং এও হতে পারে, যে শ্রেণীর দ্বারা এই অত্যাচার হয়, সন্দেহ হয়, তাদেরই ঐ গ্রামের নারীরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া এবং অত্যাচার হলে তাদেরই গুরু দণ্ডদান, 'মডার্ণ রিভিউ'র উল্লিখিত শাস্তি বিধান করা উচিত।

গবর্ণমেণ্টের এটা সবসময়ে মনে থাকা দরকার, নারী তার নিরুপায় নিরীহ প্রজা, নিজের ঘরে সে স্বচ্ছন্দে বাস করতে যদি সে নির্যাতিত ও অসম্মানিত হয় থাকতে না পায়, সেটা সেই শাসনতন্ত্রের প্রকাণ্ড কলঙ্ক।

কোন সভ্য দেশে এই কলংক এত বড় আছে, আমরা জানিনা। *

* এই লেখা শেষ করার পর এই পৌষের প্রবাসীতে দেখলাম, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশসমূহে এইরূপ যে অত্যাচার হয়ে থাকে, তার পুলিশ রিপোর্ট দেখা গেছে।

প্রদেশ	লোক সংখ্যা	১৯৩২ সালের নারী হরণাদি অপরাধ
পাঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫২	৫০৪
আগ্রা অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	৭১১
বাঙ্গলা	৫০১১৪৩'২	৬৯৩

দেখা যাচ্ছে এই জিনিস অন্যত্রও আছে। তাতে অবশ্য প্রবাসীর অভিমত অনুসারেই বলতে হয়—"বাঙ্গলার স্থান অধমতম হয় না" এবং আমাদের বক্তব্য যদি কমই হয়, তা' হলেও অপরাধ একটি দু'টি কমে যায় আসে না, তাতে অপরাধের ক্ষালণ হয় না, দোষ হয় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি এই শ্রেণীর নির্লজ্জ অনাচারের বিরুদ্ধে বা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নিখিল মহিলা সম্মিলনী একটি কথাও উত্থাপন না করাতে। ঐ প্রদেশীয়া প্রতিনিধি মহিলা সকল দেশেরই ছিলেন তাতে, শুধু রাজপুতনা বাদ ছিল দেখলাম। —দেশ

জয়শ্রী চৈত্র ১৩৪০

নারীশালা—হারেম—নারী

নারীশালা (১)

এদেশে আমাদের ২০০ ২৫০ বছর আগে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে বহু পত্নীক মানুষ ছিলেন। স্ত্রী তাঁদের শোনা গেছে ৫০।৬০।৭০।১০০।১১০ সংখ্যকও থাকত অনেকেরই। কোন কোন সময় তিন চারটি কুলীন কন্যা ভগিনীরা একটি সৎপাত্রেই সমর্পিত হতেন। আমিও দু'একজন বৃদ্ধা রূপবতী কুলীন বধূ শ্বশুরবাড়ীতে ক্রিয়াকর্মে দেখেছি ছেলেবেলায়। তাঁরা রান্না ও অন্য কাজে খ্যাত-নামা। অন্য সুনামও কারুর শোনা যেত নানা ইঙ্গিতে। স্পষ্ট নয় যদিও। এদের এই কুলীন জায়াদের কথা 'হারেম' কাহিনীর সঙ্গে বলার উদ্দেশ্য—এর কৌতুকময় দিক হল এঁরা কেউই স্বামীদের 'ভার্যা' বা 'ভরণীয়া' হতেন না। স্বামী মহাশয়রা বিয়ে করেই খালাস। ভার্যারা ছিলেন ভরণীয়া পিতা, ভাই ও স্বজনদের আর সেই আশ্রয়েই থাকতেন। খেটে খেতেনও দুর্যোগের দিনে। পতিগৃহে 'পত্নী' নিবাস বা 'হারেম' থাকত না কারুরই। অর্থাৎ 'নারীশালা' ছিল না।

এই প্রসঙ্গটি মনে আসার কারণ হল, সম্প্রতি ফাল্গুন ১৩৭৭ ও আর পরের কয়েক সংখ্যা একটি পত্রিকায় মোগল বাদশাদের—আকবর শা'র হারেম প্রসঙ্গে দেখলাম।

তাতে বলা হয়েছে, আকবর শা'র অন্তঃপুরে পাঁচ হাজার নারী ছিল। সেটা কিন্তু প্রসঙ্গ নয়। বক্তব্য, কথা ও প্রশ্ন ছিল, তাদের সকলের থাকার জন্য একখানি ঘর বা ঘরদুয়ার পৃথক ভাবে ছিল কিনা?

নারীশালা (২)

দিল্লী আগ্রার মোগল প্রাসাদ যতটুকু দেখা আছে তাতে পাঁচ হাজারখানি অথবা হাজার দু'হাজার ঘর বিশিষ্ট 'হারেম' দেখা যায় না, আছে মস্ত মস্ত দালান। কারুকার্যময় খিলান ও থামওয়ালা বড় বড় ঘর। দুয়ার জানালার বালাইহীন। প্রাসাদের কোন্‌দিকে কোন্‌ নিবাস, কোন্‌খানে বাঁদী ও রক্ষিতা নারী নিবাস, তার কোন বিশেষ নিদর্শন এখন আর দেখা যায় না। যদিও 'মছলিভবন' (স্নানাগার) 'দশ পঁচিশ খেলার ঘুঁটি' আর ওখানে দরবার কক্ষ আদি নানা নামের ঐ দালান ঘর তাতে আছে। যদিও ছোট বড় আখ্যার কোন নারীদের পৃথক আবাস বা কক্ষময় বিভাগীয় প্রাসাদ ছিল, কাহিনী (এখন

দেখা যায় না) শোনা আছে। কিন্তু বাঁদী বা পরিচারিকা অথবা রক্ষিতাশালা পৃথকভাবে দেখা যায় না।

কিন্তু মোগল পাঠানদের অনুকরণ করে সেকালে রাজা-নবাব মহারাজা যাঁরা জীবন যাপন করতেন, এই প্রসঙ্গে তাঁদের জীবনযাত্রার ধরন দেখলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হতে পারে।

আমি দেখেছিলাম একটি এই ধরনের 'হারেম' বা নারী নিবাস। দেশটি হল রাজস্থানের জয়পুর। ঐ কালটা এই সেদিনো ছিল। হয়তো এখনো কোন কোন রাজ্যে আছে। বহু বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ হলেও বহু নারী জমা করতে তো নিষেধ বা বারণ নেই ১৩১১।১২ সাল থেকে এ দেখা ও শোনা আমার ১৩১৫। ১৬ অবধি বলা যায় মোগল প্রাসাদের ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এই সব রাজা মহারাজাদের রাজপ্রাসাদ। প্রাচীর ঘেরা সহরের প্রায় আড়াই ভাগই এই প্রাসাদ এলাকা। কিন্তু দেখেছি সেই পর্দানসীন দেশ সেকালে। কাজেই কোন্ এলাকা কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে, আর কোথাও তার সীমানা, তা আমাদের মেয়েদের জানা দেখা সম্ভব ছিল না সেকালে। সহরের সাত গেট। লোক চলাচল ৪।৫ টায় বেশী। বাকিগুলো প্রায় বন্ধ। দরবারে এবং উৎসব দিনে খোলা হত। যেমন সুরয পোল এবং (অম্বর) আমেরী গেট। রাজপ্রাসাদের এলাকার প্রধান তোরণ দ্বার হল ত্রিতোরণ বা ত্রিপোলিয়া এবং গণগৌরী দরওয়াজা। এ দুটি মঙ্গল তোরণ দ্বারও বটে। অফিস এলাকা 'ত্রিপোলিয়া' (তেমাথাও) পথে তার প্রধান প্রবেশ দ্বারও সেটা। অন্যদিকে শ্রীজী (রাজার) অর্থাৎ রাজকীয় তোরণদ্বার। সে গেটে গেলে পড়ে অফিস আদালত রাজপ্রাসাদের দরবার প্রাসাদের পথ। দিকে দিকে হাতিশালা (পিলখানা), অশ্বশালা (তবেলা), গোশালা, উটশালা, রথশালা ঐ সব রক্ষক পালকদের আবাসগৃহ—কি নয়। একদিকে অন্যত্র জ্যোতির্বিদ জয়সিংহ রাজার বিখ্যাত মানমন্দির। যন্ত্রমন্দির—যন্তর মন্দর—যন্ত্র মন্তর। অন্য দিকেও একটির পর একটি করে চারটি তোরণ পার হয়ে একদিকে পড়ে গোবিন্দজী, গোপালজী, গঙ্গাজীর মন্দির। গোবিন্দজীর মন্দিরই সবচেয়ে বড়।

ঐ প্রবেশ তোরণের বাঁদিকে পড়ে বিখ্যাত প্রাসাদ হাওয়া মহল। আর মন্দিরের সামনে বিশাল বাগানের ওধারে ওপারে দেখা যায় চন্দ্রমহল। রাজার শয়নপ্রাসাদ।

তারপরেই তার সঙ্গে সুরু হয়ে যায় প্রাসাদ সীমানা। কতদূর বিস্তৃত কোন্‌খানে তার অন্তঃপুর বা নারীশালার এলাকা সীমানা আরম্ভ আর শেষ কোথায় আমার জানা নেই। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ নরনারী নির্বিশেষে। শুধু খোজা প্রহরী বাঁদী আর দাসীরা যাওয়া আসা করে। তাও পাশ অর্থাৎ ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাকতি (পিতলের বা তামার) দেখিয়ে। যাকে মোগল হারেমে বলা হত পাঞ্জা।

নারীশালা (৩)

এখন নারীশালা বা হারেমের অধিবাসীদের অভিধা বা সংজ্ঞা নামের কথা বলি।

কয়েকবার প্রাসাদে জলসা উৎসবে যাবার সুযোগ হয়েছিল। রাধাষ্টমী উৎসবে (রাজার ইষ্টদেব তিনি) লাডলীজী (আদরণীয়া নামে) একবার যাওয়া হয়। সে উৎসব রাজার নিজ মহলে। সেটা বাৎসরিক উৎসব। তাতে 'খেতাব', 'খেলাত' পুরস্কার দেওয়া হত প্রিয়পাত্র ও অনুগ্রহভাজনদের। নানারকম সে পুরস্কার। (১) তাজিমী সর্দার। রাজা তাঁদের দেখলে উঠে সম্মান জানাবেন। তাঁদের সোনার মল দেওয়া হত পাঁইজোড়ও। রাজপুত সর্দারদের মল পায়ে দেওয়া (কড়া) রেওয়াজ ছিল। মোটা দুটি সাদা বালার মত মল দুটি। (২) 'শিরোপা' মাথার পাগড়ী প গহনা। (৩) জায়গীর—নিষ্কর জমিদারী। (৪) নামের খেতাব যেমন 'খুশনজর', 'দিলখুশ', 'খুশবদন' (চোখপ্রীতকারী হৃদয় খুশীকারী)। এগুলো প্রায় সর্দার খোজাদের দেওয়া হত। এই সময় সর্দার খোজা ছিলেন খুশনজরজী।

এই প্রাসাদের জলসায় দেখেছিলাম যাঁদের—যে নারীদের, তাঁরাই হচ্ছেন নারীশালার চির অধিবাসিনী। এই নারীশালায় অধিবাসিনী হলেন সাত শ্রেণী। (১) মহারাণী (২) অন্য রাণীরা (৩) পাশোয়ানজীরা (রাজপ্রেয়সীর দল) (৪) পর্দায়েতজীরা (এঁরাও রাজপ্রিয়া) (৫) সখিদের দল (৬) পাত্রীনামে বালিকার দল (৭) দাসী শ্রেণী বাঁদী শ্রেণী।

মহারাণীর নারীশালা (ক)

মহারাণীর বিশাল প্রাসাদ, বিরাট অট্টালিকা। বড় বড় দালানের মত ঘর ও সামনে দালান। পাশে ছাত। ছাতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সীমা কম নয়। নীচে একদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাসাদের তলায় সম্ভবতঃ নিম্নস্তরের দাসী শ্রেণীর ঘর। কিন্তু পাত্রী ও সখিদের ঘর দুয়ারও থাকতে পারে। কিন্তু একদিক দিয়ে চলেছে বিশাল সুড়ঙ্গ পথ। সেই সুড়ঙ্গ পথে এ প্রাসাদ থেকে অন্য রাণীদের প্রাসাদে যাওয়া চলে। অলিগলির মত বাঁকা চোরা জানলা দরজাহীন নিরালোক অদ্ভুত সুড়ঙ্গ পথ। দিনে বা রাত্রে সব সময়েই মানুষের বুক সমান উঁচু বড় বড় পিলসুজের ওপর সবার মত প্রদীপ জ্বালা থাকত সুড়ঙ্গের প্রতি মোড়ের কোণে কোণে।

এক প্রাসাদের সুড়ঙ্গ থেকে অন্য প্রাসাদে যাবার সুড়ঙ্গ পথ চাবিবন্ধ। সে চাবি কুলুপের চাবি খোজাদের হাতে। সর্দার খোজার হেপাজতে। যারা

অন্তঃপুরের দ্বিতীয় হর্তাকর্তা বিধাতা বিশেষ। রাজার প্রতিভূ। এবং আশ্চর্য এই খোজারা সবাই মুসলমান। তবুও হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরচারী। রাজার একান্ত বিশ্বাসজনক। রাণীদের কাছেও সম্মানিত ও সমাদৃত। দেখেছি অনায়াসে মহারাণীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জনান্তিকে অথবা প্রকাশ্যে কথাবার্তা কয়, হাসে। কারুর কারুর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতেও দেখেছি সখি পর্দায়েত পাশোয়ানদের।

এই সব রাণী মহারাণীর এক একজনের সখি সঙ্গিনী অনেক। দুশো আড়াইশো তার বেশী কম সখিশ্রেণী ও পাত্রীদল থাকত। কিছু তারা রাণীদের পিতৃগৃহ থেকে পাওয়া। কিছু পতিগৃহেও সংগ্রহ করে নেওয়া হত পদানুসারে। কিনে আনা, স্বেচ্ছায় আসা, বিগত রাণীদের বেওয়ারিশ সখি পাত্রীদেরও আবার পরবর্তী রাণীদের মহলে জায়গা মিলে যেত।

তখনকার মহারাণীর ছিল প্রায় আড়াইশো সখিপাত্রী। দলের বালিকা মেয়েদের বলা হত পাত্রী। ৫।৬ বছর থেকে ১৫।১৬ বছর অবধি। তারপরে তারা সখি পর্যায়ে উন্নীত হত। সখি থেকে যদি রাজার নেত্রগোচর হয়ে 'নেক-নজরে' পড়ত, তখন তাদের খেতাব ও আখ্যা দেওয়া হত 'পর্দায়েত'। এই পর্দায়েতরা আরো বিশেষ সম্মান পেলে হতেন 'পাশোয়ান'।

এই সখিদের পাত্রীদের কাজ ছিল অন্তঃপুরে নাচ গান করা, অভিনয়, গল্প শোনানো আদি নানারকম ভাবে একঘেয়ে জীবনে রাণীদের চিত্তবিনোদন। চুল বেঁধে দেওয়া। গাহাত টেপা মার্জনা সেবা। মেহেদী রঞ্জন করা। ছোটখাটো শিল্প কাজ। চুমকী পুঁথির কাজ। ছবি আঁকা। পড়াশোনায় আলাপ, নাটক রচনা। রাধাকৃষ্ণলীলা, ধ্রুব প্রহ্লাদ চরিত্র, রামায়ণ মহাভারতের ছোট বড় কাহিনী থেকে নাটক রচনা করে তারা অভিনয় করতো বিশেষ বিশেষ জলসার দিনে। সে অভিনয় এবং শিল্প-কাজ ও আমন্ত্রিতা অন্য রাণীরা সখি পাত্রীসহ দেখতে আসতেন। এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত কর্মচারীর বাড়ীর মেয়েরাও আমন্ত্রিত হতেন। সে সব উৎসব বা জলসা কখনো ঘণ্টাদুয়েকের মত কখনও সারারাত্রি ধরে। রাজা ও রাণীদের 'মর্জি' ও প্রথানুসার হত।

অন্য রাণীর প্রাসাদ (খ)

এঁরা হারেমের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধানার দল। এঁদেরও জলসা উৎসব সখি পাত্রীর সমাবেশ প্রায় মহারাণীর মতই। সকলেরই সখিদের দল পাত্রীরাও যেমন রূপবতী তেমনি নাচগান কারুকাজে অভিনয়ে সুপটু সুশিক্ষিত। মহারাণীর পরে অন্য রাণীদের প্রাসাদও বিশাল। এই সখিরা শিক্ষা পেত কোথা থেকে? পেত পূর্বরাণীদের বড় বড় সখিদের কাছে। রাণীদের (রাজকন্যা) পিত্রালয় থেকে পাওয়া আরেক ধরনের রাজপরিবারের শিক্ষা থেকে। রাণীরা নিজেরাও

বেশ লেখাপড়া জানা হতেন। মাতৃভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, কথাকাহিনী ইতিহাস পড়তে পারতেন। অনেক সময়ে রাজকন্যা না হয়েও মহারাণী হতেন কেউ কেউ। এক্ষেত্রে মহারাণী ছিলেন পোষ্যপুত্র জায়া। এই রাজাকে পোষ্যপুত্র রূপে নেওয়ার আগের বিবাহিতা পত্নী 'ঠাকুর' (জমিদার ঘরের) লোকদের ঘরের মেয়ে। আর অন্য রাণীরা রাজা হওয়ার পরে বিবাহিতা রাণী। তাঁর চারজনই ছিলেন ছোটবড় রাজ্যের রাজকন্যা। তাঁদের মেজাজ এবং দর্প তেজও খুব। কিন্তু প্রধানা মহিষীকে তো অতিক্রম করে যাবার প্রথা নেই। হয়ত পিত্রালয়ে যৌতুকে জায়গীরে সখি সমারোহে এবং চেহারায় আকৃতিতে বিশিষ্ট কিন্তু সম্মানে মেজ, সেজ বা ছোটরাণীই থাকতে হত। অনেক সময়ে তাঁরা বয়সে রাজার চেয়ে বড়ও হতেন। এক রাজকন্যা তো দশ বছরের বড় ছিলেন স্বামীর চেয়ে। এদেরও সখি পাত্রীর সংখ্যা দুশোর ওপরে ছিল জানি।

পাশোয়ানজী (গ)

এঁরাও হলেন রাজার নেকনজরে পড়া প্রেয়সীর দল। সখিদের পদ থেকে পদোন্নতি। দু'তিনজন ছিলেন। নানা জলসায় সখি সমাবেশেই নজরে পড়তেন। কখনো রূপে কখনো নাচ-গানের অভিনয়ে নয়ত কলা কুশলতা কিছুতে এই রাজনজরে পড়া সখিরা রাজপ্রেয়সীর মর্যাদা পেতেন।

এঁদেরও মর্যাদানুসারে ছোট বড় মহল থাকবার জন্য দেওয়া হত। সেগুলিকে বলা হত 'রাওলা'। ঠিক প্রাসাদ নয় রাণীদের মত। কিন্তু পৃথক পৃথক মহল, ভবন, আবাস। দাসী সখি সঙ্গিনী ভরা সে অন্তঃপুরও। কখনো দেখিনি শুধু গল্প শুনেছি।

এঁদের সন্তানাদিরা জায়গীর 'তাজিমী' খেতাব পেতেন! সংজ্ঞা (ছেলে) লালজী সাহেব। (কন্যা) বাঈজীলাল। এদের বিবাহ গৃহ ঘর সব ভাল রকমই হত। কারণ এই সব এঁদের কুটুম্বিতাও হত অন্য রাজ্যের লালজী সাহেবের ঘরে। মোটকথা এঁদের সবাইকে মহাভারতের 'বিদুর ভাই' বলা যায়। রাজকার্যে সম্মানিত পদও পেতেন এঁরা। ঠিক দাসীপুত্র বা বাঁদী সখিপুত্রের মত দাস চাকর ভৃত্যশ্রেণী নয়। এদের জলসার দিনে অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার থাকত। এদের জননীদের দু'একজনকে দেখেছি মহারাণীর প্রাসাদের জলসায়।

তখনো 'পর্দায়েত' পদ। পাশোয়ানের পদের চেয়ে নিচু পদ এইসব পর্দায়েত এই পাশোয়ানের নাম বা খেতাব ছিল রায়। রাণীর পরেই 'রায়' পদ। নতুন নাম ও পদ।

এঁরাও রাজার প্রিয়া। জলসা উৎসবে চুপচাপ একগলা ঘোমটা দিয়ে রাণীদের সারির পাশের বা পিছনের সারিতে বসতেন। রূপ রায়, বসন্ত রায়, লছমি রায়

নাম খেতাব তাঁদের! আবক্ষ অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও দুজনকে পাকেচক্রে দেখতে পেয়েছিলাম।

আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম মোটেই সুন্দরী সুশ্রী নয়। একজন রং ফর্সা হলেও বেশ ট্যারা। অন্যজনের চেহারা মোটেই ভাল নয়। রং ময়লা। অনেক সখি তাঁদের চেয়ে রূপবতী, সুন্দরী।

অবাক হয়ে ভেবেছিলাম কি রূপে বা গুণে রাজাকে মুগ্ধ করেছিলেন এঁরা। নাচে? না গানে? অথবা সেবা করে। প্রেমের লীলা কে জানে। এবং ছেলেমেয়েও এঁদের ছিল। একজনের চার ছেলে। একজনের তিনটি। কন্যাও ছিল শুনেছি। ছেলেরা তখন বেশ বড়। নিশ্চয় বিবাহ হয়েছিল। অভয় সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, গোপাল সিংহ নাম কটা মনে আছে। চেহারা কারুর ফর্সা। কারুর শ্যামবর্ণ। সবাই জায়গীর পেয়েছে। অবশ্য বড়জন। এদের এক্ষেত্রে জননীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাব। বাকি সব 'ছুট ভাইরা' ছোট ভাই, যারা পোষ্য হয়ে থাকবে বড়র আশ্রয়ে।

আরো আশ্চর্য এই যে রাজার এই 'সখি' রক্ষিতা পুত্র এতগুলি থাকলেও পাঁচ জন রাণীর একজনেরও সন্তান হয়নি।

কে বলবে এই কেনর উত্তর! এছাড়া আরো কত কাহিনী কত সন্তানের জন্ম-মৃত্যু কথা কোন্ যবনিকার আড়ালে আছে তা শুধু খোজারা আর রাজ কর্মচারীরা কেউ কেউ জানেন। সাধারণ মানুষের জানা নেই।

সখি (ঘ)

এইবার দেখা যাবে সখিদের দলকে।

এক এক রাণীর শতাধিক সখি আর পাত্রী থাকত আগেই বলেছি।

এই সখিরা কিছু পিত্রালয় থেকে পাওয়া। কিছু পতিগৃহে সংগ্রহ করা। কিছু পরে কিনে বা অনাথ দরিদ্র বালিকা সংগ্রহ করে নেওয়া হত। রাজভবনে স্থান পাবে, খেয়ে পরে সুখে বেঁচে থাকবে। হয়ত পরে যৌবনে রাজার 'নেক নজরে'ও পড়তে পারে 'অবিবাহিতা রাণীর' মর্যাদা 'রায়' উপাধি লাভ করে। 'লালজী সাহেব'দের জননী হলে তো কথাই নেই, পুরুষানুক্রমে জায়গীর সম্পত্তি লাভ করবে সন্তানরা।

এইসব সখিদের রূপ অসামান্য। কেউ কারুর মত হোক বা না হোক সকলেই রূপবতী। রং আকৃতি সুগঠিত দেহ, কেউ তন্বী নৃত্যকুশলা, কেউ সুগায়িকা, তার সঙ্গে কারুর বা এমনি রূপ দেখে দেখে চোখ ফেরে না।

প্রতিটি জলসায় এদের কখনো নাচগান কখনো অভিনয় হত পালা করে সারারাত্রি ধরে। যেন হারেমের ভোগের নরক সিংহদুয়ারে সন্ধ্যা জ্বালাতো তারা।

রাজারও নিজের একদল সখি ছিল। প্রথমে তারা একদল নাচগান করে যেত। শতাধিক সখি থেকে বাছা বাছা নাচগান নিপুণা কয়েকজন। তারপর মহারাণীর সখিবাহিনীর পালা। পরে পরে অন্য চার রাণীর সখিদের পালা আসত। প্রায় দেড় ঘণ্টা দুঘণ্টা ধরে সেই নৃত্যগীতের এক এক দলের পালা। গান রাধাকৃষ্ণ-লীলাই বেশী। কখনো বা রামায়ণ নিয়ে। এক এক জলসায় প্রত্যেক দলের উৎসবের পোশাকের রং আলাদার প্রথা ছিল। সবুজ, লাল, হলদে, বেগুনি, আসমানী, গোলাপী ইত্যাদি।

এদের পরিধেয় ঘাগরা, লুগড়ী (ওড়না), কাঁচুলি, বড় গা ঢাকা জামা 'সদরি' পায়ে অনেক গহনা নূপুরের সঙ্গে। কানে এবং গায়েও কিছু গহনা। নাকে বেশর নথ। চোখে সুরমা কাজল। হাতে পায়ে মেহেদীর রংয়ের ফুলকাজ যা দুমাসেও ওঠে না। পায়ে জরির বা রঙীন রেশম সুতোর ফুল তোলা ক্ষুদ্র নাগরা —পিছন দিক মোড়া অর্থাৎ গোড়ালী মোড়া। গোড়ালী উঁচু জুতা পরে বারনারীরা। গৃহ-কন্যারা নয়। একসঙ্গে প্রায় হাজার খানেক সখি পাত্রীর দলে সিঁড়ি বারান্দা প্রকাণ্ড দরবার ঘরখানি ভরে যেত। রূপও অতুলনীয়। আকৃতি গড়ন সুন্দর, নৃত্যও লীলায়িত ললিত। গান ও গানের সঙ্গত সারেঙ্গী, তানপুরা, তবলা, ঢোল, বাঁয়া, সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়াম নৃত্যের তালে তালে অপূর্ব। সবই আশ্চর্য হবার মতন অপূর্ব।

শুধু দেখিনি সহজ আনন্দ সহজ স্বাভাবিক মধুর হাসি কারুর মুখে। দুএকটা গানের লাইন মনে আছে "কোন শিখায়া শ্যাম তুঝে মিঠি বোল না", "বোলো রাধা প্যারী বংশী হমারী।"

পাত্রী (ঙ)

এরা এই পাত্রী নামধেয়া বালিকার দলগুলি কচি মেয়ের দল।

এদের সাধারণ পোশাক। গায়ে লাল আঙার্খা (অঙ্গরক্ষা), কুর্তা (জামা)। পরিধানে লাল বা সাদা চুড়িদার সরু পাজামা। মাথায় রাঙা ওড়না। হাতে কাঁচের বা গালার চুড়ী অথবা রূপার চুড়ী। কানে মাকড়ি। নাকে কারুর কারুর নথ। সোনা বা রূপার। কচি কচি সুন্দর কোমল মুখগুলি ত্রস্ত কৌতুহল ও হাসি ভরা। অনেক পাত্রী রাণীদের খুব আদরের স্নেহের পাত্রীও ছিল। অনেকেই বড় বড় সখিরাও তাদের খুব ভালোবাসত। ছোট ছোট ভাইবোনদের ছেড়ে-আসা স্মৃতি হয়ত মনে পড়ত। এখনো বড় হয়নি বলে তারা—ঐ নারী-শালার ঈর্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কুটচক্রের কথা কিছুই না জানায় কচি কোমল মুখের সহজ মধুর হাসিটা হারায় নি।

মাথার চুল জড় করে লাল নীল সবুজ জরদ রং জড়ানো বেণী। বিনুনী

করে নয় শুধু গোল করে পাকানো। ওদেশে বলে 'চোটী' বিনুনী বেঁধে বেণী খোঁপা করতে জানে না। (চোটি বিনুনী।)

সকলেরই পায়ে জুতা আর মল মুরাঠি (পায়ের গহনা) কড়া সখিদের তাদের আদি নাম কি ছিল কেউ জানে না। তারাও না। প্রাসাদে আসার পর নামকরণ রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে আমাদের হাসি এসেছে কিছু যথেচ্ছ অদ্ভুত নামে। যেমন—একটি চমৎকার সুন্দরী পাত্রীর নাম ছিল গন্ধমাদনবাঈ। রামায়ণ ভক্তি থেকে নামকরণ। অহল্যা, কৌশল্যা, জানকী, কৃষ্ণা, রাধা, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, লছমী, কেশর (জাফরান), পদ্মিনী তো ছিলই। তাছাড়া ঋষ্যমুক, চম্পা, গোদাবরী, মাল্যবান, রামেশ্বরী, লাড়লী, যশোদার তো ছড়াছড়ি।

হনুমান তো পুরুষ নামেও আছেনই নারীতেও আছেন। গন্ধমাদনবাঈ কিশোর বয়সেই মারা যায়। আর অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে অলি গলি নিরালোক পথে মেয়েরা সখি পাত্রীরা তাকে দেখতে পায়। কাহিনী রটে যায় প্রাসাদে ছায়ামূর্তি বালিকা পাত্রীকে দেখতে পাওয়া যায়।

বাঁদী ও দাসী (চ)

এরা দুই শ্রেণী, নারী দাসীর পর্যায়েরই। কিন্তু বাঁদীরা অন্তঃপর থেকে প্রায়ই বেরুতো না। তারা পর্দানসীন দাসী শ্রেণী যদিও তাদেরও ঘরকরনা নেই। কাজও দাসীদের মত ঠিক নয়। দাসী বা ঝিয়েদের মাঝামাঝি একটি শ্রেণী। অনেকটা যেন খাস দাসীর মত। বেশ প্রতাপশালিনী ও পুরানো ঝিয়েদের মত। 'রাজসিংহ' বইয়ের দরিয়া বিবির মত। অনেক সময় 'উভচর'।

তবে দাসিদের ঘরকরনা গৃহস্থালী ছিল। বাইরে আবার অন্তঃপুরে সদর অন্দর দুইয়েরই যাওয়া আসার অধিকার ছিল। কিন্তু অনুমতি সাপেক্ষ। ভিতরে যারা থাকত তাদের পুরুষ আত্মীয়দের নিয়ে সেখানে থাকার যাওয়া আসার অধিকার কখনোই ছিল না। হয় তারা 'পাশ' নিয়ে বাইরে দেখা করতে যেতে আসতে পারে। নইলে চিরকালের মত 'হারেমেই' থাকবে।

খোজাদের হুকুমে বড় প্রধানা সখির আদেশ নির্দেশে সমস্ত অন্তঃপুরে অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত। খোজাদের ক্ষমতা রাজার পরেই। আমাদেরই এইসব দেখাশোনা উৎসব দিনেই। এক মহল থেকে অন্য মহলে আসার জন্য 'পাশ' লাগত অন্য রাণীদেরও। প্রাসাদ থেকে মহল থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসা পাত্রীদেরও অভিনয় বা নাচের জন্য তাদের আনা হত। এক এক রাণীর সখিদের বসন-ভূষণ ওড়না ঘাগরা কাঁচুলী সদরি (ওপরের জামা) সব রং পৃথক পৃথক হওয়ার নিয়ম ছিল। এগুলি উৎসব দিনের বিশেষ রং। এই থেকে আমাদের অভ্যাগতদের চোখে তাদের সংখ্যা ও আকার চেহারা রূপের একটা আভাস ও আন্দাজ পাওয়া যেত এসব কথা পূর্বেই বলেছি।

সখিদের বসনভূষণ একই রকম রংয়ের হলেও কিছু উৎকৃষ্ট। পাত্রীদের শুধু লাল কুর্তা পাজামা ওড়নাই। একই রকম পোশাক (ইউনিফরম মত)। জুতা সকলেরই পরার নিয়ম ছিল। অতি শীত ও অতি গরমের জন্য।

থাকার ঘর (১)

এখন গোড়ার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসায় আসি। বাদশা আকবর শা'র হারেমের পাঁচ হাজার নারী পৃথক পৃথক ঘর পেতেন কি না ?

তাহলে আমাদের এই ছোট রাজ্যের রাণীদের মহারাণীদের প্রাসাদে কতগুলি করে ঘর ছিল ? নিজেদের ব্যবহারযোগ্য ঘর দালান ছাত ছাড়া কতগুলি উদ্বৃত্ত থাকত সখিদের—পাত্রীদের ও বাঁদীদের জন্য—এও প্রশ্ন হিসাবে রাখা যায়।

আমার হিসাবে 'নারীশালা'র 'বাঁদী' অধিবাসিনীদের বিষয়ে পৃথক করে বলা হয়নি। বাঁদীরাও অন্তঃপুরবাসিনী বটে। অর্থাৎ অন্তঃপুরের দাসী চাকরাণী স্তরের মানুষদের অন্তঃপুরের বাইরেও ঘর সংসার ছিল। এদের প্রাসাদের বাইরেও যাতায়াতের অধিকার ছিল। অবশ্য খোজাদের প্রধানা সখির অনুমতি নিয়ে। কিন্তু বাঁদীদের প্রাসাদের বাইরে ঘর থাকত না।

এছাড়া ছিল মহারাজার নিজস্ব সখিই প্রায় তিনশো। মহারাণীরও তিনশোর কাছাকাছি সংখ্যা। অন্য চার রাণী ও পাশোয়ান, পর্দায়েতদের সখির সংখ্যা একশো দুশো করে আন্দাজী ধরলেও পনেরশোর কাছাকাছি হয় মোট সংখ্যা।

প্রশ্ন, এদের থাকার ঘর ? প্রাসাদে পৃথক পৃথক ছিল কি না ? এমনকি কয়েকজনে মিলেও একখানি করে ঘর পেত কি না ?

মনে হয় ঐ সব প্রাসাদে ছোট ছোট ঘর কক্ষ দেখিনি। খুব বড় বড় প্রাঙ্গণ। খুব বড় লম্বা চওড়া ছাত। তার কোলে সারি সারি দালানের মত হলঘরই চোখে পড়েছে।

একবার একদিন জলসার মাঝে মহারাণী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর শোবার ঘর (সাময়িক বিশ্রামের) খানিতে পিতামহীর পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আধুনিক আসবাব নেই।

একখানি লম্বা চওড়া মার্বেল পাথরের ফুল লতাপাতা আঁকা ও খোদাই বড় ঘর। চারদিকে বড় জানালা দরজা নেই কিন্তু। দুটি মাত্র দরজা। দালানের মত খিলানে পর্দা টাঙানো। মেঝেতে মস্ত বড় গালিচা ও চাদরের 'বিছায়েত' বা ফরাস পাতা। একপাশে একখানি হালকা কাঠের ওপর হাতির দাঁতের ও রুপা সোনার কারুকার্য করা সুন্দর খাটে (নেওয়ারের) একটি শয্যা। আমাদের এদেশী বিরাট পালঙ্ক নয়।

মহারাণী সারারাত্রি ধরে দেখা নাচগানের ও মদিরা পানের অবসরে একটু ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করেছিলেন সেই খাটে। অবশ্য সেইটাই বিশ্রামকক্ষ বা প্রতি-

দিনের শয়নকক্ষ কিনা জানতাম না। অনেক রূপবতী সখি সহচরি চারদিকে। তারি মাঝে আমরা জনতিনেক ছোট ছোট পিসি ভাইঝি উঁকি দিচ্ছিলাম। সেই ঘরের এদিকে ওদিকে সব বড় বড় দালান ধরনের ঘর ছিল মনে হয়। আগ্রা দিল্লীর ও অম্বর প্রাসাদে এবং মোগল রাজপুত চিত্রাবলীতে ওই ধরনেরই ঘর দেখা যায় অলিন্দ বারান্দা ছাত সমন্বিত। গরমের দিনে রাত্রে ছাতে শোওয়া। ছাতেই স্নানাদির ব্যবস্থা।

বাসকক্ষ (২)

যাই হোক, আলাদা বাসকক্ষ পাত্রীদের থাকত না। সখিদের মনে হয় ২০/২৫ জন মিলে একত্রে থাকত রাণীদের অনুগ্রহভাজন হিসেবে পদমর্যাদা হিসেবে। রূপ গুণ ও সেবিকা হিসেবেও বটে। নাচগানের জলসায় দেখা গেছে একতলায় বিশাল প্রাঙ্গণ। ওপরে মস্ত ঢাকা দালান সামনে পিছনে ছাত আলো বাতাসে ঝলমল করা। ছাতে তৈরী করা বাগান। মাটি জমা করে কমলালেবু থেকে ফলসা, কুল, পেয়ারা, নানা ফলফুলের কষ্টসাধ্য বাগান। তারি এক পাশে গৃহশ্রেণী। কখনো চুকিনি সেখানে সখির পাত্রীদের আবাসে। মোট কথা দেড় হাজার সখির জন্য রাণীদের মহল ছাড়াও দেড় হাজার ঘর ছিল না।

তারা কিভাবে থাকত? কল্পনা করে নেওয়া যায় সারাদিন ঘুঁটি খেলে, পাশা, তাস, দাবা খেলে, গান গেয়ে, নেচে নেচে গান শিখে বড় বড় ঘর দালানে একত্রেই থাকত। যেমন লোকে জীবজন্তু, পাখী, হরিণ, বিড়াল, ময়ূর, টিয়া, বাঁদর পোষে। ঝগড়া-ঝাটি কলহ-বিবাদ ঈর্ষাও পরস্পরে করত। 'চুকলী' খাওয়া লাগানো ভাঙানো নিশ্চয় চলত। ভয়াবহ শাস্তি দণ্ডের কাহিনীও জনরবে কানে এসেছে।

শেষ কথা হল পৃথক বাসকক্ষ তারা পেত না। খোঁয়াড়ের মতই চিরকাল এক ঘরেই বাস করত। বড় বড় ৪০/৫০ জনে মিলে।

তারপর?

তখন ১৫/১৬ বছর বয়সে মন কি দেখেছিল, ভেবেছিল জানি না। আজ মনের চোখের সামনে ভেসে আসে সেই অসংখ্য রূপবতী সুন্দর স্বাভাবিক নারীর ম্লান মূঢ় জীবন্মৃত আকৃতি। যারা এক স্বাভাবিক জীবনে বঞ্চিত নিষ্ঠুর অস্বাভাবিক জগতের অধিবাসিনীর দল।

তাদের ঘর ভোজ্য ও শয্যা (৩)

গরমের দিনে ঐ সব ঘরের সামনে লম্বা ছাতে শোওয়ার ব্যবস্থা হত। সব ঘরের সম্মুখেই বড় বড় ছাত। সেখানেও ঐ ছোট ছোট (একলার) 'একানে' খাটিয়া বা খাট পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা হত।

খাওয়া বা খাদ সরবরাহ হত নিচের 'রাজকীয়' প্রাসাদের সর্বজনীন রন্ধনশালা থেকে। যার নাম ওদেশী ভাষায় 'রসোড়া'। সবচেয়ে সাধারণ লোকেরা ওদেশের ডাল রুটি, কিংবা একটু আচার বা ঘি দিয়ে রুটি—এই খায়। রুটি গমের হয়। দীনদরিদ্ররা যবের রুটিই খায়। এদের কি খাদ্য আসত আমার ঠিক জানা নেই। তবে যতদূর শুনেছি রাজভোগ্য খাদ্য সব দেশের দুঃখীদের মত এরাও পেত না। এদের চেয়ে উচ্চ স্তরের বড় বড় সখিরা কিছুটা পেত। রাণীদের অনুগ্রহ-ভাগিনীরাও পেত।

মনে হয়েছে থাকবার জন্য বাসকক্ষ যদি তারা অথবা মোগল প্রাসাদবাসিনীরা পেত তাহলেই বা তাতে তাদের কি লাভ হত? আর না পেলেই বা তাতে তাদের কি-বা ক্ষতি লোকসান হয়েছিল?

বালিকা কিশোরীকাল থেকে বা যৌবনকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি তারা সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কোনও স্বাভাবিক অধিকার, নরনারীর কোন সহজ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ, আনন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য কি জিনিস অনুভব হয়ত করেছিল কিন্তু করলেও পায়নি তো কোনও দিন তা।

উৎসব 'জলসা'য় তাদের নৃত্যগীত দেখা চেহারা আমার আজো মনে আছে। সে দেখা 'পুতুল' বললেও তাদের সব বলা হয় না। এবং সকল হারেমেই রূপে সাজে উল্লাসে উৎসবে নাচে গানের মাঝেও এমন মর্ত নিষ্প্রাণ চেহারা হতে পারে এ চোখে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

অন্তঃপুরের ব্যবস্থাপনা

এইসব মহারাণী রাণীদের এবং পর্দায়েত পাশোয়ানজীদের নিজের প্রাসাদ-ভবনের ও মহলের সব কাজকর্ম, খরচ জমার নিজস্ব হিসাব নিকাশের বিভাগ ছিল।

তাঁদের নিজস্ব যৌতুক হিসাবে পিত্রালয়ের পাওয়া জায়গীর আবার শ্বশুর কুলের পাওয়া জায়গীরও থাকত। জায়গীর হল নিষ্কর তালুক, কতকটা লাখেরাজ দেবত্র বা ব্রহ্মত্র সম্পত্তির মত। রাজমাতাও (মাজীসাহেব) প্রাসাদ মহল, জায়গীর, সম্মান ও অধিকার আজীবন ভোগ করতেন। জায়গীর নানা রকম। পান খাবার জায়গীর অর্থাৎ খুসীমনে পিতা উপহৃত তালুক! এছাড়া দান পুণ্য তীর্থ নানা বিলাস ব্যয়ের জন্যও জায়গীর দেওয়া হত।

প্রতিটি প্রাসাদ বা মহলের লোকজন অনেক। নায়েব কর্মচারী গোমস্তা যাদের ও দেশের ভাষায় 'কামদার' কিংবা 'মুন্সী' বলে, রাণী মহারাণীদের নিজস্ব কর্মচারী তারা। কর্মবিভাগও অনেক রকম।

আয়-ব্যয় বিভাগ দেখতেন মুন্সীজী বা নাজীরজী। কামদার জায়গীরের

আদায় উশুল বিভাগ হিসাব-নিকাশ দেখতেন। ছোট কর্মচারী ইনি। হরকরা বা পাইক নগদী অথবা পেয়াদারা ঐ সব কর্মচারীদের অধীনে কাজ করত।

সওয়ার হল ঘোড় সওয়ার। বেশ কিছু সংখ্যক করে সব মহলের অধিকারিণী-দেরই থাকত নিজস্ব খবরাখবর বহনের জন্য পিয়নের মত। দরওয়ান, চৌকিদার, পাহারাদার ও শান্ত্রী সকলের এলাকায় পাহারা দেবার জন্য থাকত।

কর্মচারীদের মাহিনা এবং ভাতা এবং দাসদাসীদের মাহিনার খরচ রাজকোষ থেকে দেওয়া হত। প্রত্যেক মহলের নিজস্ব দর্জি থাকত। সকাল ৯/১০ থেকে বিকেল ৪/৫ অবধি মহলের যাবতীয় জামাকাপড়, লেপ, বালিশ, তোষক, বিছানা ইত্যাদির সেলাইয়ের কাজ করত। এরাও সব মাস-মাহিনাদার। নয়তো পুরুষানুক্রমে জায়গীরভোগী। প্রায় সব বড়লোকের বাড়ীতেই সেকালে সারাদিন এরকম দর্জিরা কাজ করত। ছেঁড়া মেরামতই হোক বা নতুন জামা-কাপড় বিছানা তৈরিই হোক।

এছাড়া ছিল ধুনুরি বা ধুনকর। তারাও প্রত্যেক মহলের নিজস্ব কারিগর হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল।

রংরেজদের নিজস্ব ব্যবসা ও দোকান থাকলেও রাণীদের মহল বা প্রাসাদের (বৃত্তিভোগী ছিল এরা) সম্পূর্ণ কর্মভার এদের উপরই থাকত। দেশটা রংয়ের। এদেরতো কাজের সীমা পরিসীমা নেই। রঙীন রঙীন ওড়না, ঘাগরা, লুগড়ী, পাগড়ীর রংয়ের লীলাতে ঋতুতে পরিবর্তন সমারোহ। উৎসবে উৎসবে বদল লেগেই থাকে। বসন্ত পঞ্চমী থেকে বাসন্তী রং শুরু। তারপর সবুজ রং শ্রাবণ মাসের কাজরী হিন্দোলা, ঝুলন অবধি। তারপর মাঝে মাঝে অন্য উৎসবে লাল, গোলাপী, মতিয়া, লহরিয়া (ঢেউ খেলানো), রামধনু, বুটিদার নানা রংয়ের ওড়না ও পাগড়ি আবার বিবাহের কনের রক্তাম্বরী ওড়না জরি ও অভ্রে সমুজ্জ্বল, বরের পীতবসন ও জরিদার লাল পাগড়ি।

রংরেজ আর রংরেজিণীর হাতের আসল রং যে কি তা আর কেউ কোনদিন জানতে পারে না। তারা সারাদিনই রঙে রঙে রং মেলাতে ব্যস্ত।

প্রাসাদের নিজস্ব মাটির বাসন সরবরাহ করত কুম্ভকারেরা। চৈত্র শেষে গরমকালের উপক্রমে পানীয় জলের বাসন এবং কলসীদানের কলসী, শ্রাবণ মেলায়, উৎসবের দিনে, নবরাত্রির প্রয়োজনে আশ্বিন মাসে ছোট বড় সব ধরনের মৃৎপাত্র এরাই সরবরাহ করত। তারপর দেওয়ালী। তখন মাটির প্রদীপ, সরাখুরি, তেলের হাঁড়ী, মাটির পুতুল ও অন্য মাটির জিনিস সরবরাহের জন্য কুমোর বাড়ীতে মহোৎসব পড়ে যেত। কারণ ওদেশে সবচেয়ে বড় পার্বণ হল দেওয়ালী। আমাদের দুর্গোৎসবের মত।

সূত্রধর চলিত ভাষায় ছুতোর ওদের দেশে যাকে 'খাতি' বলে (বংশানুক্রমে চাকরানভোগী) প্রাসাদের কাজে নিযুক্ত থাকত। যত কিছু কাঠ কাঠরা

মেরামতী কাজের ভার এদের ওপর ছিল। এইসব শিল্পীরা আবার যে মহলের কর্মী সেই মহলের উৎসবেতে চমৎকার কাঠের শিল্প-কার্য করে এনে নজর করত।

এছাড়া ছিল হালী মালী ভিস্তী মেথর ঘোড়ার ও গরুর সেবার লোক যারা সকলেই প্রায় পুরুষানুক্রমে ভৃত্য। প্রায় সকলেরই প্রাসাদের বাইরে খড়ের ও মাটিরও কিছু পাকা ঘর বাসের জন্য থাকত।

প্রাসাদের বাগানে বাগানে জলের কুয়ো থেকে এবং ভিতরে অন্তঃপুরে বড় বড় চৌবাচ্চা বা হ্রদ থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল।

ওদেশে বলদে টেনে টেনে জল তোলে। চামড়ার গোল মশক ভরে জল উঠিয়ে বড় বড় চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখা হত। যারা এই কুয়োর কাজ করত তাদের নাম ছিল হালী।

সব শ্রেণীর চাকর দাসদাসীরা সবাই যারা প্রাসাদ-এলাকাবাসী তারা কেউ বা রসোড়ায় খাদ্য পেত কেউ বা নিজেরা রান্না করত নিয়ম অনুযায়ী।

এক কথায় এক একটি প্রাসাদ তার সঙ্গে নায়েব, মুন্সী, কামদার, শাসক, কেরাণী, কর্মচারী নিয়ে যেন ছোট ছোট রাজ্য এগুলি। যার দণ্ড, দাক্ষিণ্য, শাসন ও প্রসাদ সবই প্রাসাদের প্রধানা অধিবাসিনী রাণী বা মহারাণীদের হাতে হুকুমে নির্দেশে হত।

প্রবাসী ১৩৪১

কনে দেখা

জ্যৈষ্ঠ মাসের এক সংখ্যা দেশে শ্রীমতী বাণী সেনের লেখা 'কনে দেখা' পড়লাম। আলোচনাটি সময়োচিত, ভেবেছেনও লেখিকা। তবে আরো একটু স্পষ্টভাবে আলোচনা হওয়া দরকার তাই আমাদের যা' দু'এক কথা মনে হ'ল লিখছি।

বাংলা দেশের কনে দেখার মত বর্বর খেলো প্রথা ভারতবর্ষের আর কোথাও আছে কিনা বলা শক্ত। এই প্রথার বর্বরতা যেন দিন দিন বাড়ছে মনে হয়। 'কনে দেখার' লেখিকা কিছুটা আলোচনা করেছেন।

এই বর্বর প্রথার দু'টি প্রধান দিক আছে। প্রথম হচ্ছে পণের অর্থের মাপে মেয়ের রূপ গুণ বংশের যাচাই বা মান নিরূপণ; দ্বিতীয় মেয়েটিকে সবান্ধবে সমাজ-কুটুম্ব, মেসোপিসে, বরকর্তা—বর, বরের বন্ধু, মা, মাসী, পিসি, বোন ইত্যাদি সহ দু'পাঁচদিন ধরে দেখে তাদের বাড়িতে বসে ভীমনাগ, নবীন ময়রা, দ্বারিক ঘোষের মিষ্টান্নের ভূরিভোজন করে অনায়াসে মেয়েটিকে পছন্দ হ'ল না বলে দেওয়া। এবং সেই বলে দেওয়া একদিনে নয়, পাঁচদিন তার বাপ ভাইকে, আত্মীয়-স্বজনকে ঘুরিয়ে নির্লজ্জভাবে কারুর পছন্দ হয়নি বলা। এর চেয়ে ঘটক বা ঘটকী দিয়ে মেয়ের সম্বন্ধ করা আগের দিনে যা ছিল, তাতে এতটা অপমানবোধ করতেন না কন্যাপক্ষ। কেননা, ঘটকরাই কন্যার বিবরণ দিয়ে দিতেন।

আশ্চর্য এই, আমাদের সকলেরই ঘরে মেয়ে আছে অথচ সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐরকম ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার, দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত সরকারী কর্মচারী, ধনশালী ব্যক্তি থেকে দীন দরিদ্র গৃহস্থ সকলেই ঐ মেয়ে দেখানোর সময়ে যেন দীনাদপি দীনে সঙ্কুচিত হয়ে পাত্রের অভিভাবক বা পিতার প্রসাদ ভিক্ষু হয়ে চেয়ে থাকেন। সেই একদিনের জন্য তাদের রাজমর্যাদা দেখবার জিনিস। কিংবা একদিন কেন, সুপুত্রের বা কৃতী পাত্রের অভিভাবকের এই মেয়ে দেখা এবং ভূরিভোজ আর অহংকৃত মেজাজ দেখানো কতদিন ধরে চলে কে জানে। কেননা, একটি মেয়ে দেখেই তো আমাদের দেশে বিয়ে হয় না।

বলতে পারেন অনেকে, বিবাহের মত চিরকালের কাজ পাঁচটি মেয়ে না দেখে কি করে করা যায়? মেয়ে তো না দেখে বিবাহ দেওয়া যায় না? তা যায় না। কিন্তু পণের পরিমাণ? রূপ-গুণের যাচাই? বিদ্যার ললিতকলার খোঁজখবর? অবশেষে মেয়ের পিতা এবং তাঁর জীবিত থাকা অথবা কর্মক্ষেত্র কেমন—ত.তে

এইসব কেমন করে আসে তা ভেবে দেখবার বিষয়। সর্বোপরি, যাদের মেয়ে নেওয়া হয়ত যাবে না তাদের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে সবান্ধবে জলযোগ।

যাক্‌ আমি এখন অন্য দু'একটা দেশের মেয়ে দেখার প্রথার কথা বলি। আজকাল সেটাও জানা দরকার আমাদের।

বিহারে তিন শ্রেণীর উচ্চবর্ণ আছেন ব্রাহ্মণ, বাভন (এই বাভন জাতি ব্রাহ্মণ ন'ন কিন্তু দ্বিজ বলেন নিজেদের), আর লালা বা কায়স্থ। এঁদের পর্দা আছে। কিন্তু মেয়েদের বাল্যবিবাহ ছিল, এখনো আছে গ্রাম অঞ্চলে।

এঁদের ঘরে মেয়ের বিয়ে, মেয়ে না দেখিয়েই হয়। কোনোক্রমেই বিয়ের আগে বরপক্ষীয়েরা কনে দেখতে পান না। যদি মেয়ের রূপের অভাব থাকে, এমন কি বিকলাঙ্গও হয় তা'হলেও আগে জানার উপায় নেই। লোকমুখে, কুটুম্ব সূত্রে, দাসী নাপিতানী মারফৎ জানা যায় 'কনে' কেমন, মেয়ের বাড়ির লোকেরা কেমন। 'আশীর্বাদ'কে 'তিলক' বলেন তাঁরা,—তাতেও মেয়ে দেখার প্রথা নেই—পাত্রকে 'তিলক' চড়ানো হয়। মেয়েকে চন্দন ও হলুদ পাঠানো হয়। বরের বাড়ির দশজন এসে মেয়ে দেখে পছন্দ বা অপছন্দ করে যাওয়ার মত, কখনো হাঁটিয়ে কখনো চুল খুলে, গান গাইয়ে, নানা রকমে প্রশ্ন করে, একঘর পুরুষ ও মেয়ের সামনে একটি অশিক্ষিত বা শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়ে দেখার বর্বরপ্রথা বিহারে নেই।

এই প্রথা ইউ পি'তে আগ্রা, অযোধ্যা, কাশী ইত্যাদি দেশেও নেই। এদের ব্রাহ্মণ ও লালা প্রধান। অরূপা ও রূপবতী মেয়ের অভাব নেই।

পাঞ্জাবে নেই। ওখানে পর্দা শিথিল। ক্ষেত্রীজাতিরা পরম সুন্দর দেখতে। ব্রাহ্মণ রাজপুত শিখ জাতিও ভাল দেখতে। কাশ্মীরী তো আছেই কিন্তু পর্দাও নেই, কনে দেখাও নেই। পণপ্রথা আছে অন্য ধরনের।

রাজপুতনায় কনে দেখা নেই। সুন্দরের দেশ, ঘরে ঘরে পরমা রূপসী মেয়ে দেখা যায়। কন্যা হত্যা ছিল, কন্যাদায়ের ভয়ে পণপ্রথার ধরনের প্রথাও আছে। কিন্তু কনে দেখা নেই। রাজপুত, মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ বৈশ্য কোনো জাতে এমনকি নিম্নশ্রেণীতেও 'কনে দেখা' নেই। বম্বেওয়ালাদের মধ্যে এ প্রথা নেই। পর্দাও নেই। গুজরাটী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ প্রথা নেই। ধনীর ঘরেই স্বভাবতই আদানপ্রদান চলে। কিন্তু আদায় জুলুমের প্রথা নেই।

উড়িষ্যায় যতদূর জানি, বাংলাদেশের মত এ প্রথা নেই। অন্তত একটির পর একটি ভদ্রলোকের মেয়ে দেখে পর্যাপ্ত আদর অভ্যর্থনা (মৌখিক নয় শুধু !) পেয়ে ফিরে এসে পাঁচদিন আরো পাত্রীপক্ষের বাক্যের তোষণবিলাসে তৃপ্ত ও দৃপ্ত হয়ে ভদ্র বা অভদ্রভাবে মেয়ে পছন্দ হয়নি বলা নেই।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের 'উড়িষ্যার চিত্রে', 'শোভাবতীর বিবাহে' উড়িষ্যার

সম্ভ্রান্ত সমাজের যে বিবরণ পাই, তাতে এই ভাবের বাংলাদেশের মেয়ে দেখা ও দেখানোর মত প্রথা নেই সেখানে বোঝা যায়।

মাদ্রাজ মহারাষ্ট্রের কথা জানি না, যাঁরা ওসব দেশে ঘোরেন তারা ভাল করে বলতে পারেন। তবে যেটুকু মাদ্রাজে দেখেছি তাতে অনেক জায়গায় মাতৃতন্ত্র-সমাজ আছে বলেই মেয়ের এই অসম্মান. পুরুষের 'ক্যালাস' অভদ্রতা নেই। মেয়েদের উৎকোচ দিয়ে 'ঘুষ' দিয়ে পার করে দেবার প্রথা নেই।

খাসিয়াদের মধ্যেও মাতৃতন্ত্র প্রথা আছে, মেয়েরাই অথবা কনিষ্ঠা মেয়ে উত্তরাধিকারিণী। এখানেও মেয়ের লাঞ্ছনা কম।

তাহলে কি ভেবে নিতে হবে—আমাদের সমাজে বিবাহক্ষেত্রে পুরুষের ভদ্রতা. শীলতা, শালীনতা বোধ কম। শ্বশুরার্জিত টাকায় লোভ বেশী? যে অর্থ পণের আকারে প্রথার অছিলায় পথে সহজে আসে কন্যাপক্ষ থেকে সেই অর্থের বেশী আদর।

যাক এ কথা। আমার মনে হয় সমাজ যেখানে এসে দাঁড়াচ্ছে সেখানে প্রথাবাদী শিক্ষিত মেয়েপুরুষ সকলেরই এই প্রথাটাকে বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে বিশেষ করে ভাবা দরকার।

এখন দু'একটা অপমানজনক ও কৌতুকাবহ ঘটনার কথা বলে আমার কথা শেষ করি।

আমাদের ধনী সমাজের দাম্ভিকতা ও শীলতাহীনতার পরিচয় এতে দেখতে পাবেন।

এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তাঁর শিক্ষিত মেয়ের এক ধনী পরিবারে বিবাহের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলে মিলে মেয়ে দেখলেন। সভয় বিনয়ে কন্যার আত্মীয়েরা তাঁদের যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। ওপক্ষ থেকে কোষ্ঠী চাওয়া হ'ল। এটা মন্দ জিনিস নয়—ঐ অছিলায় অনেক সময় সহজে অপছন্দ কন্যার ভূত ঘাড় থেকে নামানো যায়। তা তাঁরা করলেন না। অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাশীল বিত্তবান ঘর তাঁদের। কোনো জবাবই দিলেন না।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পরম্পরায় যা শোনা গেল—কন্যা পছন্দ-অপছন্দ বা কোষ্ঠী বিচার নয়—,সেকালের নাটকের মত কন্যাপক্ষের মহিলাদের বিষয়ে নীচ বিদ্রূপাত্মক আলোচনা। যে কথার প্রতিবাদও করা যায় না সহ্য করাও শক্ত।

আর এক শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিতা কন্যার এক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আরো কৌতুককর জবাব এল। সাধারণ চাকুরে পাত্রের স্ফীতবক্ষ গর্বিত পিতা পাত্রীর পিতাকে চার পৃষ্ঠা ভরে লিখলেন,—"আপনি আপনার কন্যাকে শিক্ষিত করিয়া কি ভালো কাজ করিয়াছেন? এখন দেখুন, শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে আমরা অনেকেই বিবাহ দিতে চাই না।···শিক্ষিতা না হইলে হয়ত আপনি সহজে বিবাহ দিতে

পারিতেন। আমি আমার কন্যাদের স্কুলকলেজের লেখাপড়ায় শিক্ষিতা করি নাই। (কি রকম বিবাহ দিয়েছেন তা আর লেখেননি) আপনি তাহার চেয়ে গৃহকর্ম, সূচীশিল্প ইত্যাদি শিখাইলে ভাল করিতেন· ·।"

বহু উপদেশ বর্ষণ করে শেষ লাইনে লিখলেন, "আপনার কন্যা শিক্ষিতা বলিয়াই আমরা বিবাহ দিব না এবং আপনিও শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়াই সৎ পাত্র পাইবেন না। খুবই ভুল কাজ করিয়াছেন।"

চারপৃষ্ঠা চিঠি পড়ে—তার নির্গলিতার্থ পাওয়া গেল যে, সুপাত্র ঐ একটিই বঙ্গসমাজে জন্মেছিল সুতরাং ঐ কন্যাটির আর কোনোদিন বিবাহ হবে না অথবা সহজে হবে না!

এই আমাদের মেয়ে দেখানো, অর্থলোভ দেখানো, কন্যাপক্ষীয় সমাজ এবং লুব্ধ বিবেকহীন অসাড়বুদ্ধি পুরুষ সমাজ বা বরপক্ষ।

ভাববার কথা এই, আদর্শই বা আমাদের কি, আর মানুষ হিসাবেই বা আমরা কি?

একটি গত শতাব্দীর গল্প বলে লেখা শেষ করি। তখনকার দিনের এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সকালবেলা নিজের বাড়ির উঠানে দাঁতন করছিলেন। এক ভদ্রলোক গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন। গৃহকর্তা পরিচয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি প্রয়োজন?

তিনি বল্লেন, যদি তাঁর কথা থাকে তিনি বলবেন।

গৃহকর্তা বলেন, শোনাবার মত হলে নিশ্চয় শুনবেন।

ভদ্রলোক তাঁর অরূপা কন্যাটির সঙ্গে গৃহকর্তার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করলেন।

গৃহকর্তা ঈষৎ হাস্যে সম্মত হলেন।

বাড়ির মেয়েরা উপর থেকে দেখছিলেন। ভিতরে আসার পর স্ত্রীকন্যারা সকলে প্রশ্ন করলেন। উত্তর শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি জানালেন।

মেয়েরা বললেন, 'মেয়ে দেখলে না, জানলে না, একেবারে এককথায় রাজি হয়ে গেলে·····।'

কর্তা বল্লেন, 'কত বড় অহঙ্কারী ভদ্রলোক, সকালে আমার দরজায় এসে মেয়ে নিতে হবে বলে দাঁড়াল, কি করে বলব তার মেয়ে নোব না? দেখতে কেমন? না, দেখার দরকার নেই। ভদ্রলোকের মেয়ে তো।'

ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লোক, জগদীশনাথ রায়।

কিছুকাল আগে আরেকজন সাধারণ স্কুলমাস্টার, তাঁকেও তাঁর বন্ধুর বিধবা স্ত্রী বলে পাঠালেন, 'আমার মেয়েটিকে নিতে হবে। মেয়ে সুন্দরী নয়।'

তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। বাড়ির লোক ও অন্য পাঁচজন জিজ্ঞাসা করল, 'এককথায় রাজি হলে, মেয়ে ফর্সা নয় ইত্যাদি।'

তিনিও বল্লেন, 'বিধবা ভদ্রমহিলা বলে পাঠিয়েছেন নিতে হবে। ভদ্রলোকের মেয়ে কি করে নিতে পারব না বলব।'

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্ম-চরিতে পড়ি তাঁর জননীর সম্পর্কে কি কথায় তাঁর পিতাকে রামমোহন রায় বলেছেন, 'বৃক্ষের পরিচয় ফলে⋯। যদি তোমার স্ত্রী সুসন্তানবতী হন, তাহলে তোমার ক্ষোভের কারণ নেই।'

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ধর্মকর্ম জ্ঞানের কীর্তির কথা কে না জানে।

বাংলাদেশের সমাজের এই প্রথা সম্বন্ধে এখন সকলেরই ভাবা উচিত।

এই ধরনের লাঞ্ছিত ও লুব্ধ বিবাহের পর যদি মেয়ের শ্বশুরবাড়ির উপর বিতৃষ্ণা বিরাগ জন্মায় (জন্মায়ই) কিছু বলবার আছে কি ? কোনো শ্রদ্ধা তার ঐ বাড়ির পরিজনের উপর থাকে না। যদি মেয়েটি ক্ষমতা ও সুবিধা পায় খুব শীঘ্রই উদ্ধত ব্যবহার করে। প্রায়ই পৃথক হয়ে যায়। মেয়ে দেখার লাঞ্ছনা কোন মেয়ে ভুলেছেন কি না বলা শক্ত। তবে দুঃখ এই যে, তাঁরাই নিজের ছেলেদের বিবাহের সময় পুরাতন প্রথাকেই অনুসরণ করে চলেন। সমাজের মূল খুঁজে এই মনোভাব আমাদের জাতীয় জীবন থেকে তুলে ও মুছে ফেলা উচিত। যদি মেয়ে দেখাই সুন্দর হিসাবে উদ্দেশ্য হয়, স্পষ্ট আর সোজাসুজিভাবে দেখা উচিত। আর যদি টাকা নেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাও মেয়ে দেখার আগেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মত দরাদরি করে নেওয়া ভাল। তাও দুই পক্ষীয় কর্তা ছাড়া অন্য লোক না হলেই ভাল হয়।

আশীর্বাদ, আভ্যুদয়িক, নান্দীমুখ, সম্প্রদান, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী—কোন উৎসব করার সঙ্গে এই ভদ্রতাহীন মেয়ে দেখা ও যৌতুকলুব্ধতা খাপ খায় না।

দেশ, ২২শে, শ্রাবণ ১৩৬১

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার

সেদিনে তখন মেয়েদের 'বেঁচে থাকার' অধিকার ছিল না।

মেয়েদের অধিকারের কথা বলতে গেলে যদি বলি এখন থেকে প্রায় ১৩৪/৩৫ বছর আগে বিধবা হলে তাঁদের ইচ্ছামত বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না—সহসা একটি আকস্মিক ঘটনায় তাঁদের ভাগ্যের গতি অন্যরকম হত তাহলে একটি ঐতিহাসিক সত্য কথা বলা হয়।

১৮১০ খৃষ্টাব্দ। তারিখ হল ৮ই এপ্রিল। এইদিনে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অলকমঞ্জরী দেবী সহমৃতা হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় (তখনো রাজা উপাধি লাভ করেননি) কর্মসূত্রে রংপুরে ছিলেন। বড় ভাই জগমোহনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেশের বাড়ীতে এলেন। বাড়ীতে সকলেই শোকার্ত। এসে ক্ষুব্ধ বেদনায় শুনলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একটি স্ত্রী সহমৃতা হয়েছেন। বেদনায় ক্ষোভে যেন হতবুদ্ধি হলেন। বারবার আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করলেন—তখনকার প্রথানুসারে তাঁর ভ্রাতৃবধূকে সহমৃতা হতে হল? না, তিনি ইচ্ছা করেই সহমরণের চিতায় উঠলেন? তাঁর ক্ষোভ, ক্রোধ ও দুঃখ দেখে কেউ আর স্পষ্ট করে কিছু বলতে সাহস করলেন না। জগমোহনের চার বিবাহ ছিল। ইনি দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন।

রামমোহন জননী তারিণীদেবীর কাছে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, এই সহমরণে তোমার মত নেওয়া হয়েছিল?'

শোকার্ত জননী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। সেদিনে তিনি পুত্রবিয়োগ শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন—তাই কিছু করতে পারেন নি।

তখন সহমরণের প্রথা ভারতে সর্বত্রই উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মাঝে প্রবলভাবে চলিত ছিল! যদিও তখনও দেশে জনমত এর বিপক্ষে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল।

কুড়ি বছর হয়ে গেল তারপর। রামমোহন তাঁর আত্মীয়সভার সভ্য অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল তখন। লর্ড আমহার্স্ট বড়লাট ও পরে লর্ড বেণ্টিঙ্ক বড়লাট। আবেদন পত্র পাঠালেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দিয়ে—লাট সাহেবের কাছে। বিলেতেও পাঠানো হল।

দেশ দুমতে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি গোঁড়া রক্ষণশীলদল ও অন্যটি রাজার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ আত্মীয় সভার দল। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৮ সালে সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে আইন পাশ হয়ে গেল।

মেয়েরা কখনো শোকে স্বেচ্ছায়, কখনো বা শাস্ত্রমত প্ররোচনায় অথবা শোক ভয়ে বা নিন্দার ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহমৃতা হতেন—সে প্রথা এখন বন্ধ হল।

এই ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক সহমরণের কাহিনী অনেক আছে। তার একটি প্রসিদ্ধ সত্য ঘটনা হল কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেব একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে সহমরণের চিতা থেকে উদ্ধার করে তাঁকে বিবাহ করেন।

যাই হোক, বেঁচে থাকার আইনগত অধিকার মেয়েরা পেলেন ইংরেজ রাজত্বে। সহমরণের প্রথার আড়ালে অনেক অনাচার যেমন নাবালকের বিষয় সম্পত্তির লোভ, বিধবার স্ত্রী-ধনের লোভ—এই সবও থাকত। এখন ইংরাজী শিক্ষিত সংস্কারকদের অগ্রগণ্য রাজা রামমোহনের চেষ্টায় তা বন্ধ হল।

পরবর্তী সংস্কায় হল বিধবা বিবাহ আইন পাশ। এটিও ইংরাজ যুগে ইংরেজী শিক্ষিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা হল। বিধবারা ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ করতে পারবেন—এই আইন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পাশ হল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সঙ্গে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্যও আন্দোলন করেন। সেই সতীদাহ ও বাল-বৈধব্যের যুগে মেয়েদের কথা ভেবেছিলেন এই দুইজন মহাপ্রাণ মানুষ।

এরপরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বিবাহসম্বন্ধ প্রথার জন্য আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে করেন। এতে ছিলেন নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ দু'দলই। এঁরা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, বিবাহের বয়সের সীমা এবং পর্দাপ্রথা উচ্ছেদের জন্যও আন্দোলন করেন। যে কয়জন উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে আমরা এ সময়ে পেয়েছিলাম—তরু দত্ত, চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, লেডী অবলা বসু, সরলা রায়, কামিনী রায়, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী পরে পরে সরোজিনী নাইড়ু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ—অনেকেই এঁদের মধ্যে সমাজকর্মী, কবি, লেখিকা, শিক্ষিকা, রাজনীতিক বা ডাক্তার ছিলেন। ক্রমে মেয়েদের কল্পনা ও চিন্তাক্ষেত্র জাগ্রত হতে সুরু হয়েছে। যদিও সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে তখনো পুরুষেরাই অগ্রণী ও নির্দেশক। এর অনেক পরে দেখা দিল সমাজে শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতাহীন বিবাহের জন্য প্যাটেল বিল। এই বিলের উদ্দেশ্য সব ভালো কাজের মতই ভালো ছিল। দেশে বা বিদেশে অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মের ও সমাজের বিধি পালন না করেও নরনারী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। সেই মিলন ও তার সন্তানগুলিকে বিধিবদ্ধ কোনো অধিকার না দিলে তারা সমাজের গ্লানি হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। সমাজের একটি কালিমাময় দিক গড়ে উঠতে থাকে। প্যাটেল বিলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে কোনো জাতি ও ধর্মের লোক বিবাহিত হতে পারবেন। সন্তানাদি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হতে পারবেন। ধর্মমত এক না হলেও বিবাহটা বৈধ হবে। এ বিল পাশ হয়নি নানা বাধায়।

এরপরে এল 'শারদা বিল'। হরবিলাস শারদা এই বিলটি আনলেন নরনারীর

'বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে। মেয়েদের চোদ্দ আর ছেলেদের আঠারো বছর বয়সের সীমানা হল। এর আগে বিয়ে হলে বেআইনি হবে বিয়ে।

গোঁড়া লোকেরা মহাসমস্যায় পড়লেন। নিয়ম না মানবার জন্য তারা ফরাসী অধিকৃত রাজ্য যেমন. চন্দননগর বা পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বিয়ে দিয়ে আসতেন। এখনো যে ঐ আইন খুব সকলে মেনে চলে তা নয়। কেননা অবর্ণ হিন্দুশ্রেণীরা বেশ ৭/৮ বছরেও বিয়ে দিয়ে দেন দেখা গেছে।

এরপরে এলো নারীর উত্তরাধিকার বিল। দেশমুখ বিল। এই নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে বহুদিন ধরেই অনেকে আলোচনা করেছেন। রাজা রামমোহনের' প্রবন্ধাবলীতে আছে নারীর উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধাবলীতে এ বিষয়ে বেশ জোরালো যুক্তিময় আলোচনা করেছেন। দেশমুখ বিল ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রবল থাকায় সেটা স্থগিত থাকে।

আবার কয়েক বছর পরে এলো 'রাও বিল'। এই 'রাও বিল'কে আর চাপা দেওয়া গেল না। দেশে দেশে জনমত সংগ্রহ করার জন্য তারা নানা সভা সমিতির ব্যবস্থা করলেন। কলকাতায় নানা স্থানে এ বিষয়ে নানা উৎসাহী নারীদের সভা হল। YWCA, ভারত স্ত্রী মণ্ডল, AIWC প্রমুখ নারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এ বিষয়ে আন্দোলন জোরালো ভাবে হতে লাগলো। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী চারুলতা মুখার্জি প্রমুখ সব নেত্রীরা নানাভাবে আলোচনা ও আন্দোলন চালাতে লাগলেন।

বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ কম জোরালো ছিল না। আরও বহু বিখ্যাত মহিলা ছিলেন। তাঁরা মেয়েদের ও ছেলেদের সমান উত্তরাধিকারের দাবী সমর্থন করেন নি।

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে পড়লো এবং সেই বিপর্যয়ে আবার চাপা পড়লো এটাও।

১৯৪৭ সাল। দেশ খণ্ডিত হল ও স্বাধীন হল। আইনসচিব বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আম্বেদকর মহাশয় সংবিধান রচনা করলেন। নরনারী নির্বিশেষে নাগরিকতার অধিকার—এই হল প্রথম কথা। এবারে 'হিন্দু কোড বিল' নাম নিয়ে 'দেশমুখ বিল' ও 'রাও বিল' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে এলো। এতে এবারে উত্তরাধিকার ছাড়াও আরো কিছু প্রস্তাব যোগ করা হল। বহুদিন ধরে নানা রকমের আলোচনা চললো পার্লামেণ্টে এই নিয়ে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু এর সপক্ষে ছিলেন। তখনকার পার্লামেণ্টে এই আলোচনায় মাত্র শ্রীমতী রেণুকা রায়ই ছিলেন নারীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বক্তা। আর কেউ নারীদের মধ্য থেকে তেমন বলার লোক ছিলেন না।

১৯৫৬/৫৭ খৃষ্টাব্দে এই বিল পাশ হল। ভাগে ভাগে দফায় দফায় 'বিশেষ বিবাহ বিল', 'বিবাহ বিচ্ছেদ বিল' নাম নিয়ে এতে এবারে 'উত্তরাধিকার' ছাড়াও নতুন কিছু কিছু যোগ হল।

যেমনঃ (১) পুরুষের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া।

(২) নরনারীর বিবাহ বিচ্ছেদে সমান অধিকার। (পূর্বে পুরুষেরা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারতেন কিন্তু নারীর পতিত্যাগ করার আইনসিদ্ধ প্রথা ছিল না।)

(৩) বিচ্ছিন্না নারীর পুনর্বিবাহের অধিকার।

(৪) পিতার সম্পত্তিতে কন্যার ভাইয়ের সঙ্গে সমান অধিকার।

(৫) শ্বশুরের সম্পত্তিতে ও স্বামীর সম্পত্তিতেও তার সমান অধিকার সাব্যস্ত হল।

আগে অপুত্রবতী নারী বা কন্যাবতী নারী কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পেতেন সম্পত্তি কিছুই পেতেন না। এখন এ বিলে নারী সন্তানবতী হোন বা না হোন তার উত্তরাধিকার বজায় থাকবে।

এখন এ প্রসঙ্গে দু'একটা গল্প বলি: সত্যি মেয়েদের অবস্থা খোঁট ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ রামজয় তর্কবাগীশ মহাশয় পারিবারিক কোনো কারণে কিছুদিন দেশান্তরী থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহী অর্থাৎ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহধর্মিণীর নিজের শ্বশুরালয়ে লাঞ্ছনার শেষ রইল না। তখন তিনি সন্তানদের নিয়ে পিত্রালয়ে এলেন। সেখানে কই মাছের 'কড়া থেকে উনুনে পড়ার' অবস্থা হল। তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা কিছু করতে না পেরে আলাদা একখানি চালাঘর করিয়ে তাঁদের থাকতে দিলেন। কোনো ক্রমে সুতো কেটে পৈতে কেটে প্রায়ই অর্ধাশনে তাঁদের দিন কাটত। কতদিন পরে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পিতা ২ টাকা মাইনের পরে ৮ টাকা বেতনের চাকরি পেলে তাঁদের কিছুটা দুঃখ ঘোচে। অথচ তাঁর দেবর-ভাসুরদের ঘরে বা ভাই-পিতা-মাতার ঘরে অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না।

আর একটি কাহিনী হল পণ্ডিত নেহরুর ভগিনী বিজয়লক্ষ্মীর জীবনের ঘটনা। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা ও জওহরলালের ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী। বিজয়লক্ষ্মীর বিয়ে হয়েছিল রঞ্জিত পণ্ডিতের সঙ্গে। সমৃদ্ধিশালী ঘর তাঁদের। কোনো অভাবই কোথাও নেই সে ঘরে। সহসা তিনটি কন্যা নিয়ে বিজয়লক্ষ্মী বিধবা হলেন। সব বিধবাদের মতই চোখে অন্ধকার দেখলেন বটে। কিন্তু মনে জানতেন ধন-সম্পদ অর্থের অভাব নেই সে ঘরে। সন্তানদের মানুষ করতে পারবেন।

ভুল ভাঙলো। শুনলেন মিতাক্ষরা মতে তাঁর আর তাঁর মেয়েদের একান্নবর্তী পরিবারে অশনবসন ছাড়া অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর ধনদৌলত-অট্টালিকা-ঘরবাড়ী কোনো কিছুতেই অধিকার নেই।

বাংলাদেশ ছাড়া সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত মিতাক্ষরা আইনের অধীনে ছিল।

এবারে বিজয়লক্ষ্মী চোখে সত্যিই অন্ধকার দেখলেন। দেবরদের সঙ্গে কিছু মনান্তর হল। আইনের কড়ি বাঘে খায় না—তাদের আইন আছে। বিজয়লক্ষ্মী বিদেশী রাষ্ট্রদূতের পদ নিয়ে বিদেশ যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। যাবার আগে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন।

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবরদের সঙ্গে তোমার নাকি মনোমালিন হয়েছে?"

বিজয়লক্ষ্মী প্রতিবাদ করলেন।

লোকচরিত্রে গান্ধীজী তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বল্লেন, "যাহোক বিদেশ যাবার আগে ওদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেল মনোভঙ্গের ব্যাপার।" বিজয়লক্ষ্মী তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ভাঙ্গামনে সৌজন্যের প্রলেপ দিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন। কত দিন পরে রিডার্স ডাইজেষ্ট পত্রিকায় এই সবচেয়ে ভালো পরামর্শটির কথা তিনি লিখেছিলেন। যাইহোক, আমাদের বক্তব্য হল এই যে অতবড় পরিবারের কন্যা বধূদের যদি এই দুর্গতি সমাজের প্রথায় হয় তাহলে সাধারণ নারীর দুর্দশা তো অনেক দূরের কথা।

*　　　*　　　*　　　*

তারপর হিন্দু কোড বিল এক এক দফা করে পাশ হয়েছে। সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বটে। তবে ভালো কি মন্দ হয়েছে সে ভার মহাকালের হাতে।

তবে দু'একটা সত্য চোখে পড়েছে।

তাহচ্ছে অধিকাংশ মা-বাপেরাই কন্যা সন্তানকে সম্পত্তি না দেবার মনোবৃত্তি পোষণ করেন। তাঁরা পুত্র সন্তানে বেশী নির্ভর করেন ও অনুরাগী। কারণ, তারা মা-বাপের সাধারণতঃ ভার নেয় এবং হেলায় শ্রদ্ধায় ভাইবোনের দায় দায়িত্ব বহন করে। না করলেও তারাই প্রীতিভাজন হয় ও সম্পত্তি ভোগী হয় এখনও দেখা যায়।

বিষয়ের ভাগ মেয়েকে মা-বাপ দিতে চান না। ভালোবাসেন কিনা বলা যাবে না। গোপন স্বার্থবোধ ও সম্মানের ভাবটা বৃদ্ধ পিতামাতার অবচেতন মনে শিকড়ে শিকড়ে জড়ানো আছে। ছেলের প্রতি তার ভালোবাসায় বেশী প্রকাশ।

মা-বাবার বিষয় হস্তান্তর করে নিতেও ভাইদের তৎপর দেখা যায়। বোন দেখেন—হিন্দু কোড বিলে লেখা আছে সবই। কিন্তু বিষম ঝামেলা। হিন্দু-শাস্ত্রেও তো অনেক বাণী ছিল!

যাক্। এখন শুধু তাঁরা বহু বিবাহহীন স্বামী, দরকার হলে বিবাহ বন্ধন ছেঁড়া আর ইচ্ছা থাকলে আবার বিয়ে করাটা আইনের দ্বারা পেলেও পেতে পারেন। আর পেতে পারেন শিক্ষার বিরাট সুযোগ ও বিপুল কর্মক্ষেত্রে

আত্মপ্রতিষ্ঠা। পিতৃ সম্পত্তি? সে কথা?—সে জিনিস সমাজের পুরুষদের সহস্র চোখ সহস্র পানিপাদ সহস্র সবলবাহুর অধিকারেই এখনো আছে।

আমাদের একালের মেয়েদের এই জাগরণের ও এই অধিকার পাওয়ার গোড়ার ঋণ একালের আমাদের প্রত্যেক সমাজের বিদেশী শিক্ষার দৌলতে পাওয়া। শ্রুতি ও স্মৃতিতে 'বহুবচন' ছিল বটে কিন্তু নারীগণ বিশেষ অধিকার পেতেন না। —এখনো একটা বড় কারণ রয়েছে সেটা হল ভয়, ভক্তি ও ভালোবাসার সম্পর্কে মেয়েদের সংকোচ আছে। তাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাদ প্রতিবাদ করে অধিকার সাব্যস্ত করতে তাঁরা আগেও পারেন নি—এখনো পারেন না।

হাওড়া জেলা কংগ্রেস মহিলা সম্মেলন শ্রামক মঙ্গল কেন্দ্র

২২শে আগষ্ট ১৯৫৮

মেয়েদের উত্তরাধিকারের পুরাতন কথা

সকলেই জানেন যে প্রায় একবছর ধরে কলিকাতায় আমাদের A. I. W. C. তরফ থেকে কয়েকটা সভা হয়ে গেছে এই উত্তরাধিকারের বিষয় নিয়ে। এবং এই একই কথা নানাভাবে নানাদিক দিয়ে বহু মহিলা আলোচনা করেছেন। আবার আজকে আমাদের এই বিষয়েই আলোচনা করতে হচ্ছে। খুবই পুরানো কথা অথচ বারবার বলতেই হচ্ছে। কেননা বার বার না বল্লে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না। কথায় বলে, ছেলে না কাঁদিলে, না ব্যস্ত করলে মাও দুধ দেয় না, নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে। আমাদেরও অনেকটা সেই দশা। কোনো অধিকার পেতে গেলে এমনি করে বারবার ঝালাপালা না করলে হয়ত সরকার কর্তৃপক্ষের অবসরই হবে না—মেয়েদের জন্য বিশেষ করে কিছু ভাববার (অবশ্য তাঁদের মনোভাবকে মার মনোভাব বলা যায় না, আমাদের মেয়েদের পক্ষে তাঁদের ব্যবহার কৈকেয়ী জননীর মত)।

এখন বলি ঃ এই উত্তরাধিকারের দাবী আজকের নয়, ১৯৩৬ সাল থেকে সভা সমিতি করে আলোচনা হচ্ছে, দাবী করা হচ্ছে। তারো আগে বহু লেখক ও লেখিকা এ বিষয়ে নানা মাসিকপত্রে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধাবলীতে মেয়েদের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে লিখেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর—'স্নেহলতা' নামের বইতে এই বিষয়ের আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে। পরেও বহু লেখক ও লেখিকা সাময়িক পত্রে এই অধিকারের দাবী করেছেন।

কিন্তু এওতো একরকম স্বাধীনতার দাবী; তাই স্বাধীনতার মত এও এত সহজে পাবার জিনিস নয়, দেখা যাচ্ছে। পুরুষ সমাজের সঙ্গে মেয়েদের অতি নিকট, মধুর এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকলেও তাঁরা কোনো বিশেষ সংস্কার বা অধিকারের ক্ষেত্রে একান্তভাবে নিজের জাতিবৎসল। তাই এ সব বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গে আপনারা দেখতে পাবেন দুর্যোধনের মত তাঁরা 'সূচাগ্র ভুমিও' দিতে রাজী হন না। তাই আজো প্রায় ২০।২২ বছর ধরে এই নিয়ে আলোচনা, কমিটি, সিলেক্ট কমিটি, দেশ বিদেশের মতামত গ্রহণের আর শেষ নেই। একে কথা ঠেলে রেখে কালহরণ করা বলা চলে।

সকলেই জানেন, হিন্দু কোড বিল—এর আগে রাও বিল, তার আগে দেশমুখ বিলে এই বিষয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে—শেষ দুটি বিল ইংরেজ আমলের রচনা। হিন্দু কোড বিলটি স্বাধীন হওয়ার পর রচিত হয়েছে। বহু উদারচিত্ত পুরুষ এর সমর্থনও করেছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন বিধানতন্ত্রে আমরা নরনারী নির্বিশেষে সমান অধিকার পেলাম সাব্যস্ত হ'ল। ভোট দেবার, ভোট পাবার অধিকারও পেলাম।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত নির্বাচনের আগে ঘোষণা করলেন—হিন্দু কোড বিল পাশ হবে এবং মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে, পিতা ও পতির সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবেন, নির্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিল পাশ হয়ে যাবে।

তারপর কি হ'ল সকলেই জানেন।

বিলটিতে তিনটি বড় অধিকারের কথা বলা হয়েছিল ঃ (১) বিবাহ সম্বন্ধে—পুরুষের সর্বত্র এক বিবাহ হবার আইন। (২) বিবাহ বিচ্ছেদ, প্রয়োজন হলে, নরনারী উভয়পক্ষই বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিতে পারবেন। (এখন পুরুষ ত্যাগ করতে পারেন আবার বিয়ে করতে পারেন। স্ত্রীকে নিজের সতীত্বের অধিকারে লাঞ্ছনা করতে পারেন ছাড়াছাড়ি না থাকায়। (৩) মেয়েদের বাপের সম্পত্তি ছেলেদের সঙ্গে খানিকটা অথবা সমান ভাগ পাবার অধিকার।

এখন কিন্তু ওটা আর এক আকারে নেই। সর্বত্র এক বিবাহ প্রচলনের স্থলে একটি ম্যাজিক দেখানো নতুন বিবাহ বিল আনা হয়েছিল। পাশও হয়েছে। তার নাম হয়েছে স্পেশ্যাল ম্যারেজ বিল। বলা বাহুল্য এটা সর্ব সাধারণে প্রযোজ্য হবে না। তিন আইনের বিবাহের আইনের মত একটি বিল মাত্র। তাতে লাভ হ'ল কার, বোঝা শক্ত। এবং এটার কোনো দরকার ছিল কিনা তাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কারণ ঐ তিনটি বিয়ের অধিকার আমরা সাধারণের ক্ষেত্রে চেয়েছিলাম। বিশেষের জন্য চাওয়া হয়নি! তাদের তো আইন পূর্বেও ছিল। এখন একথা থাক। উত্তরাধিকারের কথাই বলি। এখন কেন্দ্রীয় লোকসভায় গত অধিবেশনে এটিকে আনা হয়েছে। ভারতবর্ষের মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ দুটি ব্যবস্থা অথবা প্রথা নিয়ে। মনে রাখতে হবে, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ ব্যবস্থারও বার বার সংস্কার হয়েছে বৃটিশ আমলে এবং একেবারে মনু যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি মেনেই কোনোদিনই সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলেনি। ছোট বড় নানা সংস্কার সমাজে চলেছেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে সব সংস্কারই—পুরুষের নিজের জাতি স্বার্থ বাঁচিয়ে। কোনোখানে মা স্ত্রী কন্যার কথা তাঁরা ভাবেন নি। যা শাস্ত্রে আছে তাও মানেন নি। যা নতুন আসতে পারে তাতেও তাঁরা বাধা দিয়েছেন। যার জন্য এই বিশাল বিপুল মানুষ সমাজের অর্ধেকটা অংশ ক্রীতদাস জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তবু মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের মূল প্রভেদটা দু' কথায় বলি। মিতাক্ষরার প্রথা হ'ল পুত্র সন্তান জন্মের সঙ্গেই পৈত্রিক সম্পত্তির দায়াদ হয়, অধিকার পায়। দায়ভাগে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র উত্তরাধিকারী হয়। মিতাক্ষরাতে পিতা পুত্রকে স্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। একটু আলোচনা করে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন কোনো প্রথাই চিরস্থায়ী

নয়, কিন্তু আপাত স্বার্থহানির ভয়ে কূপ মণ্ডুকের মত চোখ বুজে এঁদের এক-শ্রেণী কেবলি বাধা দেন কোনো মানবিক সংস্কারের কথা উঠলেই। চোখ খুলে নানাদেশ বিদেশ স্বদেশের নানা জাতের কথা ভেবে দেখেন না। দেখলে দেখতে পাবেন আমাদের দেশেই মাতৃতন্ত্র সমাজ আছে। আসামে কোনো কোনো জাতে যেমন খাসিয়াদের মধ্যে। মাদ্রাজে বহু জায়গায় আছে কিছু জাতের মাঝে। ত্রিবেন্দ্রম রাজ্যে জ্যেষ্ঠাকন্যা রাজ্যাধিকারিণী পুত্র থাকলেও। মনে রাখতে হবে এই সব জায়গার মেয়েরা সমাজকে উন্নত করেছেন বই অবনত করেন নি। মদ্র-নারীরা শিক্ষায় সমাজ সংস্কারের কাজে অনেকক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর। শিক্ষিতা নারী উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতে বেশী। ত্রিবাঙ্কুর ত্রিবেন্দ্রমের মেয়েরা শিক্ষায় খুব অগ্রসর। আর্থিক অনধিকার তাঁদের অসহায় পঙ্গু করে রাখতে পারে নি বলে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করেন। কোনো ভারতবাসী মদ্র নারীর কোনো বিষয়ে নিন্দা করতে পারবেন না এই অধিকারের অপব্যবহারের বা কিছু অন্য বিষয়ে।

এইসঙ্গে বলা যায় মুসলমান মেয়েরাও অধিকার পান বাপের সম্পত্তিতে, এদেশে খৃষ্টান মেয়েরাও সম্পত্তি পেয়ে থাকেন ভাইয়ের সঙ্গে সমান। এখানেও সমাজ ভেঙে যায় নি। বরং মেয়েরা অন্নের দায়ে 'দাসী' জীবন-যাপন করে না।

কিন্তু এসব কথা অনেকবারই অনেকে বলেছেন, আমরাও আলোচনা করেছি সুতরাং আর বেশী করে বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন শুধু আমবা বলতে চাই কোথায় কি আছে শাস্ত্রে, কোথায় কি আছে লোকাচারে—এ দেখে আর মেনে পুরুষরা কেউই যখন চলছেন না, যুগধর্মে লোকাচার ও সংস্কার চিরকালই বদলেছে। এখনো আরো দ্রুতগতিতে সমাজে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। পুরুষ সমাজ নানা বিষয়েই সংস্কার মেনে চলেন না, চলতে পারেন না। শুধু মেয়েদের উত্তরাধিকারের বেলায় শাস্ত্র ও ধর্মের এবং লোকাচারের কঠিন বন্ধন মেয়েদেরও মেনে নেবার যুগ আর নেই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা অসংখ্য অশিক্ষিতা নারীসমাজ কখনো পিতা পতি পুত্রের অভাবে, কখনো তাদেরই উৎপীড়নে, অবজ্ঞায়, স্বেচ্ছাচারে, সমাজে কি দুর্দশাময় জীবন-যাপন করেন সে তো আর কারো দেখতে বাকি নেই। তাদের সেই সব "ম্লান মূক মূঢ় মুখে দিতে হবে ভাষা", তাদের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের জন্য পিতার ঘরে সন্তানের অধিকার চাই।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা দরকার—দিল্লীতে ৯ই এপ্রিলের সর্বভারতীয় হিন্দু-কোড সংক্রান্ত এক সভায় প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক ওহাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছেন…"হিন্দু কোড বিল উত্থাপিত হওয়ার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমার মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে যে, কর্তারা এই মৌলিক নীতির তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন কিনা সন্দেহ।"…'কোডে'র বিরোধিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বহু বিচারপতি

ও ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল—আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু আইন সম্পর্কে এই ব্যাপক বিধান রচনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন…। উত্তরাধিকার সম্পর্কেও বিরোধিতার কারণ যে, সম্পত্তি আরো বিভক্ত হয়ে যাবে।…অন্য ব্যক্তিরা (অর্থাৎ জামাতা ও দৌহিত্র ?) সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করুক ইহা তাঁরা চান না… ।" এতে হিন্দু সমাজের সংস্কৃতিও ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক সূক্ষ্ম বিচারের খ্যাতিমান আমাদের শ্রদ্ধেয় বিচারপতি মহাশয়ের কাছে আমরা এই সম্পত্তি বিভাগের গতানুগতিক যুক্তির পুনরুক্তি আশা করি নি এবং হিন্দু-কোডের অন্যান্য বিষয়েও অত্যন্ত সাধারণ মতবাদ শুনব মনে করিনি।

কোনো সমাজের সংস্কৃতি কি কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নির্যাতন ও দাসত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকে ? সাধারণতঃ স্ত্রী ছাড়া—সাধারণ লৌকিক ব্যবহার নারী সম্প্রদায় আত্মীয়-স্বজনের কাছে কি রকম সংস্কৃতিমূলক ভাবে পেয়ে থাকেন এবং স্ত্রীও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে চরিত্রহীনতাব ক্ষেত্রে কি রকম ব্যবহার পেয়ে থাকেন ? এই সংস্কৃতিটা কি রকম বস্তু, যেটি যাবে বলে ভয় ?—সেটা কি পুরুষ সন্তানের উত্তরাধিকারের অর্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ? যে-যে সমাজে মেয়েরা সম্পত্তি পেয়ে থাকেন, সন্তানের অধিকার পান, সেই সব সমাজে সংস্কৃতি কেমন সেটা নিশ্চয়ই বিখ্যাত ও বিজ্ঞ বিচারপতি মহাশয়দের ও রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের অবিদিত নেই। তাদের সম্পত্তি যদি ভায়ে ভায়ে—ভাই বোনে মিলিয়ে ভোগ করে এবং মেয়েরা ভাগ পাওয়াতে দুর্দিনে এবং সুদিনে পিতৃগৃহে সম্মানিত থাকে, সেটা কি সম্পত্তি ভাগের আতঙ্কের চেয়ে বড় জিনিস নয় ? যুক্তি ও মানবিকতার দিক দিয়ে সকল মানুষের সুখ সুবিধার দাবীর অধিকার অনেক বড় বিষয়, সম্পত্তির পুরুষ ছত্রাধিপতিত্বের চেয়ে। অবশ্য নারী সমাজকে এখনো মানুষ মনে করা হয় না নতুন সংবিধানের ঘোষণা সত্ত্বেও। তারা এখনো ব্যক্তি পুরুষের ভোগ্য এবং সম্পত্তির সামিল হয়েই আছে। তাই এত কথা ওঠে। এবং মানুষকে সম্পত্তি মনে করা যত দিন থাকবে তারা ক্রীতদাস প্রথার মত এই সব মতবাদ ও আইন চলতে বাধ্য হবে।

আর সম্পত্তি টুকরো হওয়ার কথাই যদি ওঠে, তাহলে পুরুষেরা সকল ভাইয়ে মিলেই বা বিষয় সম্পত্তির ভাগ নেন কেন ? একটি আরো চমৎকার প্রথা আছে—(বিদেশে লর্ডপ্রথা) রাজস্থানে জ্যেষ্ঠাধিকারী প্রথা আছে (ছিল)। বড়ছেলেই সম্পত্তির অধিকারী হতেন, ছোটরা 'ছুটভাইয়া' নামে অভিহিত হতেন। ভাইয়ের জমিদারীর সামান্য জমিতে লাঙ্গল চালাতেন, ক্ষেত খামার করতেন স্বহস্তে। ধনী বড়ভাইয়ের তামাকও সাজেন তেমন দুর্দিনে। এই প্রথা চলুকনা এদেশেও ? কিছু দরিদ্র ভাই ভিখারিণী বোনের পাশে এসে দাঁড়ান না ? আমাদেয় দাবী সমাজের দিক থেকে হিন্দু-কোডের আবার সংশোধন বিলে এই প্রস্তাবটি যেন

মেয়েরা তোলেন। সেদিন দেখা যাবে এই ভাগাভাগির বিষয়ে পুরুষ সমাজ কত উদার ও সম্পত্তি ভাগের বিরোধিতা করেন কিনা।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—সম্পত্তিমূলক স্বার্থের জন্য নানা প্রকার অদল বদল করার ব্যবস্থা। সেটা হচ্ছে, মাদ্রাজে বহুক্ষেত্রে মাতুল ও ভাগিনী কন্যার বিবাহের প্রথা—পাছে মাতৃতন্ত্র সমাজে সম্পত্তি কন্যার দিকে চলে যায়। অথচ এই বিবাহটাকে incest বিবাহ বলা যেতে পারে (নিকট রক্ত সম্বন্ধীয়)।

মুসলমান সমাজেও নিকটাত্মীয়ার কন্যাকে বিবাহ করার প্রথা আছে। সেটার মূলেও হয়ত এই সম্পত্তি হস্তচ্যুতির আতঙ্ক বিরাজ করছে! আরো নানা সমাজে নানাবিধ প্রথা দেখলে বেশ বোঝা যাবে, ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজের যত রকম ভাঙাগড়া চলেছে, মানুষকে দাবিয়ে রাখা ও লুব্ধতাই এই সব প্রথার মূলে বাসা বেঁধে আছে। এসব কথা আমার চেয়ে বিচারপতি মহাশয়রা ও হিন্দুকোড বিলের বিরোধকারীরা অনেক বেশী জানেন ও বোঝেন, আমাদের তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৬০

অগ্রহায়ণ (১৩৬১) মাসের ভারতবর্ষে হিন্দু মেয়েদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যমদত্ত মহাশয়ের একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় সাধারণভাবে নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেছেন, শুধু একটা দিক বাদে সেটা মেয়েদের দিক।

আমাদের দেশে—নানারকমভাবে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রথা ছিল। যেমন বাংলা দেশ বাদ দিয়ে প্রায় সর্বত্রই মিতাক্ষরার নির্দেশ মত উত্তরাধিকারের চলন ছিল, শুধু বাংলা দেশেই দায়ভাগ। এছাড়া জমিদারী, জায়গীদারীর ক্ষেত্রে রাজা মহারাজা—নবাবীর ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা ছিল (এখনো আছে কিনা জানি না)। মাতৃতন্ত্রও ভারতবর্ষে মাদ্রাজের কোনও কোনও জায়গায় আছে—খাসিয়া আসামীদের মধ্যেও শোনা যায় আছে।

কিন্তু এসব আমার প্রবীণ পণ্ডিত লেখককে বলার দরকার নেই। সাধারণ পাঠিকা। আর পাঠকদের জন্য দু'একটা কথা বলছি।

দায়ভাগের সঙ্গে মিতাক্ষরার প্রভেদ মূলতঃ এই—দায়ভাগে পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার পায়, পিতা ইচ্ছা করলে বঞ্চিত করতে পারেন বা দিতে পারেন। মিতাক্ষরায় পুত্র সন্তান জন্মের সঙ্গেই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়। তাকে বঞ্চিত করার বা দান করার কথাই উঠে না। জ্যেষ্ঠাধিকার ক্ষেত্রে রাজোয়াড়ার জায়গীদারদের জ্যেষ্ঠ জন্মের সঙ্গেই উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি পান, অন্য সন্তান বঞ্চিত হয়। সে ক্ষেত্রে জমিদারী নানা ভাগে—সব ছেলেদের মধ্যেই আট আনা, ছয় আনা, চার আনা, দু আনা ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই সব ভাগাভাগির ভালমন্দের কথা মানুষে কম ভাবেনি। চিরকালই অদল বদল করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথা বদলেছে। আবার নতুন করে ভালমন্দ দুই দিক বিচার করে দেখা হয়েছে,—এও সবাই জানেন।

আমি ক্ষেত-খামার, হাল-গরু, বলদ, জাল-জমি, ঘটী-বাটির কথা বাদ দিয়ে বলছি আর একদিকের কথা—যে দিকটা লেখক আমাদের কাছে তোলেন নি।

তারও আগে একটি লেখার কথা বলি। কয়েক বছর আগে রীডারস্ ডাইজেস্টে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের একটি লেখা বেরোয়। লেখাটির নাম "শ্রেষ্ঠ পরামর্শ আমার জীবনে।"

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বিধবা হবার পর যখন রাশিয়ায় না আমেরিকায় দূতের পদ নিয়ে যান সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গান্ধীজী

দু চারটি কথার পর তাঁকে বলেন—"তোমার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে নাকি তোমার মনোমালিন্য হয়েছে?" শ্রীমতী পণ্ডিত প্রতিবাদ করে বললেন,—মনোমালিন্য কি জন্য হবে?····· গান্ধীজী তবু বললেন—বিদেশ যাচ্ছ বহু দিনের জন্য হয়তো। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রেখেই যাও······।

শ্রীমতী পণ্ডিত বাড়ী এলেন তারপর। গান্ধীজীর পরামর্শের কথাও ভাবতে লাগলেন।

এই আলোচনা ও ঘটনার কথা বলেছেন তিনি নিজেই। তিনি তিনটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। বিধবা হওয়ার পর দেখলেন বা শুনলেন, রঞ্জিত পণ্ডিতজী বা তাঁর স্বামীর পারিবারিক কোনও সম্পত্তিতে তাঁর বা তাঁর কন্যাদের কোনোও অধিকার নেই। কেননা মিতাক্ষরা আইন মতে কন্যাসন্তানের ও স্ত্রীজাতির স্থাবর অস্থাবরে কোনো অধিকার নেই। (দায়ভাগ, জ্যেষ্ঠাধিকার আইনেও নেই, হয়তো খোর-পোষ আছে—গৃহপালিত জীবের মত।)

মতিলাল নেহরুর কন্যা, জহরলালজীর বোন, প্রতিষ্ঠাও সম্পদশালী বংশের বধূ, কিন্তু একটি মৃত্যুর ইঙ্গিতে তিনি তাঁর তিনটি মেয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সাধারণ মেয়ের মত পরমুখাপেক্ষী ও নিঃস্ব পর্যায়ে এসে দাঁড়ালেন·····।

এই আকস্মিক বিপর্যয়ের দিনে ক্ষোভ, দুঃখ, মনের কষ্ট, দুর্ভাবনা হওয়া তাঁর স্বাভাবিক। মেয়েদের ও নিজেকে নিয়ে তা নিশ্চয়ই হয়েছিল। আর এই ক্ষোভের এবং মনক্ষুণ্ণতার সংবাদ গান্ধীজীর কানেও গিয়েছিল·····।

যাই হোক, শ্রীমতী পণ্ডিত গান্ধীজীর পরামর্শে মনের সমস্ত বিমুখ ভাবকে চেপে শ্বশুরকুলের সঙ্গে আবার নিজেকে সহজ করে নিয়েছিলেন। এই তাঁর কাহিনী। সম্পত্তির সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল কিনা কেউ জানে না অবশ্য। আমাদের মন্তব্য অনাবশ্যক। কেননা তখন এই বিল পাশ হয়নি। কিন্তু শতকরা ৭০ জনকে বাদ দিয়ে যে ত্রিশজন থাকে, যার অর্ধেক নারী—তারা যখন দুঃখে দুর্দিনে চোখে অন্ধকার দেখে পিতৃকুলের ও ঐশ্বর্যের পরিবেশের পাশে বসে তাদের কথাও তো এই সব সমাজপতি মহাশয়দের ও সমাজের ভাবা উচিত ছিল! সেই সেকেলে অথবা একেলে অশিক্ষিত বা শিক্ষিত নারীর দলের কিংবা কুমারী পতি-পরিত্যক্ত অপুত্রক বা কন্যা জননী মেয়েদের কথাও তো কোনো সহৃদয় পিতা বা পিতৃস্থানীয় পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিকে ভেবে দেখতে দেখি না? আজো যে এই প্রতিবাদের সুর উঠছে, বা পাছে মেয়েদের জন্য একখানা ঘর বা কয়েকটি ঘটী-বাটি অথবা দুটো ছেঁড়া বিছানা কিংবা কিছু কিছু নগদ টাকা চলে যায়, পাছে ছেলেদের ভাগে কম পড়ে যায়—সেটাও পিতা ও পুরুষদের তরফ থেকেই উঠেছে।

কিন্তু এই সাধারণ ঘরের খারাপ মেয়ে বা শিক্ষিতা মেয়ে অনেকেরই পিতৃকুল

নিঃস্ব নয় এবং ধনী শ্বশুর কুলেও দরিদ্র নয় স্বচ্ছল অবস্থারই ছিল বা আছে, কিন্তু আইনতঃ অধিকার না থাকার জন্য তাদের দীন লাঞ্ছিত হতশ্রদ্ধ জীবন-যাত্রা (কুমারী ও বিধবাদের) কে না দেখেছেন !

এবং হালের গরু—চাষের জমি, কাঁচা ঘর, ক্ষেত খামার আছে এমন চাষী গেরস্ত, জেলে-মালো, কামার-কুমার, গোয়ালা, ময়রা আদি ঘরের মেয়ে—যাদের তাদের ঐ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরের মেয়েদের মত সামাজিক ভদ্রতা বা বাইরের সৌষ্ঠব বজায় রাখতে হয় না—তারা দুর্দিনে কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়তে পারে এবং পড়ে। মিথ্যা ও বৃথা মানমর্যাদা সম্ভ্রমের মুখোস পরে তাদের থাকলে চলে না, যা আমাদের ঘরের মেয়েদের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। বাপের ভাত ও ভাইয়ের ভাত কিংবা বিধবা হলে সন্তানাদি নিয়ে শ্বশুর কুলের কারো দেওয়া মুষ্টিভিক্ষার দয়ারদানই (মনে রাখতে হবে দয়া ছাড়া আর কোনো দাবী এদের ছিলনা) এদের সম্বল। তবুও দেখা যাচ্ছে মেয়েরা যত দীন-দরিদ্রই হোক না কেন---বাপ মেয়েদের কথা ভাবতে একেবারেই ইচ্ছুক এখনো নন।

একশো বছর আগে যে প্রাচীন সমাজ ছিল, তাতে মোটা ভাত কাপড় দিয়ে কিছু আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা খুড়ি জেঠি পিসি মাসী বোন প্রতিপালিত হতেন। জীবনযাত্রাও এত দুর্মূল্য ও কঠোর ছিল না। ঐ ধরনের সম্পর্কীয়াদের আশ্রয় না দিলেও সেকালে সমাজে নিন্দিত হতে হত। যদিও সে জীবনও সুখময় হত না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর পিতামহীর স্বামীর সন্ন্যাস কালে পিতৃগৃহে বাসের লাঞ্ছনা, আবার শ্বশুর কুলেও নিরুপায় দৈন্যময় সম্মানহীন জীবন। এধরনের নজীরের অভাব যমদত্ত মশাইয়ের কাছেও হবে না আশাকরি।

শাস্ত্রমতে নারীর জীবিকার উপায় ছিলেন তিন জন—পিতা-পতি-পুত্র। রক্ষণাবেক্ষণও তাঁরাই করতেন। এযুগে প্রথম জীবিকাদাতা হলেন বাপ। কিন্তু দ্বিতীয় জীবিকাদাতা বা রক্ষক একালে নানা কারণেই ঠিকমত করে মেয়েরা লাভ করতে একেবারেই পারে কি না কোন ঠিকানা নেই। কাজেই পিতার বর্তমানে এবং অবর্তমানেও পিতার একটি দায়িত্ব থাকা উচিত—তার জীবিকা ও আশ্রয়ের জন্য। সম্পত্তি থাকলে উত্তরাধিকার দেওয়া—না থাকলে যুগোপযোগী স্বাবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া। বিয়ে হয়ে বিধবা হলেও নতুন করে একটা সমস্যা এসে পড়ে—শ্বশুর কুলে সম্পন্ন অবস্থা হোক বা না হোক তাতেও ফাঁকি দেওয়া চলে সে নজীর লেখক মহাশয় নিজেই দিয়েছিলেন—মুসলমান মেয়েদের পরিচিতি অনুসারে পিতৃকুলে অধিকারিণী হলেও। সুতরাং এই ফাঁকি যাদের চোখে অধিকারই ছিল না বা সেই তাদের দেওয়া আগেই সহজ। কাজেই শুধু গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় পাওয়া যে বিধবা, কুমারী ও বিপন্ন মেয়েদের কত কঠিন সে দৃষ্টান্ত বা নজীর শ্রীমতী

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বিদ্যাসাগরের পিতামহী প্রমুখ অনেক মেয়েরই জীবন-কথাতেই পাওয়া যাবে।

আইনতঃ কোনো অধিকার না থাকাটা এমনি মসৃণ সরল সোজা ব্যাপার, যার কোনো খোঁচ-খাঁচ নেই, এক মুহূর্তেই পায়ের তলায় মাটি ভূমিকম্পের মত ফাঁক হয়ে পাতাল প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে আশ্রয়হীন করে। যার জন্য শ্রীমতী পণ্ডিতকেও বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্য হতে হয়েছিল। তখন সে ক্ষেত্রে সম্পত্তিবান-বাপ কৃতী দেবর-ভাসুর ভাইয়ের সম্পত্তিতে এবং বিবেকে একটি খোঁচাও না দিয়েই এক নিমেষেই সাধারণ বিধবা বধূ, কন্যা, মেয়ে পথের ভিখারিণীর পর্যায়ে দাঁড়াবেন আশ্চর্য নয়। দু একটি চমৎকার কথার মার প্যাঁচ 'ভাগ্যের দোষ', 'কর্মফল' বলেই কর্তব্য ও বক্তব্য তাঁদের উত্তরে শেষ করা চলে।

অনেক কথা আর বলার দরকার নেই কেননা—আইন পাশ হয়ে গেছে। নানা রকম ফাঁকি দেবার চেষ্টা এবং মহৎ অভিপ্রায় সত্ত্বেও মেয়েরা অনেকেই কিছু কিছু পাচ্ছেন ও পাবেন। যদিও কৌতুকের বিষয় এও শোনা যাচ্ছে বহু স্নেহময় উদার হৃদয় পিতা তাঁদের পুত্র-পৌত্রদের উইল করে সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছেন পাছে মেয়েরা ভাগ বসাতে চেষ্টা করে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, (১) সম্পত্তিতে মেয়েদের ভাগ তার পাওয়া উচিত সন্তান হিসাবেই। (২) মেয়েরা যেহেতু সহজেই জীবিকা অর্জন করতে পেরে ওঠেন না—গৃহধর্মের দায়ে এ দায়িত্বে এবং শিক্ষার সুযোগও ঠিকমত পান না সেই জন্য। এই কারণেও মেয়েদের সম্পত্তিতে কিছু অধিকার থাকা দরকার। সে ক্ষেত্রে ছেলেরা অনায়াসেই কাজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। মেয়েরা দুর্যোগের দিনেও শ্বশুর বা পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী হলে সন্তান মানুষ করতে সহজে পারবেন। কেননা সন্তান পালনের দায় বিধবা জননীকে বহন করতে হয় সর্বত্রই।

মোটকথা মেয়ে বা পুরুষ বলে নয়, মানব জাতির অর্ধেক অংশ নারী। সংসারের দায়িত্বভারও পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ ও বহন করেন, যেমন ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ও সঙ্গতভাবে—তেমনি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ও আইন সঙ্গত অধিকার তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল আরো আগে। এখন পেয়েছেন সেজন্য জাতীয় সরকার ধন্যবাদ।

এখন বলি—রামবাবু, শ্যামবাবু ও তাদের কন্যা-জামাতা ও পুত্রবধূর সম্পত্তিতে অধিকার ও ক্ষতিলাভের হিসাব নিকাশগুলি পড়ে চমকৃত হলাম।

মনে মনে ভাবলাম, আগের দিনের শ্যামবাবু রামবাবুরা যখন বিধবা পুত্রবধূর ও কন্যাদের কথা ভাবতেন না, সেই সব বিপন্ন দুর্দশাগ্রস্ত বধূ ও মেয়ের জীবনে ও জীবিকার কথা লাভক্ষতির কথা কি যমদত্ত মহাশয়ের একটুও স্মরণ পথে আসেনি? সুদকষে হিসাব নিকাশ করার সময় আগে পরে মৃত্যুর দুর্যোগে ভাইদের সাহায্যে কতগুলি টাকা কম পড়ায় হিসাব করার সময়?

মনে হয়, আমাদের এই ভালোমন্দ লাভক্ষতির দিকটা প্রবল ও পুরুষ পক্ষেই তো চিরকাল দেখা হয়েছে। এখন এই মাত্র তিন বছরের শিশু আইনটি নিয়ে না হয় তাঁরা কিছুদিন সামান্য ক্ষতি ও অসন্তোষ স্বীকার করুন না? এবং যাকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হচ্ছে হয়ত তার ক্ষতি পূরণ করে দেবেন পুত্রবধূ। সেবিষয়ে তো ইতিহাসেও নানাবিধ সমাজে—নানা নজীর দেখা যায়। (আর এতো চুলচেরা ভাগের ক্ষতির ক্ষোভ উপার্জক-সম্প্রদায়ের মুখে সাজে কি?) যথা, মাতৃতন্ত্র সমাজে দেখতে পাবেন কোন সম্পত্তি পেলে মামারা ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। নিশ্চয়ই ভাগ্নীকে ও ভগ্নীকে ভালবেসে নয়। এমন কি ওখানকার মালাবার কেরালার খৃষ্টান সমাজেও মামা-ভাগিনীর বিবাহ প্রচলিত।

মুসলমান সমাজেও নানা সম্পর্কের খুড়তুতো পিসতুতো মামাতো মাসতুতো ভাই বোনে বিবাহ প্রচলিত আছে। সেও ঠিক কুলগত পবিত্রতার উদ্দেশ্যে বোধ হয় না। মনে হয় সম্পত্তি হাত থেকে বেরিয়ে না যায় তারও উদ্দেশ্য এই।

প্রাচীন মিশরের রাজবংশে সহোদর ভাই-বোনে—অনেক বয়সের তারতম্য শিশু ভাই বয়সে-বড় বোনে বিবাহ হত। রাজ্য ভাগাভাগির ভয়ে ভাবনায় নয় কি?

এক কথায় বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে পুরুষেরা চিরকালই যেমন সচেতন ও বুদ্ধিমান মেয়েরা তেমনি নির্বোধ ও বিশ্বাসপরায়ণা। তাই সব সময়ে পুরুষরা আইনের ফাঁকে সমাজে নতুন প্রথা গড়েও ভেঙে নিজেদের দিকে ঝোল টেনে নিয়েছেন এবং তাই তাঁরা শরিয়ত বা মাতৃতন্ত্র সমাজেও ফাঁকিতে পড়েন নি। যদিও নিকটাত্মীয় বিবাহ খুব প্রশস্ত মনে করা হত না—বহু সমাজেই।

...তা এখনো আমরা লেখককে আশ্বস্ত হতে বলতে পারি, এক্ষেত্রেও পুরুষ ক্ষতি-লাভ খতিয়েই বিয়ে করবেন। তাঁদের সে বুদ্ধি আছে। অথচ আমাদের মেয়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এই লেখাটি শেষ করার পরে মাঘ মাসের ভারতবর্ষে যমদত্ত মহাশয়ের আবার একটি লেখা বেরিয়েছে পড়লাম। সোপেনহারের পুরানো তিক্ত কথা ছাড়া বিশেষ নতুন কোনো বক্তব্য আর তাতে নেই। শুধু একটি অতি দ্রুত বাজে খেলো উপমা দিয়ে ট্রাম বাসে লেডীস সীটের সঙ্গে উত্তরাধিকারের অধিকার লাভের ক্ষুব্ধ হিতর্ক তুলনা না করে থাকতে তাঁর না পারাটা আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে! এবং সেই সঙ্গে নারীর সৈনিক হওয়া? জিজ্ঞাসা করি, লেখক কি নারী বীরাঙ্গনাদের কাহিনী শোনেন নি কখনো।

অবশেষে বলি, লেখক মহাশয়ের ধারণা কয়েকটি আধুনিক কালের মেয়ে এই আন্দোলনটি সুরু করেছেন। তা ঠিক নয়, তিনি পড়ে দেখতে পারেন এই আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' নামের প্রবন্ধাবলীতে আছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর ও কামিনীর বহু রচনায় পাবেন। এঁদের পরে এই শতাব্দীতেও বহু লেখক-লেখিকার এ বিষয়ে রচনা ভারতবর্ষের গোড়াতেই দেখতে পাওয়া যাবে। ৩০।৪০

বছর আগে আমিও একজন তাঁদের মধ্যে ছিলাম। আমি মোটেই আধুনিক লোক নই। এ ছাড়া মেয়েদের উত্তরাধিকার না থাকার জন্য অসুবিধা অসম্মান গ্লানি দুঃখ দৈন্যের-অভিজ্ঞতা এই সমাজের মধ্যে থেকে অনেকের মত আমারও দেখতে বাকি নেই।

লেখক আরো বলেছেন সে কথারও উত্তর দেওয়া দরকার মেয়েদের সংসারের দায়িত্ব সম্বন্ধে। বহু মেয়ে এ যুগে উপার্জন করে ভাইবোনের প্রতিপালন করেছেন, কারণ সকলেই জানেন—লেখকও জানেন নিশ্চয়। বহু পুত্র যে পিতা মাতাকে ভাইবোনকে দেখেন না, তাও নিশ্চয় দেখে থাকবেন। যদিও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে একথা অপ্রাসঙ্গিক।

এই আন্দোলনের জন্যই হোক, বা যে কারণেই হোক—এই সামাজিক অসুবিধাটা নিশ্চয়ই বিজ্ঞ ও পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যার ফলে শ্রদ্ধেয় দেশমুখ, বি. এন. রাও, আম্বেদকর প্রমুখের একান্ত চেষ্টায় এই আইন রচিত হয়ে এতদিনে পাকা হয়েছে। যা আমাদের উত্তরকালিনীদের অনেকেরই জীবন যাত্রায় কঠোর বন্ধুর পথ খানিকটা সুগম করে দেবে—এইটেই সার্থক লাভ মনে করি।

এইবারের রচনায় যমদত্ত মহাশয় মেয়েকে যাঁরা উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি কিছু দেন নি—তাঁদের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন দেখলাম। আমিও দু' একজন বিখ্যাত লোকের নাম তাঁর অবগতির জন্য জানাতে পারি। একজন তিনি ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। যিনি সেই ৪৫ বছর আগেও যখন এই আইনের জন্য কোনো আলোচনা আন্দোলনও দেশে হয়নি তখনকার দিনে—তাঁর দুটি পুত্রকন্যাকে—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী মায়া দেবীকে—সমান ভাগে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর অসাধারণ উদারহৃদয়ের চিন্তা ও পিতৃস্নেহ ছেলে ও মেয়ের জন্য দু ধারায় দুভাবে প্রবাহিত হয়নি এবং আমরা বলি লর্ড সিংহ ও সার রাজেন্দ্র মেয়েদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছেন—ছেলেদের সঙ্গে তুল্যাংশ না হলেও।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৬২

অধিকারবোধ, অধিকারবাদ, ও অধিকার প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনে এটা দরকার। চাই-ই—এবং ভাবার বিষয় তা আছে কিনা—পাওয়া গেছে কিনা।

সেদিন লেকটাউনে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের যে অধিবেশনটি হয় তাতে সমাজ জীবনের মেয়েদের করণীয় কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অনেকে করেন।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী বলেন—"আমাদের সাম্প্রতিক সমাজ জীবনে আদর্শ হীনতা ও দুর্বার দুর্নীতি যা জাতীয় চরিত্র কোথায় অধঃপতনে নিয়ে চলেছে।"

শ্রীমতী সুশীলা সিংহীও বলেন—"আমাদের জীবনের মূল্যবোধ নীতিনিষ্ঠায় কোন আদর্শ নেই মনে হয়।"

শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা বলেন,—"মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা তাঁদের ভয়, এই ভয় নারী সমাজের, সমাজের মানুষকে গুরুজনদের এমনকি পরবর্তীকালে ছোটদেরও ভয় করে চলতে হয়···সন্তানদিগকেও···। ভয় সংকোচ দিয়েই যেন জীবনযাত্রার অভিযান চলে···।

এসব তো সাম্প্রতিক সমস্যার নানা বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা। আজ থেকে দুশো দেড়শো বছর আগে আমাদের সমাজ সংস্কার এবং শাস্ত্রের দিকে একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে বোঝা যায় এই ভীত নারী জাতির আমাদের নিজেদের জীবনমরণ বা মরাবাঁচার অধিকারই ছিল না।

পৌরাণিক যুগের তো ইতিহাস নেই। যা কথা বা কাহিনী আছে তাতেও সেটা মধ্যযুগের চেয়ে কিছু অন্যরকম ছিল, মনে হয় না। কয়েকটি রাজকন্যা, রাজরানীর ভাগ্যে যা হতে পেরেছিল কিংবা সীতা দ্রৌপদীদের যা অনায়াসে হতে পেরেছিল তা সাধারণ ঘরেও অনায়াসে হত তাতে সন্দেহ নেই।

মেয়েদের জীবনমরণ যথা বেঁচে থাকার অধিকারের সিদ্ধান্ত এই সেদিনও ছিল। সমাজ শাস্ত্র প্রব্রজ্যাদের হাতে। শিক্ষা জীবিকা, বিবাহ সন্তানদের দায়িত্ব ও সেইসঙ্গে তাদেরই হাতে বেঁচে থাকার অনধিকার তো ব্রিটিশ আমল ১৮২৯ সাল অবধি ছিল রামমোহন রায়ের যুগ অবধি। সতীদাহ বা সহমরণ যখন প্রবল প্রতাপে সমাজে উচ্চবর্ণে প্রচলিত।

সংস্কার :—

"নারীর লেখাপড়ার সংস্কার"

১৯০০ সালে আমরা তখন ৫/৬ বছরের মেয়ে। একখানি বই হাতে দিলেন পড়ার ঘরে। তখনকার আমাদের পাঠ্য বিদ্যাসাগরের বই। প্রথম ভাগ থেকে

বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী অবধি পড়ার ঘরের বয়সের সীমাও বিবাহের বয়সের সীমাতে নির্ধারিত ৬।৭।৮।৯।১০ অবধি। যেটিকে গৌরীদান, কন্যাদান কাল বলা হত। এগার পার হলেই সে আর কন্যা থাকত না 'অরক্ষণীয়া' মেয়ে হয়ে উঠতো।

এই বইখানিতেও অনেক কিছু ছিল। ব্রিটিশ আমল তখন—বহুনিন্দিত মিশনারীদের কল্যাণময় উদ্যোগেই মেয়েদের জন্য শহরে নগরে দু'একটি পাঠশালাও হয়েছে। যে পাঠশালায় পড়ার বয়সের সীমাও ৫-১০ অবধি। তবু পড়াতো। বিদ্যাসাগরের বইয়ের আগে 'শিশুবোধক' নামে একটি বই পাঠ্য ছিল। চিঠি লেখা সহ। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় এবং হিন্দু সমাজের, বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের চেষ্টায় বেথুন স্কুল আরও ছোট-বড় শিক্ষালয় দেখা দিতে লাগল। মিশনারীদের প্রথম স্কুলটির নাম 'একরয়েড্' নামে এক মেমসাহেবের নামে। ঐ নারী শিক্ষা বইটির সম্পাদনা কে বা কারা করেছিলেন আজ আমার মনে নেই। হয়ত ব্রাহ্মসমাজ নয়তো বিদ্যাসাগরের অনুগামীরা কেউ। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ হতে পারেন।

যার প্রথম একটি প্রবন্ধ ও সরলার কথোপকথন বক্তব্য সেকালের তার আগের 'সেকালে' মেয়েদের শিক্ষা, যে সমাজের বাণী বা সংস্কার ছিল "মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়…।"

বলা বাহুল্য এমন ভয়ানক কথা শুনে কোন মা বাবা মেয়েদের বই ছুঁতে দেবেন এবং কোন মেয়ে জ্ঞানে ছোঁবে (আমার নিজের ১৯২৫ সালের বৈধব্যের পর মনে হয় পড়াশুনার জন্যই বোধহয় এটা হল)।

অবশ্য তখন ১৮২৯ সালের পর আরো বছর গড়িয়ে গেছে। আইনে সতীদাহ বন্ধ হয়েছে। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের বালিকা বিধবা ও বহু বিবাহ বন্ধ আন্দোলন সুরু হয়েছে এবং মেয়েরা বেথুন স্কুলে ভর্তি হচ্ছেন। প্রথম তিনটি মেয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কুন্দমালারা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুহিতা সৌদামিনী দেবীর নাম এখানে করতে পারি। আমরা বাঁচার অধিকারের ২৫।২৬ বছরের পর পড়াশোনা বর্ণ পরিচয়ের সুযোগ ও সাহস পেলাম, পাঠ্য বই পেলাম। বিধবা হবার আতঙ্ক আর নেই। পুড়িয়ে মারবার ভয়ও আর নেই। অবশ্য এখনো শতকরা আমরা ৯০ জন নিরক্ষর সব শ্রেণীতে ও ঘরে। ঘরে তবু বিয়ে হত ১১ বছরের মধ্যেই এবং অতদিনের মধ্যে সমাজ ও সংস্কার ও স্বভাবের বিশেষ বদল হয়নি। ১৩১৯।২০ সালে স্নেহলতা নামে 'অরক্ষণীয়া' একটি মেয়ে (যার বয়স ১৪।১৫ পার হয়ে গেছে) বাড়ীতে ধিক্কারে মনের গ্লানিতে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করল। তারপর আরও কত মেয়ে। আমাদের বয়স তখন ১৯।২০। অথচ তখন ব্রাহ্ম সমাজে সুশিক্ষিতা কত নারী মেয়েদের আবির্ভাব হয়েছে। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু, সরলা রায়, কামিনী রায়, অবলা বসু প্রমুখ। হিন্দু সমাজে

শুধু স্কুলে পড়া চলছে বালিকাদের। এই হল সেকালের অনড় অটল সংস্কার। সব শিক্ষার দড়িটা একটা খুঁটিতে বাধা। একটা সীমা অবধি নড়েচড়ে।

এবং সমাজ ঃ—

১৩২৮ সালে কলকাতায় রয়েছি। বাড়ীতে ছোটছোট দুটা মেয়েকে ডাফ স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। একটি ১৪।১৫ বছরেরকে বাড়ীতে। ভাইবোনেরা পরামর্শ করলাম তাকেও ঐ স্কুলে ভর্তি করে দিই। ভর্তি হল। পর্দা স্কুল। তার স্বামী আমার ভাই ও আমার পিতারও খুব মত ছিল। সেলাই, পড়াশোনা, কিছু গৃহকার্য সবশুদ্ধ সেটা 'বধূ ক্লাস' ছিল। (১৩২৮)

সহসা একটি প্রতাপান্বিতা বনেদীঘরের বধূ এক পিসিমার আবির্ভাব। এসে চোখ রক্তবর্ণ করে বল্লেন (পল্লীসমাজ স্মরণীয়)—কি কর্তে করছিস্ তোরা? ঘরের বৌকে স্কুলে পাঠাচ্ছিস? আমি ভাসুর শ্বশুরদের কাছে কি করে মুখ দেখাব? (যদিও ঘোমটার যুগে ভাসুরদের শ্বশুরদের সঙ্গে কথা নিষিদ্ধ।) নিন্দেয় মুখ তুলতে পারব না। কালই স্কুল যাওয়া বন্ধ কর। বলা হল স্বামী ও আমার পিতার মত আছে। সে কথা কে শোনে। এইসব সমাজপতি পিসির ভাসুর, মাসির খুড় শ্বশুর, মামার শ্বশুররাই তো চারদিকে দাঁড়িয়ে চন্দনকাঠের চিতায় চিরকাল সতীদাহেরও বিশেষ তদারক করিয়েছেন। সম্ভবতঃ পিতামাতারও ঐ মুখ দেখানোর আতঙ্ক ছিল। মেয়েদের ঐ পড়াশোনায় বৈধব্য ব্যাপারেও তারাই তদারক কর্তা হর্তাকর্তা বিধাতা। এসে পিসি, মাসী, নারীর কথা বলে যেতেন। এই হল সমাজ। কৌতুক এই তারপর পিসির পৌত্রীরাই। এরপর এল হিন্দু কোড বিল। দেশব্যাপী সমিতি প্রচার আন্দোলন সভা আলোচনা চলল দিনের পর দিন নর-নারীদের মিলিত সভায়।

অধিকারের বিষয় (১) পিতার সম্পত্তিতে পুত্রকন্যার সমান অধিকার, (২) নরনারীর এক বিবাহ, (৩) নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, এবং পুনরায় বিবাহের অধিকার যদি ইচ্ছুক হন। এছাড়া ছোটবড় আরও অধিকারের আলোচনা।

দীর্ঘ ১০।১৫ বছর কাটল। ১৯৪৭ এলো। দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীন দেশের সংবিধানও রচিত হল। আম্বেদকর সাহেবের অধিনায়কতায়। নরনারীর ভোটাধিকার, নাগরিকের অধিকার বিধানও হল। শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে অধিকারও সমান হল।

কিন্তু হিন্দু কোড বিল পাশ হল না। এখন কাহিনী শোনাই উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে। স্বাধীনতা পাবার কিছুদিন আগে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নেহেরু দুহিতা পণ্ডিত রঞ্জিত পণ্ডিতের স্ত্রী বিধবা হল। তিনটি কন্যা নিয়ে…পুত্রসন্তান ছিল না। আমাদের দেশে দুটি অধিকার বিধি প্রচলিত আছে। সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'মিতাক্ষরা' বিধান প্রচলিত। (১) যার

মোটামুটি বিধান পরিবারের পুরুষ জাতক জন্মের সঙ্গেই। তার পৈত্রিক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী হবেন, বাপ, ভাই, কাকা, জেঠার মতই।

(২) আর কিছুটা পূর্বভারতেও বাংলাদেশের বিধানের নাম হলো 'দায়ভাগ'। 'দায়ভাগের' বিধানের নির্দেশ পিতা বা ঐ ধরনের পুরুষ সম্পত্তি অধিকারীরাই আজীবন সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী থাকবেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশেই সম্পত্তি ভাগ বা দাম বিক্রয় হবে। পুত্র পৌত্রদের তাঁর জীবিত কালে কোন অধিকার নেই। তিনি যথেচ্ছ দান খয়রাত বিক্রী করতে পারেন; এক কথায় তাঁরই সব অধিকার।

(৩) দক্ষিণ ভারতে নানা বিধিবিধান কোথাও মাতৃতন্ত্র, মাতা-কন্যা উত্তরাধিকার; কোথাও দায়ভাগ মত। মিতাক্ষরা বিধান সে দেশে নেই। এই দেশমুখ রচিত হিন্দু কোড বিল আলোচনা বেশ দুতিন বছর প্রচারিত ও লোকসভায় আলোচিত হল। স্বাধীনতার পরও আলোচনা চলল।

এখন বলি, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বৈধব্যের পর দেখলেন তিনি একেবারে অধিকার ও উত্তরাধিকারের সম্পত্তি আইন অনুসারে ধন অর্থ সম্পদহীন। অকস্মাৎ একজন আশ্রিতা বিধবা হয়ে গেছেন ' (সাধারণ মেয়েদের জীবনে যেমন পতির মৃত্যুর পর) পরের ঘরে তাঁর কন্যাদের কোন দাবী দাওয়ার অধিকার নেই।

দাক্ষিণ্যের দান, আশ্রয় ও অন্ন অবশ্য একান্নভোগী পরিবারের মত আছে। পেতে পারেন যা বিধবা জননীরা পেয়ে থাকেন।

সম্পন্ন ঘরের মেয়ে নেহেরু দুহিতা একেবারে বিমূঢ় হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন. রঞ্জিত পণ্ডিতের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে কিছু আলোচনা হল, কিন্তু অভিমানী হতবুদ্ধিনারী বিমনাভাবে কর্ম নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। তখনো গান্ধীজী জীবিত। দেশ স্বাধীন হয়নি।

তিনি যাবার আগে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন—গান্ধীজীর আহ্বানে, গান্ধীজী তাঁকে কিন্তু শান্ত হবার ও দেবরদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা মীমাংসা করার উপদেশও দেন। সম্ভবতঃ নেহেরুও ভগিনীর এই আকস্মিক অবস্থার দুর্দশা ও অবস্থার আমূল পরিবর্তনে বিচলিত হয়েছিলেন। যা সমাজের বিধান সবঘরে মেয়েদের জীবনে পতির মৃত্যুর পর অহরহ সব দেশেই হয়ে থাকে। য়ুরোপেও হত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'নারীর স্বাধীনতা' (সাবজেকসন অব উইমেন ') বইয়ের একটা প্রধান মন্তব্যে পাই "বিবাহই নারীর একমাত্র জীবিকা ...।" ব্যাখ্যা টীকাসহ অবশ্য।

অতঃপর এই হিন্দু কোড বিল নিয়ে ১৯৫৬।৫৭ সাল অবধি বাদবিতণ্ডা আলোচনা চলে লোকসভায়। শেষে খণ্ডে খণ্ডে তিন ভাগে তিনবারে একটি একটি করে এই অধিকারবাদ, বোধ এবং প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হল।

আম্বেদকর সাহেবের সংবিধানের পরও এই হিন্দু কোড বিল দীর্ঘদিন

মুলতুবী অবস্থায় ছিল। অবশেষে একটি একটি খসড়ায় বিশেষ বিশেষ ভাবে রচিত ও অনুমোদিত হল। (১) বিশেষ বিবাহ বিচ্ছেদ বিল। পুরুষের তো স্ত্রীকে যথেচ্ছ ত্যাগের (বহু বিবাহের প্রথা) প্রথা ছিল মেয়েদের জন্য সে অধিকার এটার বিশেষত্ব। (২) মেয়েরা অবাঞ্ছিত স্থলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারার অধিকার ও পুনরায় বিবাহের অধিকার। (৩) শেষ অবধি উত্তরাধিকার বিল, পিতামাতার সম্পত্তিতে 'দায়ভাগ বা মিতাক্ষরা' যে কোনো বিধানেই পুত্রকন্যারা সম্পত্তিতে সমান অধিকার দাবী করতে পারবেন এবং পারেন।

এই সময়ে ১৯৫৬।৫৭ সালে আমাদের এই ১৯৭৫ এর নারীবর্ষের আন্দোলনের সভানেত্রী শ্রদ্ধেয় রেণুকা রায় লোকসভাব বিশেষ সদস্যা রূপে বিশেষ ভাবে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। এই অধিকারগুলির মোটকথা হল মেয়েদের মানুষের পূর্ণ অধিকার পাওয়া। শুধু মেয়ে মানুষ হয়ে অনুগৃহীত গলগ্রহ নিগৃহীত জীবনযাত্রা নয়।

এখন ভাববার বিষয় হল এই যে (১) অধিকারবাদ থেকে অধিকারবোধ আমাদের সর্বসাধারণের মনে জেগেছে কিনা, (২) অধিকার পাবার সাহস বা শিক্ষা হয়েছে কিনা, (৩) শিক্ষা বা ভরসা পেলেও অধিকাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে অথবা হতে পেরেছেন কিনা সর্বত্র?

উত্তরে দেখা যাবে প্রায়ই 'না'। অধিকার নিতে সাহস করেন নি। চিরকালের মতই বিবাহ ব্যাপারে—সম্পত্তির ব্যাপারে বঞ্চিতই রয়ে গেছেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। পিতা, ভ্রাতা, দেবর, ভাসুরের ভয়ে—সেই ভয়ই প্রথম কারণ। কারণ (১) শিক্ষার অভাব, (২) অজ্ঞতা, জানার অভাব, আরেক কারণ (৩) পুরুষ স্বজন বন্ধুর সহায়তার অভাব বা প্রতিকূলতা, তাই সাহসের ও ভরসার অভাব। মোটকথা তাহলে সবটাই দাঁড়াচ্ছে গিয়ে সেই গোড়ার কথায় নির্ঝর বা ঝরণার উৎসমুখে যাকে বলে 'শিক্ষা'!

বিবেকানন্দ যাকে বলেছিলেন শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা, যা না হলে মানুষের যে চিত্তের নিহিত শক্তি আছে তা জাগানো যায় না। জেগে উঠে না। তাই আজ এই আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে কি চাই? চাই আমাদের ঘরেবাইরে বয়স্ক শিশু সব মানুষের শিক্ষার জন্য আলোচনা ও আন্দোলন। বস্তিতে ঘরে ক্লমে কি মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র ঐ জাগরণের চেষ্টা, সাধনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

একটি ছোট কথা প্রসঙ্গে সে অনেক দিনের আগের কথা। একবার ১৯১৯।২০ অথবা ২৫।২৬ সালে একটি সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেন—গরমের ছুটিতে যে সব ছাত্রছাত্রীরা ছুটির অবকাশে দেশের গ্রামে যাবেন তাঁরা যদি একটিও নিরক্ষরকে অক্ষর পরিচয় করান তাতে দেশের একটি মানুষ আর একটি মানুষকে

মানুষ হবার সাহায্য করা হবে। কত সহজ চেষ্টায় সুন্দর নির্দেশ ভারি ভাল লেগেছিল কথাটা।

এখন একটি সাধারণ নারীর জীবনের ঘটনার কথা। যা প্রায় অনেক নারীর জীবনে ঘটে, বলি—১৩২৫ সাল, সহসা তাঁর জীবনে দুর্যোগ এলো, কয়েকটা শিশু বালক বালিকা নিয়ে তিনি বিধবা হলেন। সে বৈধব্য মানে শুধু বিয়োগ শোক নয় একেবারে অবস্থা বিপর্যয়। নিরাশ্রয় স্থানচ্যুত—(জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় জীবিকা চ্যুতি যিনি বলেছিলেন নারীর বিবাহ মানেই জীবিকা)। তাঁর বৃদ্ধ অবস্থায় শ্বশুর, শাশুড়ীকে আশ্রয় গ্রাসাচ্ছাদন দিলেন তাঁদের জ্ঞাতি, তাঁকে নিরাশ্রয় অনাথা মেয়ের মত পিতার আশ্রয়ে আসতে হল। যে বাড়ীতে খাওয়া পরার দাবী তার নেই। অধিকারই নেই বিজয়লক্ষ্মীর মত। সেটা নিতান্ত স্নেহের ও কর্তব্যের দায় মাত্র। তাঁর খুব বয়স বেশী হয়নি মাত্র ২৫।২৬ কিন্তু বিপদে পড়লে মানুষ বৃদ্ধের মত ভাবতে শেখে। আশ্রয়, গ্রাসাচ্ছাদন তা প্রতি-দিনের ব্যাপার। কিন্তু তারপর ? তারপরে ভাবতে লাগলেন সন্তানদের মানুষ করে তোলার কথা, কে করবে, কতখানি মানুষ হলে তারা কতটা মানুষ হবে।

মানুষ হওয়ার আদর্শ বা কি পাঠটাই কি ? প্রতিটা জীবিকা, চরিত্র, কিছুই বোঝেন না। যা বোঝেন অস্পষ্ট ভাবে শুধু শিক্ষার পথ।

তাঁদের কালের অনুযায়ী তাঁর নিজের বিদ্যা চিঠিলেখা আর পড়তে পারাতেই শিক্ষা সমাপ্ত। সেই বিদ্যায় বড় জোর রামায়ণ মহাভারত বাংলায় পড়া চলে কিন্তু শিক্ষার ব্যয়, ওদিকে মেয়েদের বিবাহের ব্যয়! চিন্তিত জননীর সন্তানগুলি পিত্রালয়ের দাক্ষিণ্যেই স্কুল পাঠশালায় ভর্তি হল। একটা দিন যেন একটি বছর। একটি বছর সে এক এক যুগ। ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে লাগল। বিবাহ হোক বা না হোক তিনি ভাববেন না। যদি পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে। যদিও সে সময়টা খুব সমাজের রক্ষণশীল সময়। মেয়েদের জীবিকা খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়া অন্যত্র প্রায় অচল। তবু দেখা গেল দীর্ঘ চেষ্টার পর সমাজ দাঁড়াতে দিচ্ছে মেয়েদের। তখনো স্বাধীনতার—সংবিধানের অধিকার আসেনি। কিন্তু শিক্ষার বিদেশী আদর্শ বা দেশী ইচ্ছা যাই হোক তাঁদের তার পরিবর্তিনী-দের দাঁড়াবার জায়গা করে দিয়েছে।

দীর্ঘ ৮০ বছর পর দেখা যাচ্ছে সেই সেকালের রামায়ণ মহাভারত পড়া চিঠি লিখতে পারা নারীদের মেয়েরা পৌত্রী দৌহিত্রীরা কলেজে পড়া শেষ করেছে। সরকারী বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে, মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আর অনুগ্রহ গলগ্রহ নিগৃহ লোকের জীব নয়। তারা রামমোহন যুগের অসকর্মাণ নয়। বিদ্যাসাগর যুগের বহুপত্নীক পতির স্ত্রী নয়। শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে বা অরক্ষণীয়া 'জ্ঞানদা' অথবা ধিকৃত স্নেহলতা বা বিধবা নারী হয়ে থাকবে না।

পিতাপুত্রের কাছে অসঙ্কোচে কিছু প্রয়োজনের জন্য দীনভাবে চেয়ে থাকবে না। গ্রাসাচ্ছাদন, অসুখ, ওষুধ বিষুধ লৌকিকতা, যে কোন কারণেই পতির কাছে নতশিরে সভয়ে দাঁড়াবেনা প্রয়োজন ব্যপদেশে।

সে দিনের নারী আমি, কিন্তু আমি একা নয় আমার পাশে কোটি কোটি এমন নিরক্ষর দীন মেয়ে আছেন। আপনারা সবাই জানেন তাঁরা কারুর ঠাকুরমা, দিদিমা, বা মামী বা পিসি হন।

এখন আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের সাধনা হোক মেয়েদের সুশিক্ষা, যাতে তাঁরা মহৎ হয়ে উঠতে পারেন। তাহলে তাঁদের সন্তান এবং সমাজও মহৎ হয়ে উঠবে।

মেয়েদের স্বভাব প্রকৃতি আদর্শ নিয়ে যুগযুগান্তর ধরে সমাজের অর্থাৎ পুরুষদের জল্পনা কল্পনার আর শেষ নেই।

প্রায় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মত ব্যাপার। যেন পুরুষ নুনের পুতুল নারীসাগরের জল মাপতে গিয়ে তার মনের অতলে ডুবে গলে গেলেন।

কিন্তু কৌতুক পরিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে বলা যায় জল্পনাটা চিরদিনই একতরফই চলেছে এবং এখনো কৌতুহল, আলোচনা মতামত দেওয়ার শেষ নেই সেই তরফ থেকেই।

এখন একথা থাক। এখন নারীর স্বভাব নিয়ে কথা বলতে আহ্বান এসেছে নারীর কাছেই তার একাল সেকাল মতি ও প্রবণতা নিয়ে।

একটি কথা মনে পড়ল সেইটা সবাইয়ের আগে বলি, পূজনীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের একটি লেখায় একজায়গায় পড়েছিলাম (গ্রন্থাবলীতে) মহাভারতের আলোচনায়। দেখা যাইতেছে মনুষ্যচরিত্র বিশেষ বদলায় নাই ।

তারপর বলছি আর একটি বুলি বা কথা। প্রথম কবে পড়েছি কার লেখায় কথাটার কে আবিষ্কর্তা কিছুই মনে নেই এতদিন পরে। সেই কথাটা হচ্ছে 'ম্যানলি উওম্যান'।

প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই কথাটি আমাদের মাসিক সাহিত্যের পাতায় আবির্ভূত হয়েছিলো। বিদেশী লেখকদের নানা মতামত নিয়ে এবং এদেশেও অনেকেই দুচার কথা আলোচনাও করেছিলেন এই বিষয়ে। এবং সাধারণ পুরুষ সমাজ যেন চমকে উঠেছিলেন এই পুরুষালী ভাবের মেয়ের আর্বিভাবের কল্পনায়। তাঁরা কি ভেবেছিলেন কোন্ দিক দিয়ে ভেবেছিলেন স্পষ্ট জানা যায় নি। কিন্তু সে রকমের আমাদের সাহিত্যের মাঝে একটা স্পষ্ট ছাপ পড়েছিলো যেন। 'ম্যানলি নারী' কেমন নারী? মনে পড়তে লাগল যেন 'মল্লনারী'র সঙ্গে কথাটার সাদৃশ্য রয়েছে।

আর ঘরের কোণে বসে আমরা তখনকার একেলে মেয়েরাও তখনকার নারীর অতি আধুনিকার মল্লনারী রূপে ভবিষ্যৎ পরিণতির এই অদ্ভুত কল্পনাতে বেশ ভীত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।

সে পরিণাম কি ভাবের হতে পারে তা ঐ বাক্যের আবিষ্কারক স্পষ্ট করে বলে দেননি। এবং কারুর জানা ছিলো না (এখনো জানা নেই)। কিন্তু 'পুরুষ মানুষের মত মেয়ে' তার আকার প্রকার চালচলন হাবভাবের ধরব যে কেমন হবে সে এক মহা কৌতুহল কল্পনার বস্তু ছিলো আমাদের কাছেও।

তার কোমল মসৃণ মুখ, তার কমনীয় দেহ, তার ভীরু সঙ্কোচময় লজ্জা, তার অপ্রতিভ হাসি, কথা—এগুলো কিভাবে কি মূর্তিতে বদলে দিয়ে 'ম্যানলি উওম্যান' আর্বিভূত হবে (যেন স্থির নিশ্চয়তা ছিলো হবেই) মেয়েদের মনে এক গোপন শঙ্কার বিষয় ছিলো।

যদিও আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশের' (গল্প) "জয়কালী ঠাকুরানীর মত দুর্ধর্ষ ম্যানলি" ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুণ্ডিত কেশা, দীর্ঘ নাসা, উগ্র মেজাজিনী নারীর অভাব ছিলো না (কোন কালেই নেই) কিন্তু তাদের তো কেউ কখনো 'পুরুষনারী' বা ম্যানলি নারী কিংবা পুরুষালী মেয়ে বলেনি। বড় জোর বলেছে থাণ্ডার দজ্জাল উগ্রচন্ডী। কাজেই এই বিদেশাগত নতুন বিশেষণটি তখনকার নরনারী অনেককেই একটু ভীত চিন্তিত করে তুলেছিলো।

তার আগে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে হয়। মেয়েরা পুরুষের করণীয় বহু কাজ করেছেন, করতে আরম্ভ করেছেন। বাধ্য হয়েছেন করতে। সে তো কমবেশী সব দেশেই বিপাকে পড়লে মেয়েরা সামর্থ্য অনুযায়ী করেই থাকেন। মোট বওয়া, মজুরী করা—বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীতে। সেকাজে তার ললিত কোমল দেহ বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেও 'ম্যানলি' হয় না। নানা ঝঞ্ঝাটে মুখের কোমলতা কমে যায়, তাই বলে কেউ কখনো তাদের পুরুষালী মেয়ে বলে না, বলেনি। তবু কিন্তু শুনে শুনে আমরাও ভেবেছি এবং অন্য অনেকেও হয়তো ভেবেছেন কিজন্য এই অনৈসর্গিক পরিবর্তন হবে। সত্য সত্যই হবে কিনা।

কিন্তু সেকাল একালের দ্বন্দ্ব তো চিরকালই আছে। তাই সেই সুযোগের সূত্র ধরে কেউ কেউ বললেন, এই সব একেলে শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্য, পড়াশুনা, খেলাধুলা, বহিরমুখো মন এই সবই নারীকে 'পুরুষোচিত নারী' বানিয়ে দেবে ক্রমশঃ। অর্থাৎ হয়ত নারী শরীরে পুরুষোচিত কাঠিন্য দেখা দেবে। নারী মনে পুরুষালী ধরনের ভাবধারা সঞ্চারিত হবে এবং না জানি আরো কি বৈলক্ষণ নিয়ে কি অপূর্ব আকারে প্রকারে সেই নারীর আবির্ভাব হবে। এই অদ্ভুত ঝাপসা ভাবের কল্পনা কৌতুকময় কৌতুহলও কম ছিলো না মানুষের।

তবু মনে মনে কেউ কেউ ভাবে পুরাণের চিত্রাঙ্গদার রাজপুত্রোচিত শিক্ষাদীক্ষার কথা। বীরনারী সুভদ্রা রুক্মিনীর কথা একালের রাজস্থানের কর্মদেবী দুর্গাবতী-দের কথা—চাঁদ সুলতানা, রিজিয়া বেগমের কাহিনী। ভাবি, তাঁরা 'ম্যানলি' ছিলেন কি? কেউ কি তা বলেছিলেন তাঁদের?

দেখতে দেখতে তারপর তিন চার দশক কেটে গেছে এবং সাধারণ মানুষ সমসারিক সব বুলির মতই সেই 'ম্যানলি নারীর' আগমনীর কথাও ভুলেই গেছে বোধহয় এবং সকলেই নির্বিবাদে মেয়েলী ধরনের খালি পা, সেকেলে আলতা সিঁদুর, কঙ্কন, কস্তাপেড়ে শাড়ীপরা বা-আধুনিক 'ঠোঁটে সিঁদুর', নখে রং, সূক্ষ্ম

পাড় শাড়ী, প্রায় শূধু হাত (নিরহংকার), উঁচু গোড়ালী জুতা পায় নারীদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছেন চিরকালের মতই। প্রেমে বিরহে মিলনে সংসারযাত্রায় ওতঃপ্রোতঃভাবেই।

আজকে সহসা নিজেদের মুখে নিজেদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল সেই 'ম্যানলি উওম্যান' কথাটা কোথায় গেল এবং সত্যই কি এদেশে ওদেশের জানা জগতে তারা একজনও আবির্ভূত হয়েছিলো কোনদিন ?

অথবা কিছুই হয়নি সেই বাক্যটির আবিষ্কারের ও পৃথিবীর যাবতীয় নবনারী সেকথা একেবারেই ভুলে গেছেন ?

মানুষ তার সুখদুঃখ সভ্যতা বর্বরতা স্বার্থপরতা মহানুভবতা ভালমন্দ মিশোনো মন স্বভাব গুণ নিয়ে চিরকালের মতই ৬০।৭০।৮০ বছরের জীবনযাত্রা নিয়ে একইভাবে চলেছে।

সেকালে যাদের রাক্ষস বলা হত সেই রাক্ষস বা রাবণ আছে মানুষের আকারেই। দুঃশাসনরাও আছে আমাদের কাছাকাছিই—কোনো বিপর্যয় বিপ্লব ঘটলেই তাদের বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। আবার যাঁদের দেবতা মহামানব বলা হতো তাঁদেরও সবকালের মতো এযুগেও দেখা যায়।

নারী চরিত্রেও তার ধর্ম কর্ম আশা আনন্দ স্নেহমোহ একই ভাবে আছে।

সীতা সতী সাবিত্রী দময়ন্তী কৌশল্যার মত নারীরা আছেন, রাজকন্যা রাজরাণী না হলেও গৃহস্থ ঘরেই তাঁদের পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর মত সন্তান স্বার্থের মোহে স্নেহান্ধ জননীরও অভাব হবে না, রাজ্য থাক বা না থাক।

স্বর্গের অপ্সরারাও আছেন নামে তারকা আকারে। তাঁদের রূপগুণমুগ্ধ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের মত মানুষেরও অভাব নেই। প্রাসাদে কুটিরে যেখানে খুঁজবেন। তপস্যা-ভ্রষ্ট মুনিঋষিদেরও পাওয়া যাবে।

আদর্শ নারী মহীয়সী নারী যাঁদের নাম আমরা পুরাণে ইতিহাসে দেখেছি তেমন নারী এযুগেও আছেন আগেই বলেছি। ধর্মের জগতে কর্মের জগতে পারিবারিক জগতে তাঁদের ছোট বড় কর্মক্ষেত্রের ধরিত্রীটুকু বাসুকীর মতই মাথায় করে নিয়ে কাজ করে চলেছেন নীরবে সঙ্গোপনে।

দেখতে পেয়েছি ত্যাগধর্মের জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সারদা দেবীকে যশোধরার মত। দেখেছি ধার্মিকা দানশীলা কর্তব্যপরায়ণা রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী অহল্যাবাঈকে। দেখেছি রাজরাণী ভগবৎ প্রেমে সর্বত্যাগিনী মীরাবাঈকে।

চরিত্র মহিমায় দেখেছি বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীকে। ভক্তিমতী রাণী রাসমণিকে দেখেছি।

আত্মপ্রচারহীন নীরব কর্মজগতে দেখেছি স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসকে

৺দেবেন্দ্র দাসের স্ত্রী)। লেডী বসু বা অবলা বসুকে। ৺সরলা রায়কে, মিসেস পি. কে. রায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে।

রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা গেছে সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে। বিপ্লবী নারীরূপে দেখা গেছে মাতঙ্গিনী হাজরা, ইন্দুমতী সিংহ, প্রীতি ওয়াদেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, শান্তি দাস, সুনীতিদের।

সাহিত্য ও কাব্যের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীকে। মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়কে এবং একালের আরো লেখিকাদের দেখা যাচ্ছে চারধারেই। কিন্তু নামাবলী রচনার আর কাজ নেই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের মনুষ্যচরিত্রের বিশেষ বদল হয় নি কথাটাই যে সত্য এই কথাই মনে হচ্ছে, এবং আমাদের মনে হয় উপরে বলা পৌরাণিক নারী পরবর্তীকালের নারী—ধার্মিকা নারী, বীরনারী, কর্মী নারী এবং অপ্সরা নারী ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যে যেখানেই থাকুন তাঁরা সকলেই একান্তভাবে ঘরোয়া ও ঘরমুখী মনের নারী। (অপ্সরা নারী ও মনের অতলমনের অতলে লুকোনো থাকে এক খালিঘরের নীড়ের মোহময় আকাঙ্ক্ষা। সেখানে প্রিয়জন থাকবে।) সকলেরই সাধারণতঃ অন্তরে জেগে থাকে তাঁদের স্বামীসন্তান এবং তাদের নিয়ে ছোটবড় নীড়টুকুর কথাই। গভীর মমতাস্নেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগেভরা সে নীড়।

আদি জননী অদিতি, আদি নারী ইভ যীশুমাতা মেরীর মতই, জননীর মমতা শঙ্কা তাদের বুকে। তেজস্বিতা সাবিত্রী, অভিমানিনী সতী, চিরদুঃখিনী সীতা, পতিপ্রাণা ঊর্মিলা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদা দেবীর মতই প্রেমের আদর্শে নিষ্ঠায় ভরা তাঁদের হৃদয়। এককথায় সাধারণ অসাধারণ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত নিরক্ষর সব নারীর মনই মূলতঃ এক সুরে বাঁধা। তারতম্য বা ব্যতিক্রম থাকতে পারে কোথাও কিন্তু সেটা ব্যক্তিচরিত্র।

এখন আধুনিক আর সেকেলে ধরনের নারীর কথা বলি। এই চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে শিক্ষায় আধুনিকতায় আমরা হাজারে একটি পরিবারও পাব না যারা আধুনিক ধরনের জীবনধারা নিয়েছে। কজন বা তাদের মাঝে আধুনিক? আমাদের দেশে দেশবিভাগের পর পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে। গ্রামের নারী এখনো সেকেলে ধরনে বা চিরকালের ভাবেই জীবন যাপন করেন যাঁদের মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিন্দুর, পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা, কাঁখে সন্তান।

সহরে যেকটি শিক্ষিত স্বচ্ছল অবস্থার পরিবার আছেন তাঁদের বেশভূষা আচার ব্যবহারে একটু বিদেশী ছাপ হয়ত দেখা দিয়েছে কিন্তু সাধারণ কোটি কোটি মেয়ে এখনো নতুন সভ্যতার ধরন আর্থিক চাপ মনের সংস্কার অথবা অতি আধুনিক শিক্ষার অভাবে যে জন্যই হোক নিতে পারেন নি।

ছোট ছোট বা বড় ছোট ভাগে ভাগে খণ্ড খণ্ড সে জীবনযাত্রা আমরা মধ্য-

বিত্ত সমাজে দেখি তাতে এখনো মেয়েরা রান্নাঘরে সেকেলে ধরনের উনানেই রান্না-বাড়া করেন দেখা যায়। পিঁড়ি বা আসন পেতে থালা-বাটি সাজিয়ে খেতে দেন স্বজনদের। স্নানাহ্নিক না করে রান্নাঘরে ঢোকেন না। জল খান না। এঁটো-কাঁটার আমিষ-নিরামিষের বাছবিচার মেনে চলেন। রান্নাখাওয়ার ধরন চিরাচরিত প্রথামত ডালচচ্চড়ি ভাজা অম্ল একটু মাছ। নয়ত বিশেষ দিনে ঘণ্ট সুক্ত বড়ি বড়া এই তাঁদের রান্নার মেনু বা তালিকা। সমস্ত সমাজ ভরে স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের এই একই ধারায় রান্নাখাওয়া ও অন্য কাজ।

ঘরদুয়ার আজকাল দিনের ছোট ছোট ফ্ল্যাট বাড়ীতে খুব কম গৃহিণী সাজাতে গোছাতে পারেন। তাদের প্রয়োজনমত থাকার বসার পড়ার জায়গাই হয়ত মেলে না।

এই আমাদের সেকেলে ঘরে 'হিটার' নেই. 'ফ্রিজিডেয়ার' নেই, বাসন মাজার জন্য মেসিন নেই বা 'ভিম' নেই। আধুনিক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের কোন উপকরণই তাঁদের নেই।

একটি সেমিজ বা সায়া জামা শাড়ী তাঁদের আবরণ, এবং চারগাছা চুড়ী হার আর 'লোহা' শাঁখাই তাঁদের আভরণ। লেখাপড়া যাঁরা জানেন তাঁরা পেলে বইটই পড়েন। হয়ত স্থানীয় লাইব্রেরীর মেম্বারও হন। কিন্তু সাধারণতঃ পড়াশোনার অভ্যাস খুব কম বাড়ীতেই থাকে। এঁদের অবসর বিনোদন সিনেমা দেখাই বেশী, তাও কম বয়সের মেয়েদেরই। বেড়ানো বা দেখাসাক্ষাৎ অথবা সভা সমিতিতে যাওয়াও এদের খুব কমই ঘটে ওঠে।

সখের মধ্যে অনেকের খুব সেলাই বোনার এবং গানের সখ আছে। এটা হল আমাদের সেকেলে ধরনের মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা। সাধারণতঃ শান্ত কর্মিষ্ঠা ভদ্র মধুর প্রকৃতির এঁরা। মিষ্টহাসিনী মিষ্টভাষিণীও বলতে পারি। স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজটিকে এঁরাই বাসুকীর মত পরম সম্ভ্রম ধৈর্যে মাথায় করে রাখেন। সুখদুঃখে দুর্যোগের দিনে, উৎসবের দিনেও। যে কোন উৎসব বাড়ী বা লোকের বাড়ীতে 'বিচিত্রবেশিনী' নারী—নারীর মধ্যেও ঐ একই ভাব দেখা যাবে। কবির ভাষায় একই নারী বিচিত্র বেশে থেকে থেকে উঁকি দিয়ে যান, এবং ধর্মকর্ম জগতে তাঁরা কোনদিনই 'ম্যানলি' প্রতিভায় দীপ্ত হয়ে বিরাট মহামানবী আকারেও আজ অবধি আসেননি। সাহিত্য জগতেও চিরকালের মতই অপ্রতিভ হয়েই একপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন নিজেদের স্বল্প ও তুচ্ছ সৃষ্টিগুলি নিয়ে।

এককথায় ত্রিবেদী মহাশয়ের মন্তব্যই সত্য—'মনুষ্য চরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই…।' সুতরাং আমরা মেয়েরাও যা ছিলাম তাই আছি। যেখানে ছিলাম সেই পৃথিবীভরা ঘরসংসারের ছোট ছোট নীড়গুলিতে নিজেদের সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি কাজের প্রচেষ্টা নিয়ে এক রকমই আছি এবং চারদিকে চেয়েও দেখছি অনাদি কাল থেকেই একভাবেই দিন কাটছে। একাল আর সেকালে ব্যবধান প্রত্যেকটি মানুষের যৌবন থেকে বার্ধক্যকাল মাত্র।

স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের অধিকার

পৃথিবীর বয়স হ'ল অনেক। মানুষের তৈরী সভ্যতারও বয়স কম হ'ল না। অন্য দেশের সভ্যতার কথা ছেড়ে দিই, আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতার কত হাজার বছর বয়স তাও ঠিক করে বলা শক্ত। কেন না, পুরাণ মহাভারত পড়লেও দেখি যে, তাতে অনেক সময় অনেকে বলেছেন, পুরাকালে এই রাজার সময়ে এই প্রথার উদ্ভব হয়; এই মুনি এই কথা বলেন; এই ঋষি এই বলছিলেন ইত্যাদি। তাতে মনে হয় আমাদের এই ভারতবর্ষের সভ্যতাও যেন অজানা কাল থেকেই চলে আসছে।

এই সব শাস্ত্র-অনুশাসন ও বহু যুগের সমাজের ধর্মের ইতিহাস ভারতবর্ষের মানুষের শ্রুতি স্মৃতি ও পুঁথিতে ছিল। অর্থাৎ, মানুষ কানে শুনে মনে রেখেছিল, পুঁথিতে লিখে রেখেছিল। এই অনুশাসন ও নীতি যুগে যুগে বদলেছে এবং সমাজও চলার পথে পথে নতুন নতুন মত ও আচার-ব্যবহারকে সাথী করে নিয়েছে। এখনো সেইভাবেই তার গতিধারা চলেছে, কখনো গ্রহণ কখনো বর্জন করে। কিন্তু আমরা ভাল করে একটু ভাবলেই দেখতে পাব তার মূল কাঠামোটা প্রায় ঠিকই আছে। অর্থাৎ খুঁটিয়ে দেখলে জগতের অন্য অনেক সভ্যতার মতই এই সভ্যতা এবং সমাজ যদিও গড়ে উঠেছে পুরুষ এবং নারী উভয়কে নিয়েই, কিন্তু তাতে পুরুষই শাসক অনুশাসক, নীতিকার, সমাজপতি, পরিবারের গোত্রের প্রভু, যা বলা যায়—যে সংজ্ঞা দেওয়া যায়, সব।

আজো নানা শাস্ত্র সংহিতাকারের বহু বিধিনিষেধের ধারার সঙ্গে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ বিধান—পিতা কৌমারে, ভর্তা যৌবনে এবং পুত্র বার্ধক্যে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, ব্যবস্থা শেষে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এই শ্লোকটিই যে-কোনো অধিকারের দাবীর বিপক্ষে প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সেই সেকাল থেকে আজো মেয়েরা 'মানুষ' নন, মেয়েমানুষ। সোজা কথায় পুরুষদের সম্পত্তি, দায় এবং ভার; ঘটীবাটির মত যাকে দান করা, ত্যাগ করা যায়, বহন করতে হয়! মানুষ মনে করে তাদের কোনো মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়নি, হয়ত দাবীও মেনে নেওয়া হয়নি। আশ্চর্য এই যে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবেও এই সব বিধিনিষেধ মেয়েরা চিরদিন মেনে এসেছেন এখনো মেনে চলেছেন।

তবু মাঝে মাঝে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, সমাজের রীতিনীতির অদলবদল হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোনো মেয়ের ইচ্ছায় তা হয় নি—তাও পুরুষই করেছেন। বাংলাদেশে যেমন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি প্রায় চারশো

বছর আগে এক শ্রেণীহীন বৈষ্ণব সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। যার গোড়ার কথা একেবারে আমূল পৃথক, পুরানো সমাজ থেকে। যে-সমাজে জাত নেই। তারা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব মানুষের জাত শ্রেণী নেই। মেয়েরা 'মেয়ে মানুষ' নয়, তারা বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবের মতই সমান তার সামাজিক অধিকার, পূজা, অর্চনা, ধর্মকর্ম, বিগ্রহ-সেবায়। এ সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ছিল। বিধবা-বিবাহেরও প্রচলন হয়েছিল। যদিও উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সব সংস্কার চলেনি। তবু সমাজের এক অংশে এই বৈষ্ণব সমাজের—সাধুদের মত আজো জাত নেই, শ্রেণী নেই। তাঁরা কি জাত তা বলেন না, বলেন আমরা বৈষ্ণব। এতে দেখা গেল, সমাজে আরেকভাবে মানুষকে দেখা হচ্ছে, মেয়েদেরও।

এটা মুসলমান আমলের সংস্কার। উচ্চবর্ণেব মধ্যে এই ধর্ম চললেও, সমাজের রীতিনীতিতে উচ্চবর্ণের বৈষ্ণব সমাজের লোকেরা এই সব প্রথা গ্রহণ করেননি। ব্রাহ্মণ্য, সহমরণ, অনুমরণ, বৈধব্য-জীবনের কঠোরতা, কৃচ্ছ্রতার পূর্ণ প্রচলন ছিল।

এর পর ইংরাজ আমলে ১৭৭২ সালে এ যুগের অগ্রদূত মহাত্মা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। তাঁর সময়েই দেশ প্রথম দেখতে পেল, মেয়েরা শুধু সম্পত্তি জীববিশেষ নয়—মানুষ। সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার অন্যদিক যার সবটাই পতি-প্রীতি পতি-ভক্তি নয—অনেকটাই সমাজ-অনুমোদিত হত্যা বা সমাজ-প্ররোচিত আত্মহত্যা। স্বামীর মৃত্যুর পর তথাকথিত ধর্মের নির্দেশে, অভিভাবকদের নির্দেশে, লোকলজ্জা ভয়ে আত্মহত্যা বলা যেতে পারে। এই প্রথা ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে সর্বত্র ছিল। এছাড়া মেয়েদের প্রাণের মূল্য-হীনতার পরিচায়ক আর এক প্রথা ছিল। রাজপুতনায় শিশুকন্যা-হত্যা। কন্যার বিবাহে বরপক্ষের কাছে অপমানের ভয়ে রাজপুতদের মধ্যে এই প্রথা চলেছিল। এত কথা বলছি এই জন্য যে, সার কথায় মেয়েরা ছিলেন প্রাণের দিক থেকেও পুরুষ-অভিভাবকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত। তাই, কন্যা হলে তাকে পিতামাতা মারতে পারতেন, বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর সম্পত্তি। তার জীবন স্বামীর জন্য। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি নিষ্প্রয়োজন কিনা, সহমৃতা হবেন কিনা, তা তাঁর অভিভাবক বা পুত্রেরা ঠিক করতেন।

রামমোহন রায়ের আন্দোলনের পরে শুধু বেঁচে আছে বলেই বেঁচে থাকতে দেওয়ার আশ্চর্য অধিকার মেয়েদের দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ পুরুষ বিশেষের জন্য যে জীবন, সে জীবন রাখা বা না-রাখার ভার এতদিন পুরুষ-সমাজের হাতেই ছিল। বেঁচে থাকার এই জন্মগত অধিকার সেদিন মেয়েরা পাবার আগে পুরুষ-সমাজে যে বিরুদ্ধ-আন্দোলন হয়, তা আজকের দিনের হিন্দুকোড্ বিলের চেয়ে বেশী বই কম হয়নি তা জানা গিয়েছিল। কিন্তু, মেয়েরা কি ভেবেছিলেন বা

কি বলেছিলেন তা কেউ প্রকাশ করেননি। প্রকাশ না হলেও পরে দেখা গেল, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথাটিও লোকাচার মাত্র।

এই সময়েই রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-ধর্ম থেকে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠতে লাগল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও রাজপুরুষদের প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা তাদের ধর্মের প্রচার ও শিক্ষার প্রচারও হতে লাগল। এই সব নানা রকম প্রভাব প্রচারের মাঝে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে দাঁড়ালেন শিক্ষা জ্ঞান ও দয়ার সাগর হয়ে। এই এক শতাব্দীর মধ্যেই দুজন পুরুষ মানবিকতার দৃষ্টি দিয়ে করুণাভরে মেয়েদের দিকে তাকালেন। সমাজের অত্যাচারের অনাচারের বিরুদ্ধে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। বাঁচার অধিকারের পর, এ আরেক দৃষ্টিতে, আইনের দিক থেকে মানুষ বলে মেয়েদের গণ্য করা বিদ্যাসাগরের আগে আর কেউ করেননি।

একদিকে আইনের চোখেও আমাদের দুটি অধিকার করার দাবী জন্মাল। এর আগে অবধি আমরা সবসময়েই ব্যক্তিগতভাবে অধিকার পেয়েছি, ভোগ করেছি, এবং পাইনি বা বঞ্চিত হয়েছি।

এই অতি-পুরাতন কথা আবার বলার কারণ এই যে, আমরা তখন কত অসহায় ছিলাম এবং এখনো প্রতিদিনের কাজে জীবনে কত অসহায় আছি। জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি আমাদের পায়ের তলার মাটিটুকু, মাথার উপরে ছাতটি আর প্রতিদিনের মুষ্টিভিক্ষা বা আহার আচ্ছাদন—কে দেবেন আমরা কিছুই জানিনা, পিতা পতি পুত্র থাকতে। যাঁরা ভাবতে জানেন তাঁরাই আমার কথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই রাওবিল, দেশমুখবিল, হিন্দুকোডবিলের কথা উঠেছে আজ এই জন্যই, এই সব ভেবেই। এখানেও দেখা যাচ্ছে এই সব বিল মেয়েরা রচনা করেননি। অর্থাৎ, আমাদের হাতে আমাদের কিছুই নেই। সমাজপতি পুরুষের উদারতা বা সঙ্কীর্ণতা আমাদের চালনা করে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা ধর্মে কর্মে সুখে দুঃখে পুরুষদের সঙ্গে থাকি মাত্র। দুঃখে-দারিদ্র্যে দুঃখ বহন করি, ঐশ্বর্যে সুখ ভোগ করি, কিন্তু কোনো রকম কর্তৃত্ব আমাদের জীবনের কোনোও ক্ষেত্রেই নেই। কোনো বিধান বা নিয়ম আজ অবধি মেয়েরা রচনা করেননি। একটা কোনো তুচ্ছ বিধান ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতাও কখনো ছিল না।

কিন্তু, এই ভারতবর্ষেই হিন্দু সভ্যতার আর একদিক আছে, দক্ষিণভারতে। মনে হয় সেটা আর্য-সভ্যতা থেকে উদ্ভূত নয়—সেটা অতি পুরাতন দ্রাবিড় সভ্যতার অংশ। কেননা, কয়েক জায়গায় সে দেশে এখনো মাতৃতন্ত্র সমাজ আছে এবং কয়েকটি রাজ্যও মাতৃতন্ত্র হিসেবে এখনো চলে। মাতৃতন্ত্র মানে, যেখানে পিতার মত পরিবারে মা-ই সর্বময়ী কর্ত্রী। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মার বড় মেয়ে বা মেয়েরা। ওখানে পুরুষ উত্তরাধিকারী হন না, সেইজন্য মামার

ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করার একটা প্রথা আছে। পাছে বোনের সম্পত্তি বাইরে চলে যায়। যদিও দাক্ষিণাত্যে সব জাতে বা সব জায়গায় এ প্রথা নেই। মালাবারে আছে, ত্রিবন্দ্রমে আছে। ত্রিবন্দ্রম রাণী-পরম্পরা রাজ্য। বড় মেয়েই রাজ্যাধিকারিণী হ'ন। ছেলে নয়। ছেলে থাকলেও নয়। আয়ার ও নায়ার জাতিরাও এই নিয়ম এখনো মেনে চলেন।

আমার বলবার কথা হচ্ছে এই, এ থেকে বোঝা যাবে, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকলেও পরিবার পুরুষপরম্পরায় উত্তরাধিকারের মতই অভ্রান্ত নিয়মে চলে, কোনো বিপর্যয় বা অসুবিধা ঘটে না।

বরং বলতে পারি—মাদ্রাজিনী নারী, পারিবারিক জীবনে আমাদের দেশের মেয়েদের মত অন্নবস্ত্রের দায়ে লাঞ্ছিত হন না। নারীতন্ত্র-সমাজ পুরুষতন্ত্রের চেয়ে কম নিষ্ঠুর ও অনেক উদার।

এইসব দেশের কথা আপনারা বুঝে নিতে পারবেন. ভারতবর্ষের এক এক দেশে ; এক এক নিয়ম আছে। নানা সংহিতাকার নানা রকম মত দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ চলে লোকাচার অনুসারে। মাত্র দরকারের সময় মুনিদের মত লোকেরা তুলে দেয়।

আমিও আপনাদের জানা এবং শোনা দরকার বলে সেইসব পুরোনো মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য থেকে দু'একটি শ্লোক তুলে দিচ্ছি।

স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন—পুত্রকন্যাদের মধ্যে দায়াধিকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারে ধর্মতঃ কোনো ভেদাভেদ নেই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

"পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাপ্যংশং সমং হরেৎ
ব্যবহারাধ্যায় দায়বিভাগ প্রকর।" ৮।১১০

এখানে মাতার ছেলেদের সঙ্গে সমানাংশ দাবীর কথা মেনে নেওয়া হয়েছে।

পরাশরের বিখ্যাত শ্লোক—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।"

অর্থাৎ স্বামী সন্ন্যাসী হলে, ক্লীব হলে, পতিত হলে, অথবা মৃত্যু হলে, নষ্ট হলে, স্ত্রীলোক অন্য পতি গ্রহণ করতে পারবেন।

অবশ্য বিপক্ষ মতামতের শ্লোকও ঢের আছে।

কিন্তু নানা মুনির নানা মতের দেশে সংহিতায় লেখা বহু বিধান থাকলেও, কার্যতঃ উত্তরাধিকার ত দূরের কথা মেয়েরা কখনোই কোনো মৌলিক অধিকারও পাননি। এই সব শ্লোকও যেমন মনেই আছে, আমরাও চিরকাল একইভাবে আছি।

এই জন্যই রাষ্ট্রে আইন করে মানুষের মৌলিক অধিকার না পেলে মেয়েদের অবস্থার কোনোও পরিবর্তন আশা করা যায় না। মানুষের মৌলিক অধিকার আইনসঙ্গতভাবে পেলে বিধানসভায় পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে আমরা (মেয়েরা) প্রতিনিধি পাঠাতে পারব এবং বিধানরচনায়, যে বিধান মেয়ে পুরুষ উভয়ের জন্যই,

তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারব। আমাদের এই-অবস্থার গোড়ার কথাই এই, আমরা কখনো বলতে সাহস করিনি, কিংবা কোনোও বিধান ভাঙাগড়ার ইতিহাস জানতেও পারিনি।

এই কতকালের পুরোনো পৃথিবী আর হাজার হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতায় মেয়েরা যে একইভাবে বযে গেলেন সব দেশে সবকালে, ভেবে দেখলে এইটেই আশ্চর্য।

মাত্র ছয় বছর বয়সের স্বাধীন ভারতবর্ষে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের খানিকটা অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এইসব বিষয় ভালো করে তলিয়ে বুঝে দেখার জন্যই মেয়েদের কাছে আমাদের দেশের মেয়েদের আগেকার ও এখনকার অবস্থার কথা বললাম।

আমাদের ছয় বছরের স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন সংবিধানে মেয়েরা, আমরা কি কি অধিকার পেয়েছি সেই কথা আলোচনা করব।

(১) প্রাথমিক বা গোড়াব অধিকাব—বিধানতন্ত্র।

(২) সমানাধিকার।

রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের সম্মুখে অসমান অধিকার দেবেন না। নরনারী নির্বিশেষে যে কোনোও ভারতবাসী আইনের কাছে রক্ষা দাবী করতে পারবেন।

১৫। রাষ্ট্র—জাতি ধর্ম শ্রেণী, দেশ জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নরনারীকে ভোটের বিষয়ে সমান অধিকার দেবেন। কোনোও ভেদাভেদ থাকবে না। কিন্তু রাষ্ট্র শিশু ও নারীদের বিশেষ সুবিধাদান-অধিকার নিজের হাতে রাখলেন। এই খসড়ায় কোনো আর্টিকলই বিশেষ সুবিধার প্রয়োগ থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

১৬। কর্মক্ষেত্রে বা চাকুরীক্ষেত্রে নরনারী নির্বিশেষে সমান অধিকার থাকবে।

এখন আমি ১৪ উপধারার অধিকার আমরা মানুষ হিসেবে পেয়েছি তার কথা বলি। এতদিন পর্যন্ত আমরা রাষ্ট্রের চোখে কেবল মাত্র 'মেয়ে'ই ছিলাম, এখন 'মানুষ' বলে গণ্য হয়েছি। এই সমানাধিকার সমাজের কুব্যবস্থার অনেক প্রতিকার করতে পারবে যদি চেষ্টা করা হয়।

১৫ই উপধারার আমরা পাচ্ছি পৌর অধিকার। যাতে শাসন ও বিধানসভায় (অতীতকালের ভাষায় রাজসভায়) আমরা আমাদেরই প্রতিনিধি পাঠাতে পারব। এই প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারকেই ভোট দেবার অধিকার বলা হয় আপনারা নিশ্চয় জানেন। ভোট দেবার অধিকার থাকার জন্য—বিধানসভায় আমাদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষা করবেন এমন লোক আমরা নিজেরাই পছন্দ করে পাঠাতে পারব। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমরা ঘরে বসে থাকলে বা দূরে থাকলেও আমাদের প্রতিনিধিরাই আমাদের লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা রাজদ্বারে অর্থাৎ ঐ

সভায় জানাতে পারবেন। কোনো কিছু অন্যায় আইন পাশের ব্যবস্থা হলে প্রতিবাদ করতে পারবেন।

এই সম্পর্কে আপনাদের একটু পুরোনো কথা, বিলাতে মেয়েদের ভোটের অধিকারের কথা বলি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখনকার দিনে বিলাতে মেয়েদের ভোটের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন হয় সে আজ প্রায় ৪৪।৪৫ বছর আগের কথা। বাংলা ১৩১৪।১৫ সাল হবে। ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন অ্যাস্কুইথ্। আন্দোলনকারিণীদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন মিসেস প্যাঙ্ক্হার্স্ট। সঙ্গে আরো অনেক মেয়ে ছিলেন অবশ্য। জেলে যাওয়া থেকে অনশন করা, সভাসমিতিতে গোলমাল করা, দিকে দিকে তীব্র আন্দোলন করা—মেয়েরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন এই ভোটের অধিকারটুকু পাওয়ার জন্যে। কিন্তু কে বা কার কথা শোনে! তখন 'ভোট' যে কাকে বলে কিছু জানতামওনা, বুঝতামওনা; —তবু তীব্র আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম সংবাদপত্রে সেই আন্দোলনের কাহিনী। অধিকার তাঁরা কিছুতেই পেলেন না। পুরুষরা তো নির্বোধ নন্ যে, সভা-সমিতিতে উপদ্রব করলেই আর অনশন করলে বা জেল খাটলেই এত কালের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবেন? সে আন্দোলনে ইংলণ্ডের মেয়েরা কিছুই করতে পারলেন না।

তারপরে এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইংরেজী ১৯১৪ সালে। চার বছর ধরে যুদ্ধে প্রায় পুরুষ-শূন্য হয়ে গেল দেশ। দেশের অনেক কাজই পড়ল মেয়েদের ঘাড়ে। যে কাজ মেয়েরা কখনো করেননি—কলকারখানা যন্ত্রপাতির কাজ, ইঞ্জিনিয়ারের কাজ—একটু একটু করে শিখে নিয়ে করতে লাগলেন। এক কথায় বলা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মারা এবং মরা ছাড়া সামাজিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় প্রতিটি দুরূহ কাজেই মেয়েরা তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। কিন্তু তাতেই তাঁরা যে যুদ্ধের পরই সমাজে তাঁদের মানবিক দায়িত্বের অধিকার পেলেন তা নয়। বহু চেষ্টা ও আন্দোলনের পরে ১৯২৬ সালে তাঁরা পেয়েছিলেন ভোটের অধিকার।

পুরুষরা এতদিনে বোধ হয় মনে মনে স্বীকারও করলেন, যুদ্ধের সময় মেয়েদের কাজের ঋণ বা কৃতিত্বকে। কাজ করলেই তবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে এবং নৈপুণ্যশক্তিও আসে। ইংলণ্ডের মেয়েরা তাঁদের ভোটাধিকার যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করে নিয়েছেন বলা যায়।

আমেরিকাও অনেকদিন পরে মেয়েদের এই অধিকার দিয়েছে। ঐ সকল দেশের মেয়েদের স্বার্থত্যাগ, কর্মশক্তি এবং আন্দোলনই মেয়েদের ভোটাধিকার এনে দিয়েছে বলা চলে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা যে এই অধিকার পেয়েছি, এ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। এই অধিকারের দু'দিক আছে। প্রথম প্রতিনিধি নির্বাচন

করে পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের আছে—, দ্বিতীয় প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে। এরজন্য শিক্ষায় দীক্ষায় কৃতিত্বে চরিত্রে সকল দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করা দরকার; এটিও একটি মস্তবড় অধিকার—যা' এতকাল কখনও আমাদের ছিল না। যে অধিকার থেকে এখন মেয়েরা আমরা পুরুষদের সঙ্গে বিধান সভায় আইন ভাঙ্গা গড়ার ক্ষমতা পেয়েছি।

এব পরে ১৬ উপধারায় আমরা পেয়েছি কাজকর্মের ক্ষেত্রে বা চাকরীর ক্ষেত্রে সমান অধিকার—সমান বেতন, সমান পদ। যে-কোনও মেয়ে ইচ্ছা করলে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকরী পেতে পারেন। বেতনে বা পদে (কেবল মাত্র নারী বলে) পুরুষের সঙ্গে তারতম্য আর নেই। উপযুক্ত যোগ্যতাই বেতন এবং পদপ্রাপ্তির একমাত্র নির্ধারক স্থির হয়েছে।

এখন আমাদের ভাববার কথা এই যে, আমরা রাষ্ট্রে পূর্ণ মর্যাদায় অধিকার পেলেও সমাজে এখনও কোনও সহজ অধিকারও পাইনি। সমাজে সহজ অধিকার না থাকলে এই রাষ্ট্রীয় অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা কঠিন। আবার রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের এতখানিই শক্তি দিয়েছে যে আমরা যোগ্যতার সঙ্গে একে গ্রহণ করতে পারলে এই শক্তির সাহায্যেই আমরা আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারব। আজকে আমাদের সামনে কর্তব্য রয়েছে—রাষ্ট্রীয় অধিকারকে সার্থক করে তোলে এবং সামাজিক অধিকারগুলি অর্জন করা। স্বাধীন ভারতবর্ষে সুস্থ বলিষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অবহিত না হলে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শের ভারত গড়ে উঠবে কি ?

ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৬১

নারীর ইতিহাস (১)

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "বাঙালীর ইতিহাস নাই"। বলেছিলেন, "কে লিখিবে?—তুমি লিখিবে। আমি লিখিব। সকলে লিখিবেন।"

আমরা একালে মনে মনে ভাবছি যেন নারীর কোনো ইতিহাস নেই। মানব-জাতির অর্ধেক হলে কি হয় তার সুখ-দুঃখের—মর্মের বেদনার, আনন্দের, সামাজিক ভাল-মন্দ বিচারের কোনো ইতিহাসই তাদের নিজের মুখে বলা বা লেখা নেই। পুরুষের পরিপূরক ভাবেই তার কর্মজগৎ, ধর্মজগৎ, তার প্রেমের জগৎ তার ত্যাগ ও দায়িত্বকে দেখা হয়েছে। পুরুষই দেখেছেন তাঁর দৃষ্টি দিয়ে। চিরকাল বলেছেন তাঁর মনের কথা তাঁর নিজের ভাষা দিয়ে। কর্মজগৎ আদর্শ জগতও রচনা করে দিয়েছেন হয়ত নিজেদের সুবিধাবাদের বিধিনিষেধ দিয়েই। কিসে তার সুখ, কিসে তার দুঃখ, সে কথাও তাঁরাই নিজের ভাষায় বলে দিয়েছেন। চিরকালের ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন লেখা হয়েছে।

কিন্তু সতিই কি তাতে তাঁদের মনের আর জীবনের কথা সব বলা হয়ে গেছে এবং যা বলা হয়েছে তাকি সব সত্য? নারী কোনোদিন তার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো একটি কথাও বলেছিল? না। তাঁরা কোনোদিনই প্রতিবাদও করেন নি। অনুমোদনও করেন নি। বিরুদ্ধেও বলেন নি। ভালও বলেন নি। সমগ্র পুরুষসমাজ ধরে নিয়েছেন তাহলে মেয়েরা তাঁরা যা বলেন ঠিক সেই রকমই।

তাতে আছে তাঁর প্রেমের, আত্মত্যাগের, আত্মবিলুপ্তির সার্থক এবং অসার্থক কাহিনী। আছে, নিজেদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার কথাও। আছে, অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী, মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যার কাহিনী (সত্য বা শ্লেষব্যঞ্জক তাও জানা নেই তাদের)। আছে সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, শৈব্যাদের কাহিনী পুরাণে ও ইতিহাসে এক সঙ্গেই। আছে: উর্বশী, মেনকা, রম্ভা অপ্সরাদের নিয়েও সমগ্র ভাবেই নারী স্বভাবের বিষয়ে মন্তব্য। আছে উপেক্ষিতা স্বজন-পরিত্যক্তা অম্বার চিতারোহণ।

মধ্যযুগে আছে পদ্মিনীর অপমানভয়ে জহরব্রত। কৃষ্ণকুমারীর হত্যা পিতা ভ্রাতার নির্দেশে। আছে সহমরণ। অনুমরণ। অনুমরণ হ'ল স্বামীর মৃত্যু শ্রবণে একা চিতারোহণ। আছে লাঞ্ছিতা পতিতাদের—বিপথগামিনীদের ইতিহাস।

কিন্তু এ সবই পুরুষের লেখনীতে লেখা। তাঁদের মুখেই শোনা। তাঁদের বিচারের দৃষ্টিতে দেখা সমগ্র নারীসমাজের ইতিহাস।

কিন্তু মেয়েদের নিজের অনুভূতিতে নিজের কথা বলা, নিজের ভোগ-করা দুঃখ-সুখ, অপমান-বেদনার গ্লানির ভাষা এতে কেউ কখনো খুঁজে পাবেন না। মেয়েরা নিজের ইতিহাসে চির নীরব, মূক।

লেখাপড়া জানতেন না? হতে পারে। কিন্তু পুরুষ নিরক্ষর হলেও তো তাঁর বক্তব্য তিনি বলেন গানে, কাব্যে, ভাষায়। কিন্তু লেখাপড়া জানতেনও তো অনেকে। তবু কেন এই মৌনতা, পরাধীনতা? অন্নদাস জীবন? হতে পারে। কিন্তু তাই বা কেন? পুরুষ সমাজ তো নারীদের দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছেন —সতী ও অসতী। সতী আর অপ্সরা। দু' শ্রেণীর এক শ্রেণী তো স্বাধীন। এবং বিদগ্ধও তাঁরা ছিলেন অনেকেই।

তবু আজো মেয়েরা নিজের কথা নিজেরা বলতে পারেন না কেন? কোনো দেশেই মনের কথার অনুভূতি নেই? মননশক্তি নেই মানবীর?

সতী নারীরাও তো সৎবস্তু উপলব্ধির কথা বলতে পারতেন। দু'একজন যে পুরাণে বলেন নি তাও নয়। অনসূয়া, মদালসা, চূড়ালা, মৈত্রেয়ী, গার্গী যাঁরা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন।

কিন্তু দেখা যাবে মেয়েদের সাধারণ ইতিহাস শুধু সতী আর অপ্সরারই ইতিহাস। সৎ আর অসৎ নারী। পুরুষের ও সমাজের নির্দেশে যারা সৎ বা অসৎ জীবন যাপন করে। যে সৎ বা সতীজীবনে মাত্র দুটি সম্পর্ক আছে পত্নী ও জননী। কিন্তু সে সম্পর্কেও পত্নীরই ঠিক ঠিক একটা স্থান আছে। যা থেকে প্রথমে সে স্ত্রী ও পরে জননী হবে। অসৎ বা অসতী জীবনে তারা ওই ওদের পুরুষদেরই ভোগ্যবস্তু চিরকাল ধরে।

কিন্তু তারপর? যখন আর জৈবজীবন জননীজীবন থাকবে না মানবীদের? তখন?

তখন সে একটি নিষ্প্রয়োজন অস্তিত্ব জীব। করুণার পাত্রী এবং অবজ্ঞার পাত্রীও বটে পরোক্ষভাবে।

সে জীবনেও তো দুঃখ, অপমান, উপেক্ষা আছে। আনন্দের জগতের মোহ আছে। কিন্তু তাঁর মানবিক চিন্তার মননে তার প্রকাশ নেই কোনোখানে কেন?

কাজেই দেখা যাচ্ছে নারীর ইতিহাস বলে কিছু নেই—নিজের ভাষায় বলা বা লেখা। যা আছে তা হচ্ছে তার জৈবজীবন ও সেই জৈব প্রয়োজনের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস। কিন্তু জীবধর্ম তো মানবধর্ম নয়। মানুষ মানব-জৈব-জীবনকে ক্ষণে ক্ষণে অতিক্রম করে যায় কাব্যে, কাহিনীতে, শিল্পে, কলায় ধর্ম-কর্মের আনন্দময় এক মননজগতে।

মানবীয় ইতিহাসে নারীর ইতিহাসে, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের ইতিহাসে কিন্তু কোথাও সে ইতিহাস নেই। মানবীয় মননশীলতার প্রকাশ নেই। মানবী মানবের মত সাহিত্যে বা ধর্মে শিল্পে বিরাট মহৎ কিছু সৃষ্টিও করেনি। বিরাট মহৎ হতেও পারে নি, বিশেষ হয়েছে কদাচ কখনো। যেমন মৈত্রেয়ী, গার্গী, মীরা, মদালসা, ম্যাডাম কুরী, নিবেদিতা, আঙ্কল্ টমস্ কেবিনের লেখিকা।

কেন এমন হ'ল? এর কারণ আছে নিশ্চয়। কেন আমবা নিজেদের কথা নিজেরা বলতে পারলুম না?

কোন্‌খানে কোথায় আমাদের হাতে রচিত কোন্ শিল্পকলা আছে? কোথায় কোন্‌খানে কোন্ সাহিত্যে আমাদের সূক্ষ্ম মনের মননশীল অনুভূতি আনন্দ বেদনাময় তুচ্ছ মহৎ সুখ-দুঃখের বাণীময় সাহিত্য, কাব্যকথা আছে? পুরুষের মুখেই সে সাহিত্য যুগযুগান্তর ধরে পুরুষের হাতেই রচিত হ'ল, কথিত হ'ল, পুরুষের মুখেই জনসমাজ নরনারী নির্বিশেষে শুনল বেদনায়, আনন্দে অভিভূত হয়ে উদ্বেলিত হয়ে। যে অমর সাহিত্যরস নারীব চিত্ত ও মন ভুলিয়েছে, সে সাহিত্যরস কিন্তু তাঁরা কেউ সৃজন করতে পারেন নি।

যে শিল্পকলা, ভাস্কর্য পৃথিবীর দিকে দিকে যুগযুগান্তর ধরে ছড়ানো আছে সেই সৃজনের আনন্দলোকেও মেয়েদের কোনো দান বা সৃষ্টি নেই।

এই না থাকার কারণ আমাদের খুঁজে দেখার সময় এসেছে। নইলে আমাদের এই সাহিত্য-সাধনার প্রয়াস নিষ্ফল। ব্যর্থ। বৃথা কাজ। পণ্ডশ্রম বললেও বেশী বলা হবে না।

যদি মহৎ কিছু সৃষ্টিই না করলেন তাঁরা তাহলে পুরুষের কলমের রেখার ওপর দাগা বুলিয়ে সাহিত্য শিল্প রচনা করে শিশুর মতন স্বতৃপ্ত থাকায় আমাদের মন ভরবে কি? ভরছে কি? না। ভরছে না। সমসাময়িক খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা হয়ত পান তাঁবা, কিন্তু তা চিরকালের বস্তু নয়। মহৎ বা বিরাটও কিছু নয়।

বেশ কয়েক বছর আগে 'দেশ' পত্রিকায় যখন শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের লেখা 'ঝাঁসীর রাণী' বেরুচ্ছিল, তখন অনেক পুরুষ ও নারী সেটা মুগ্ধমনে পড়েছিলেন। লেখিকার লেখার উপর আকৃষ্টও হয়েছিলেন।

আমাদের অনেকের মনে হয়েছিল গতানুগতিক কবিতা, উপন্যাস জগৎ ছাড়া যে সাহিত্যে আরও 'দিক' ও 'লোক' আছে তার সন্ধান তাহলে মেয়েরাও পাচ্ছেন। বেশ একটু গবেষণার দিক তো! কিন্তু কার কোনো ঐতিহাসিক রচনা আমরা লেখিকার কাছে পেলাম না। আর একদিন এক খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী এবং লেখিকার সঙ্গে কিছু আলোচনা হচ্ছিল। তাঁর হাতের আঁকা অনেক

ছবি আছে। কিছু জায়গায় সেগুলি পুরস্কৃতও হয়েছে। কিছু মূর্তিও তিনি গড়েছেন। অন্যান্য নানা শিল্পেও পারদর্শিনী। সাহিত্যে ও শিশু-সাহিত্যেও খ্যাতিনাম আছে।

আমার আলোচ্য বিষয় ছিল যে, পুরুষ-শিল্পী অনায়াসে নরনারী নির্বিশেষে চিত্রকর। চিত্রের ছবির উপাদানে তাঁর নর বা নারীদেহের সম্বন্ধে কোনো ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। তিনি যখন ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন তখন তিনি জগৎ-প্রকৃতি জীব জন্তু পাখী সাপ নর নারী দেব দেবী খেচর ভূচর জলচর পশু প্রাণী বা গাছপালা বিশেষ করে কিছুই দেখেন না।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত শুধু তাঁর চিত্রকলাটিরই, ছবিখানিরই কথা, সার্থক শিল্প-সংস্থানের কথাই ভাবেন। নারীদেহ যখন আঁকেন বা গড়েন, কিংবা কোনো নারীকে মডেলরূপিণী করে আঁকতে বা গড়তে বসেন, তিনি একেবারে নৈর্ব্যক্তিক জগতের মানুষ হয়ে যান। সে রমণী বৃদ্ধা বা যুবতী কি বালিকা কি নারী রূপবতী কি জরতী সে কথা তাঁর শিল্পী অন্তর ভাবে না। শিল্পীর চোখ দেখে না। তিনি তখন শুধু আপনার সৃজন-জগতের কোনো বিষয়ের একজন স্রষ্টা। যেখানে দেশ কাল রূপ শরীর ইন্দ্রীয়বোধ থাকে না। তিনি স্রষ্টা।

বলেছিলাম, আপনারা মেয়েরা কেউ আজ অবধি কোনো পুরুষ-চিত্র নরদেহ-চিত্র ঐরকম ভাবে এঁকেছেন কি?

তিনি চুপ করে রইলেন।

বললাম, এমন কি নারীদেহ-চিত্রও আঁকতে পারেন নি কোনো নারী-শিল্পী পুরুষের মত শিল্পীর দৃষ্টিতে। মূর্তিও না। অন্ততঃ আমার তো জানা নেই।

সাহিত্যজগতেও ঠিক তাই। পুরাণ থেকে একাল অবধি মহাকবিদের রচিত কাব্য-কাহিনীতে, সাহিত্যে কত রকমের নারীচরিত্রই না আমরা পেলাম দেশে-বিদেশে এবং সেই সবে সতীচিত্রের, মহৎ নারীচিত্রে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেছিল।

তারপর দেখি আমরা এলোপাথাড়ি, রাশি রাশি সেই সীতা-সাবিত্রী-সতী-শকুন্তলা-দময়ন্তীদের নকল করে চলেছি। 'দাগা' বুলিয়েছি আমাদের লেখা সাহিত্যে। সূর্যমুখী-ভ্রমর-আয়েষা-তিলোত্তমার গায়ে 'দাগা' বুলিয়েছি। শ্রী, জয়ন্তীরাও বাদ যান নি। চোখের বালি, চরিত্রহীনের লেখকদের ভালো মেয়েরাও আছেন। কিন্তু মহাকবির সৃষ্ট অহল্যা? উর্বশী? মেনকা—শ্রীরাধা? চিরন্তনী পর-কীয়া স্বকীয়া নারীরা? একালের রোহিণী, শৈবলিনী, স্বপ্নময়ী লবঙ্গলতারা? পিয়ারী বিবি, অভয়া, অচলা, বিনোদিনীদের গায়ে 'দাগা' বুলিয়েছি কি? পেরেছি কি? না পারি নি। কোন্ মনস্তত্ত্ব আমাদের সেখানে বাধা দিল?

এক কথায় নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি আমাদের সৃষ্টজগতে আমরা করতে পারি নি।

সৃজনজগতে আমরা নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে যেতে পারি না। যেতে জানি না।

নিশ্চয়ই নারী স্বভাবেই তাঁর মননধর্মেই সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গীতেই এমন কিছু আছে যাতে তাঁদের কোনো শিল্প সৃষ্টিই নিজেকে অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে সার্থক বা মহৎ অথবা আশ্চর্য বিস্ময়জনক কিছু হয়ে ওঠে নি।

যে কোনোও সৃষ্টির গোড়ার কথা হল বিস্ময়। সে বিস্ময়, বিস্ময়ের মুগ্ধতা নারী লেখিকা বা শিল্পী কোনোখানেই সৃষ্টি করতে পারেন নি।

কিন্তু কেন যে পারেন নি—সেই মনস্তত্ত্বের দিকটাই এখনকার মেয়েদের খুঁজে দেখা দরকার। বারান্তরে সেটা আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

নারীর ইতিহাস (২)

॥ ১ ॥

"প্রবর্তক"-এর দু'বছর আগের '৭৪-এর পূজা সংখ্যা 'নারীর ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধের জের টেনে বলছি। কেন যে মেয়েরা পৃথিবীভরা মানুষের মননের জগতে সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পকলায়-ভাস্কর্যে হাতের কাজের মনের সৃষ্টির কোনো-খানেই নিজের একটা ছাপ রেখে যেতে পারলেন না, পারেন নি তা খুঁজতে গেলেও তার চরিত্রের মূল ভিত্তি ও মূল উপাদানটা কি তারই সন্ধান করতে হবে আগে।

যদিও মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যাঁরা অনেক কিছুই বলেছেন, দার্শনিক পণ্ডিতবর্গও যাঁরা ভালোমন্দ অনেক কথাই বলেছেন, এ দেশের মানুষ এবং অন্য দেশেরও সব পণ্ডিতরাও তাতে আছেন, তাঁরাও নারী-চরিত্রের ঐ মূল উপাদানটির কথাটি কোনোখানেই বলেন নি।

কিন্তু তার ওপরেই সমগ্র পৃথিবীর নারীর স্বভাব এবং চরিত্র দাঁড়িয়ে আছে এবং যেটি গীতায় বিভূতি যোগের একটি শ্লোকেই পাওয়া যাবে। যা হ'ল নারীতে ভগবানের বিভূতির কি কি গুণ কি দিয়ে প্রকাশ? 'ধৃতি মেধা ক্ষমা মতি' এবং 'কীর্তি শ্রী'-তে।

আমরা 'ধৈর্য ক্ষমা বুদ্ধি স্মৃতি' সবের ওপরে এবং সবের মূলেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ঐ একটি বিশেষ উপাদানকেই যার ওপর সমস্ত নারীচরিত্র দাঁড়িয়ে আছে। তা হচ্ছে ঐ 'শ্রী'। যার অধিষ্ঠান হ'ল 'হ্রী'-তে—লজ্জায়। ধৈর্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, মেধা নরনারী নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে: কিছু কম বেশীও হতে পারে। মমতা-করুণার সম্পর্কেও তাই বলা যায়। কিন্তু যাকে শ্রী এবং কীর্তি বলেছেন গীতাকার সেইটেই স্ত্রী-স্বভাবের মূল বিশেষত্ব। বলতে পারেন কেউ কেউ পুরুষদেরও লজ্জা সঙ্কোচ আছে দেখা যায়। হ্যাঁ। তা আছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির মত সেটা বদ্ধমূল স্বভাবও নয়, সংস্কারও নয়। পুরুষদের ঐ গুণটিকে পৌরুষযুক্ত সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ বলা যায়—নারীর পক্ষে যেটা আদি সত্তা। জীবনের মূল ভাব দৈহিক সংস্কারের মতই।

বহুদিন পূর্বে কোথায় পড়েছিলাম, এক সময়ে উওরোপে কোথাও মেয়েদের আত্মহত্যা করার একটা প্রবল ঝোঁক প্রবাহ আসে। তাতে নাকি সেদেশের সরকার আশ্চর্য একটি মানসিক কঠোর শাস্তির প্রস্তাব আনেন। তা হ'ল আত্মহত্যাকারিণী-দের বিবসন শবদেহ প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হবে; এবং আশ্চর্য,

আত্মহত্যার হার নাকি কমে গেল সত্যই তাতে এবং সেদিন আমাদের যেন মনে হয়েছিল সেটা খুব স্বাভাবিকই মনোভাব মেয়েদের পক্ষে। মনে হয়েছিল 'লজ্জা সম্ভ্রম বোধ' যে কত দৃঢ়মূল অথবা দেহেরই মত সত্য বস্তু যেন তাদের অস্তিত্বে—যে দেহবোধের লজ্জাকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না তাঁরা মৃত্যুর পরেও।

যদিও সংহিতা-শাস্ত্রকারদের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী উক্তির অভাব নেই। সেটা সকল দেশের পুরাণে শাস্ত্রের বাণীতে সংহিতার বিধিনিষেধেও দেখা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে লোকশাস্ত্রে প্রবচনে প্রবাদ বাক্যে ও তার নানারূপ নানা নির্দেশ আদেশ এবং বাক্যসমষ্টি। 'দীঘল ঘোমটা নারী' 'লেকা আজল ঝলসা কাজল' 'ঘোমটার ভেতর খেমটা' যদিও এগুলি বিপরীত স্বভাবের মেয়েদের চরিত্রের ওপর ইঙ্গিত (যদিও সে নারী স্বভাবেও লজ্জা ক্ষমা মমতা সহিষ্ণুতা আছে) তবুও মূলে নারীচরিত্র কিন্তু শাস্ত্র-সংহিতাকারের ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনায় তার মূল চরিত্রই ব্যক্ত হচ্ছে এবং মূল স্বভাবই প্রকাশ করছে। যা হ'ল ধৃতি, শ্রী, ক্ষমা, মতি: ধৈর্য (সংযম), শ্রী (সঙ্কোচ), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা ও করুণা) যা জননী পৃথিবীর মতই ধারিণী শক্তি। যা না হলে মানুষ পায়ের তলায় মাটি পেত না দাঁড়াবার জন্য। শাস্ত্রকাররা তাই হৈমবতী দুর্গাতে মহা-শক্তির নানা ভাবের প্রকাশ, চণ্ডীতে উগ্র ভাবের প্রকাশ, সরস্বতীতে আশ্চর্য নির্মল প্রশান্ত জ্ঞানের প্রকাশ, লক্ষ্মীতে গৃহধর্মের হ্রী, শ্রী, শোভা, কল্যাণের, সংযমের, মিতাচারের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন ও দেখিয়েছেন।

॥ ২ ॥

তবু সমস্যা জাগে, প্রশ্ন জাগে মনে, মেয়েরা কেন সেই প্রকাশ করতে বলতে আলোচনা করতে কখনো পারেন নি। কখনো করেন নি।

আমাদের কাছে তার একটিমাত্র উত্তর মনে উঁকি দেয়, বিশেষ প্রতিভা না থাকলে নিজেকে এবং অপরকে সব সময় স্পষ্ট করে দেখতে পায় না। হয়ত দেখতে পেলেও সাক্ষীভাবে দর্শকভাবে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। নিজের সংস্কার, সমাজের পরিবেশের সংস্কার, নিজের গুণাগুণের বিষয়ে ব্যক্তিগত অহংকার, মূঢ়তা, দর্প এবং লজ্জা-সঙ্কোচও সেই দেখাকে আবৃত করে। আমাকে 'আমি' যে চোখে দেখতে পাই, দেখি, দৃষ্টিতে তো অন্যেরা দেখেন না। অন্যের চোখে মানুষ অন্য রকম প্রতিভাত হতে পারে। তাই স্বাভাবিক। আমার মনের 'আমি'কে আমি কাল্পনিক আদর্শের রং দিয়ে সাজিয়ে ভালো চোখেই দেখি। এইটাই মানুষের স্বভাব। এ ক্ষেত্রেও মেয়েরা নিজেদের স্বভাব নিজেরা দেখতে পান নি। ভালো ভাবেও না। মন্দভাবেও নয় এবং তারও মূলে কারণ হ'ল লজ্জা, সঙ্কোচ, আত্মপ্রকাশ ও প্রচারে। নারীস্বভাবের যা বিশেষত্ব ঐ লজ্জার জন্য বিশেষভাবে তাঁরা আত্মসচেতন। তাতেই মোটামুটি মনে হয়, না

জেনে যে সৃষ্টি হয় সেইটেই তো সৃষ্টি বা সত্য সৃজন এবং আশ্চর্য সৃষ্টি। সফল সৃষ্টির বিস্ময় তো তাই। জেনে কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির প্রেরণা অবচেতন মনের জগতের বস্তু। যে মন অন্তর নিজেকে জানে না। তাই পুরুষ স্রষ্টার দৃষ্টিতেই নারী-চরিত্রের মহিমা, শক্তি, রূপ ও ক্ষমতাও যেমন ধরা পড়েছে, ফুটে উঠেছে, তেমনি দুর্বলতা, অক্ষমতা, ক্ষুদ্রতার ত্রুটিও প্রতিভাত হয়েছে। সব মহৎ সৃষ্টিই অন্তরের প্রেরণা থেকেই হয়েছে। হিসাব করে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে যা সৃজন করা যায় না। তাই নারীর লজ্জা-সচেতন লেখনী ও আত্মসচেতনতা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। দেখতেই পায় নি। পুরুষ কথাকার স্রষ্টাই তাকে দেখেছেন।

যদিও মনে হয়েছে বলতে পারি তাও সব ধরা পড়ে নি। সব দেখতে পান নি পুরুষেও অপূর্ব নারীচরিত্রস্রষ্টা এবং চরিত্রদ্রষ্টা হলেও। তাই নারীর চরিত্রের মূলে উপাদান লজ্জা ও ভয়, অহংকৃত প্রবল শক্তিমান লজ্জা সঙ্কোচ বোধহীন নির্ভয় পুরুষেরও দৃষ্টিতে সেভাবে দেখা হয় নি। যে লজ্জা ও ভার সব প্রতিভাকে পঙ্গু, ব্যর্থ ও অসার্থক করেছে। অসত্যাচারী করেছে। সত্যহীনের হাতে সৃষ্টিও অসত্য হয়।

॥ ৩ ॥

আমাদের বক্তব্যে ফিরে আসি। আমাদের বক্তব্য ও প্রশ্ন ছিল নারীজগতের দ্বারা পৃথিবীতে কোনো সার্থক সাহিত্য শিল্পকলা সৃষ্টি হয় নি কেন।

ধরে নিলাম হ্রী ও সম্ভ্রমবোধ তাঁর ঐ নৈর্ব্যক্তিক বা সাক্ষীস্বরূপ দর্শক ভাবে সৃষ্টির প্রধান অন্তরায়। যার জন্য নারীরচিত সাহিত্যে পুরুষচরিত্র সৃষ্টিতে নারী পুরুষের দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা, বর্বরতা, অমার্জিত অসভ্যতা দেখতে পেলেও বলতে পারেন নি। ভয়ে? লজ্জায়? বলবে সে কথা।

ভয় কাকে? সমাজকে? যে সমাজ একটা সংগঠন মাত্র। স্বজন নয়। যাদের সমাজ নেই, যারা সমাজচ্যুত পতিতা নারীসমাজ? তারাও তো বলতে পারত। লজ্জা কাকে? স্বজন বন্ধু পিতা পতি পুত্রকে? তার বাইরের একটা প্রবল সমষ্টি পুরুষকে?

তবু প্রশ্ন থাকে সৃষ্টির জগতের নবরসের বিরাট বিপুল জগত ক্ষেত্রের কথা। —নানাবিধ রস, যে রসে পৃথিবী ধরা আছে। জীবজগৎ জীবধর্মও ধরা আছে—মানুষ ছাড়াও।

ঐসব রসের আদি বা মূল রস হ'ল প্রেম বা আদিরস। তারপর আরো আটটি রসের কথা রসশাস্ত্রে পাই। এক কথায় নবরস। যা হ'ল আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, বাৎসল্য। যদি ধরেই নিই যে, আদিরসের বা প্রেমের কামনা জগতের খোলাখুলি আলোচনাতে মেয়েদের লজ্জা

অন্তরায় হয়, (হয়তো বটেই বোঝা যায়)। যদি মনে করি রৌদ্র বা বীররসের ক্ষেত্রও তাঁদের দূরধিগম্য ক্ষেত্র,—সব সময় মনে করব না যদিও—কেননা শাস্ত্রে অসুরনাশিনী চণ্ডী আছেন, দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা আছেন, বীরনারীরা আছেন দেশ-বিদেশের ইতিহাসে, পুরাণে, সাহিত্যে ; যদিও বীভৎস, অদ্ভুত, ভয়ানক, রসের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ প্রকাশ তাঁদের আছে কিনা আমার জানা নেই ; কিন্তু শান্ত, করুণ, হাস্য, মধুর, বাৎসল্য এইগুলো তে তাঁদের সাহিত্য বা শিল্পকলা চিত্র সৃষ্টির উপাদান সহজেই হতে পারত। করুণ বা বাৎসল্য রসের একটি ব্যঞ্জনাময় চিত্র বা ইঙ্গিত নারীর কোনো শিল্পকলা জগতে সাহিত্যক্ষেত্রে অনাদি কালের কোথাও কারও কোনো ইতিহাসে দেখতে পাওয়া গেল না কেন ? চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর অথবা সাহিত্যিক হাতে মহাসতীদের যশোদা, দেবকী, ম্যাডোনা, রতি, মেরী, ম্যাগডালিন, অহল্যা, পিঙ্গলার মূর্তি ধরলেন না কেন ?

পুরাণের রামবিলাপ সীতাহরণে, ইন্দুমতীর শোক অজবিলাপ রুরু প্রমদ্বরা মেয়েদের কোনো কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে নি। আর পতিনিন্দার প্রতিবাদে সতীর দেহত্যাগ। শোকার্ত ধূর্জটির সতীদেহ স্কন্ধে উন্মত্ত পৃথিবী ভ্রমণ। তারপর যোগমগ্ন মহেশ্বরের উমা দর্শনে মদনের আবির্ভাবে বিচলিত তপোভঙ্গ এবং মদনভস্ম বা প্রেমভস্ম ! লজ্জিতা উমার ত্যাগ সাধনা পঞ্চতপে প্রেমের সাধনা। অতনুরূপে প্রেমেরই পুনরুজ্জীবন সাধনা। যোগী মহেশ্বর মহারুদ্রের কাছে তপস্বিনী নারীপ্রেমের মহৎ প্রকাশ। ত্যাগ-সহিষ্ণুতার মহৎ রূপের আবির্ভাব অপর্ণা উমারূপে। মেয়েদের লেখনীতে এ অনুভূতির গভীর আশ্চর্য রূপেও ধরা পড়েনি আজ অবধি কোনো রাজ্যেই।

তারপর রতিবিলাপ। "বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী" আলুলায়িত কেশা রতির শোকের পতিবিয়োগের যে রূপময় জগৎ মহাকবি সৃষ্টি করেছেন ; যে বিচ্ছেদের বিয়োগের আর্তশোকের মর্মন্তুদ অনুভূতি কোন বিয়োগাতুর নারীর অজানা আছে জানি না। কিন্তু সে বিয়োগ বিচ্ছেদের বিলাপের কাহিনীও পুরুষ মহাকবিরাই লিখে গেলেন, এঁকে গেলেন ! নারী নয়।

ভাবি, ধুলোয় ধূসর হয়ে মাটিকে লুটিয়ে পৃথিবীর বুক ভিজিয়ে কোন্ নারী বিয়োগের দিনে কাঁদেনি ! কোন্ নারী সে কান্না দেখে সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু মোচন করে নি ! অবাক হয়ে ভাবি—তাহলে কি সে অনুভূতি তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে এমনি একাত্ম যে, তাকে তাঁরা দর্শকরূপে দেখতেই পান নি—পান না ?

স্রষ্টা ও দ্রষ্টা পুরুষ কবি মহাকবিরাই—নারী নয়। প্রাকৃত মানবীর মত পৃথিবীর মাটি ভিজিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে যে রতি-বিলাপ পুরুষের অশ্রু-বিলাপ শোক এমন কি ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে বিলাপ সবই পুরুষের সৃষ্টি। তাঁরাই দেখতে পেয়েছেন। কবি শ্রুতি, স্মৃতিতে, কলমে পুঁথিতে ধরে জগতে ছড়িয়ে গেছেন। মেয়েরা নয় এবং যক্ষবিলাপ ও মেঘদূতের অমর বিরহ-কথা আদি ও

অনাদি বিরহ-বিলাপ নরনারীর মন ও দেহের দুর্বার বাসনার কথা তাও নারী কখনো বলতে পারেন নি।

তারপর বাৎসল্য রস। বাৎসল্যের রসঘন জননী মূর্তি মাতা যশোমতী ব্রজগোপীদের মাতৃভাবের বাৎসল্য ভাবের রসমূর্তিও পাচ্ছি শ্রীমদ্ভাগবতে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার দৌরাত্ম্যে, দুষ্টামীতে, চপলতায় বাৎসল্য রসের ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, কপট শাসন, শাসনেও বেদনা, শিশুপ্রীতির চিত্রে চিত্রিত হয়েছে কয়েকটি অধ্যায়ে, তাতে মাতৃ-হৃদয়ের মাতৃভাবের হৃদয়ের প্রশ্রয় দুর্বলতা, মমতা, শঙ্কা, উদ্বেগে আবার কপট কোপরোষশাসনে, তার মত স্পষ্ট উজ্জ্বল চিত্র আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে গোপীরা কেউ বিব্রত, কেউ বিরক্ত, অনেকেই কৌতুক বোধ করে মা যশোমতীর কাছে বিবক্তি, অনুযোগ, কপট ক্রোধ প্রকাশ করে যাচ্ছেন। যশোদাও গোপালকে কখনো মৃদু ভর্ৎসনা করছেন, কখনো প্রতিবেশিনী সঙ্গিনী তাদের অনুনয় করছেন, যেন গোপালের দোষ না নেন। দুর্বল মাতৃহৃদয়ের প্রশ্রয়-উদ্বেগ-রাগ-ক্রোধ-বিরক্তি ক্ষমা-শাসন-চেষ্টা বাৎসল্য রসে মিশানো চিত্র এক আশ্চর্য ছবির মত চোখের সামনে ভেসে আসে। যে মা শাসন করতে গিয়েও শাসন করতে পারেন না, রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলেন। কার ঘোল দধিতে, ঘোল 'মউনি'তে কৃষ্ণ হাত দিয়েছেন। কার মাখন চুরি করে খেয়ে ফেলেছেন…….।

এই রসই বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলীতে পাই—উদ্বেগশঙ্কাতুর জননীর চিত্র ঃ

'কারু বোলে বড় ধেনু চরাতে না যেয়ো কানু
হাতখানি রাখ মোর মাথে'

কোনো নারী-রচিত সাহিত্যে আমরা এই বাৎসল্য রসের চিত্রও পেয়েছি মনে হয় না। কিন্তু অন্যত্র যদি খুঁজে দেখি তাহলে দেখতে পাই অনামিক ছেলে-ভুলোনো ছড়া-রচয়িত্রী রূপকথা-কথাকিনী নারীকে। যাঁরা নারী বলেই মনে হয়, পুরুষ না হওয়াই অশুভ। তাঁদের বাৎসল্যরস কৌতুক, শঙ্কা, অদ্ভুত রসে মেশা স্নেহশঙ্কাময় কথাগুলি পংক্তিতে পংক্তিতে বসে ঝলমল করছে। 'হাট্টিমা টিমটিম' 'চালতা তলায় গরুর ঠ্যাং', 'খোকা আমার কেঁদেছে', 'কে মেরেছে কে ধরেছে', 'তালগাছেতে হুমুর দুমুর বাঁশ গাছেতে থানা', 'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে', এবং সেই 'মাছ নিয়ে যাবে চিলে আর কিছুটা নিয়ে যাবে কোলা ব্যাঙ' ইত্যাদিতে।

এই সব রূপকথা, ছড়া-সাহিত্য বা কাব্যতে যে বাৎসল্য, অদ্ভুত, ভয়ানক রস রাজা রাণী, রাক্ষস ডাইনী, প্রেত শাকচুন্নীর কথা মিলে মিশে আছে এগুলির রচয়িতারা মেয়ে বা পুরুষ কোনোদিন জানা যায় নি। নিশ্চিতভাবে মনে করে নিতে পারি ঠাকুমা, দিদিমা, মা, মাসী, পিসিরাই এর রচয়িত্রী। পুরুষ সাহিত্যকারের মত সাজানো মার্জিত রচনা নয়।

কিন্তু রচনা করা মেয়েদের লেখা কাব্যে, সাহিত্য, আখ্যায় আখ্যাত, কাহিনী-কথায় জগতে এ জিনিস মেয়েদের কলমে ফোটে নি। রাম বনে গেলে বাৎসল্য শোকময় দশরথের যে বিলাপ—'শস্য সলিল বিনা পৃথিবী কল্পনা করা যায় রাম বিনা অযোধ্যা' তাঁর কল্পনাতীত। এতো মহাকাব্যের কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরতের কাহিনীও এক হরিণ শাবকের ওপর প্রবল মধুর মমতা বাৎসল্যের অপূর্ব রসে ভরা। এইসব মহাকবিদের কথা-কাব্য। পুরুষ-রচিত সাহিত্যে আমাদেব এ কালের সাহিত্যিকদের লেখাযও এমনি দু'একটি গভীর বাৎসল্যের রসস্পর্শ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'শুভা' গল্পের মূক মেয়েটির জীবজন্তু-প্রীতিতে। তাব চেয়ে গভীব ও স্পষ্টভাবে ফুটেছে 'কাবুলীওয়ালাতে' এবং শরৎচন্দ্রেরও 'চন্দ্রনাথের' কৈলাস খুড়োর আশ্রিতা নিষ্পর মেয়ে সরযূর ছেলের উপর আশ্চর্য গভীর মন কেমন করা দুর্বার মমতার চিত্রে। তাঁর দাবা খেলার আসরে সঙ্গী ঐ শিশুকে নিয়ে। বিখ্যাত 'মহেশ' গল্পেও পালিত হালের বলদের ওপর পালক মানুষের গভীর মমতা কল্পনার চিত্র রয়েছে।

যদি এবারে বলি এই একশত বছরের নারী-রচিত সাহিত্যে, কাব্যকবিতায় এই বাৎসল্য ভাবের ও রসে কোনোই নৈর্ব্যক্তিক আশ্চর্য স্পর্শই নেই, তা বললে মিথ্যা বলা হবে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি বলি বিদেশী মহিলা রচিত কাব্যে, সাহিত্যে ও তাঁদেরও পুরুষ-রচিত সাহিত্যেব মত এই রস ফুটে ওঠে নি (করুণ ও বাৎসল্য রসে ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের 'লুসীগ্রে' স্মরণীয়)। অথচ অশিক্ষিত নারী-চরিত ছড়া আব রূপকথাগুলিতে অলঙ্কার, অনুপ্রাস, উপমার ঐশ্বর্যে সাজানো হোক বা না হোক, সত্য সত্য বাৎসল্য রস, অদ্ভুত রসও আছে। কৌতুক হাসির রসের স্পর্শ আছে। এটিও খুবই বিস্ময়ের বিষয় এবং এইটিই নারীর আত্ম-সচেনতাই যে তার সৃষ্টির অন্যতম অন্তরায় তার প্রমাণ।

যে নারী ছেলেভুলোনো ছড়া আর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন তিনি সুশিক্ষিতা গরবিনী 'সাহিত্য' পড়া টেবিলে বসে গল্প কাব্য সাহিত্য রচনাকারিণী একালের আমাদের মত লেখিকা নন। তিনি বনবাসী ব্যাস বাল্মীকির মত মহাকবি না হতে পারলেও প্রাঙ্গণ-কুটির-গৃহবাসিনী এক অবচেতন মানসস্রষ্টা নারী। লেখা তো রচনা করে নি, তাই ভাষা, উপমার ও পরিমার্জন করার কথা মনে ওঠে নি। তাকে সাহিত্য আকার দেওয়া বা প্রচারের কথাও তাঁর মনেই কিংবা জানাই ছিল না ; তাই সেগুলি হয়ে উঠেছে অদ্ভুতভাবেই অদ্ভুত সাহিত্য বা 'অশিক্ষিত কাব্য'। নামের কথাও ভাবেন নি—সেই অনামিকার তাই সেগুলি চিরকালের মানবমনের পাতায় লেখা আছে অনামিক হয়েই।

আমার বক্তব্য ছিল লজ্জা, ভয়, সংকোচ সচেতন মনে সৃষ্টি হয় না এবং কোনো সৃষ্টিই করব মনে করে সজ্ঞানেও সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হয় ধ্যানে। বিশ্বস্রষ্টাও ধ্যানে ও লীলায় সৃষ্টি করেছেন। মুনি ঋষি শাস্ত্র উপনিষদ বেদও তাই বলেন।

ঐ অতি যৎসামান্য কিন্তু 'অসামান্য' ছড়া আর রূপকথা সাহিত্য'ও তাই লীলা-জগতেই মা সন্তানের একান্ত লোকে নারীদের একান্ত রূপ সৃষ্টিলোকে অবলীলাক্রমেই সৃষ্টি হয়েছে। যাতে সতী আছে। অসৎ নারী আছে। ডাইনী হিংসুক মেয়ে দয়াবতীও আছে। রূপকথায় সবই অত্যন্ত স্বাভাবিক নরনারী। আমাদের এখনকার মত 'চমকপ্রদ-নারীচিত্র' নয়।

এরপর আসে অদ্ভুত, ভয়ানক ও বীভৎস রসের কথা। মেয়েদের হাতে এও সৃষ্টি হয়নি কোনখানেই। ভীমের দুঃশাসনের রক্তপানে ভয়ানকতা। কীচক বা জরাসন্ধ বধের বীভৎসতা। চণ্ডীতে 'রক্তবীজ' আদি অসুর বধের 'অদ্ভুত' রসকথা। গীতার একাদশ অধ্যায় অর্জুনের 'বিশ্বরূপ দর্শন'। সেও স্বয়ং অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই অদ্ভুত বলেছেন তাকে। সেই 'অদ্ভুত রসে' আবার 'ভয়ানক রস'ও আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কালের করাল দ্রংষ্টায় 'কেচিদ্‌বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈ'। (কেহ দন্ত লগ্ন, কারুর মাথা বিচূর্ণ)।

গীতা ও চণ্ডী স্বয়ং ভগবদুক্তি ও দেবীলীলা বলে ছেড়ে দিলেও পুরাণ-গুলিতে যে মুনি-ঋষি-কথিত নানাভাবে নবরস কথা আছে, সে কালের এ কালের মেয়েদের কোনো সৃষ্টিতেই এই কোনো রসসৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য সেকালের মেয়েদের লেখা ছোট ছোট কবিতা ছাড়া বড় লেখা আর কই?

বরং অজ্ঞান কালের প্রাকৃত নারীর ঐসব রূপকথা আর ছড়াতে যেন ভয়ানক রসযুক্ত নরনারী, পশুপাখী, ভূতপ্রেত রয়েছে। অদ্ভুত রসময় গাছপালা নদীজলও অনায়াসে সৃষ্টি করেছেন তাঁরা।

তারপর আসে হাস্যরস। না, হাস্যকৌতুকের অম্লান শ্লীলরসও তাঁদের হাতে ফোটে নি। অশ্লীল গ্রাম্য হাস্যকৌতুক গোপালভাঁড়ীয় রসও তাঁরা সৃষ্টি করতে পারবেন না, এতো জানা কথা। কয়েক শতক আগের বিশিষ্ট কবিদল ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম আদিকবিদের কলমে কোনো রসই বাদ যায় নি। তর্জা কবিগানের সাহিত্যেও নারীর কলম বা মুখ খোলে নি।

নারী জিজ্ঞাসা

॥ ১ ॥

(বক্ষ্যমান 'নারী জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের লেখিকা পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী এ-যুগে কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না—বিশেষ সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে। বহু এবং বিবিধ গ্রন্থের প্রণেত্রী তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও মননের ক্ষেত্রটিও ব্যাপ্ত এবং বহুমুখী। জগৎ ও জীবনকে দেখার একটা অসামান্য নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে। বয়স প্রায় আশী। আশ্চর্য বিস্ময় লাগে যে, বয়সের ভার তাঁর প্রতিভা ও স্মৃতিচারণাকে এখনও ম্লান করতে পারেনি। অভিজাত কিন্তু নিরহংকার বিনয়-বিগলিত। তাঁর বিনম্র মিষ্ট মধুর অমায়িক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এ-যুগে বিরল। অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের যুগ-জিজ্ঞাসার একটা সঙ্গতি মিলে তাঁর চিন্তায়। আজকের কিছু না-মানার দিনে ঘৃত-প্রদীপের স্নিগ্ধতা নিয়ে আলোক-দিশারী হিসাবে আরও অনেক দিন নিরাময় সুস্থ সক্ষম দেহ-মনে আমাদের মধ্যে তিনি বিরাজ করুন, এই প্রার্থনা।

প্রবর্তক পত্রিকাখানিকে তিনি স্নেহ করেন। তাঁর লেখা ইতিপূর্বেও প্রবর্তকে প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধ 'নারী জিজ্ঞাসা' তাঁর পরিপূর্ণ বয়স ও মননের পরিপক্ক অবদান। এই রচনার দ্বিতীয় কিস্তি পাঠাবার সময় লেখিকা যে পত্র দেন সেই পত্রখানি এখানে আমরা নথি হিসেবে রাখলাম।

মাননীয় রাধারমণ চৌধুরী (প্রবর্তক সম্পাদক)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রখানিতে ভারি আনন্দিত এবং আশ্বস্ত হলাম।

লেখার সার্থকতা পাঠকের ভালো লাগার স্বীকৃতিতে।

আমার এই লেখা নারীর ইতিহাস (একে নারী জিজ্ঞাসা নাম দেওয়াই ঠিক। নামটা বদলালাম। 'নারী জিজ্ঞাসা' করবেন। ইতিহাস চিরকালের বিষয়। 'জিজ্ঞাসা' একটি মানুষের প্রশ্ন, আরো দু'অংশ স্তবক বা কিস্তি পাঠালাম। পরিশিষ্টটা এবারে ধরেছি। আগে-পড়া সব দরকারী বই পাই না, স্মৃতি এবং কল্পনা ও দেখা থেকে লেখা। মন উঠছে না। তবে রইল জড় হয়ে আমার চেষ্টা যদি পরে কোনো বিদুষী মেয়ে এই থেকে 'নারী চরিত্র ও জিজ্ঞাসা'র আলোচনা করেন। ভাল করে পড়িয়ে নেবেন কিন্তু। লেখা বড় খারাপ হয়েছে

অনেক জায়গায়। এমনি আমার শরীর ভালো। অথচ পিঠ বেঁকেছে। পায়ের জোর কমেছে। চোখ খারাপ। কাজ শেষ করে নেবার তাগিদ মনে জাগছে।

আপনি কেমন আছেন? বড় খাটুনী আপনার—তার মত সেবাব্রত হয় না। নমস্কার নেবেন, প্রাপ্তিস্বীকার দেবেন। ইতি—

ইহা সমগ্র রচনার ভূমিকা স্বরূপ ছিল।

এই ভূমিকায় লেখিকার যা বক্তব্য ছিল তার সারনির্যাস এই যে, নারীর ইতিহাস বলে কিছু নেই। পুরুষ নারীর ইতিহাস, নারীর সুখদুঃখের, মর্মবেদনার, আনন্দের, সামাজিক ভাল-মন্দের কথা লিখেছেন এবং তা লিখেছেন তাঁর দৃষ্টি দিয়ে। কোন নারী তা পারেনি। কেন পারেনি? তার কারণস্বরূপ লেখিকা দেখিয়েছেন যে, সৃজনজগতে নারী তার ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি তাদের সৃষ্ট জগতে তারা করতে পারেনি। না পারার কারণ 'নারীর ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় কিস্তিতে (প্রকাশিত প্রবর্তক, বৈশাখ, ১৩৭৬) লেখিকা দেখিয়েছেন। বলেছেন, এই ত্রুটি নারী স্বভাবেই, তার মননধর্মের, তার সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গীতেই অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে। লেখিকা নারী মনস্তত্ত্বের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বিশ্লেষণ করে গীতার বিভূতিযোগের একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এই শ্লোকে আছে নারীতে ভগবানের বিভূতির 'ধৃতি মেধা ক্ষমা মতি' এবং 'কীর্তি শ্রী' গুণের প্রকাশ এবং এর ওপরেই সমগ্র পৃথিবীর নারীর স্বভাব এবং চরিত্র দাঁড়িয়ে আছে। লেখিকা মন্তব্য করেছেন, "এ দেশের মানুষ এবং অন্য দেশেরও সব পণ্ডিতেরা নারী-চরিত্রের এই সূক্ষ্ম উপাদানটির কথা কোনখানে বলেননি।" গুণগুলির আবার অধিষ্ঠান হল 'হ্রী'তে লজ্জায়। অর্থাৎ লজ্জাই নারীর নিগূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশের পথে যে বাধা হয়েছে তাই লেখিকা বিভিন্ন কালের ও দেশের কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি আলোচনার মধ্যে বিশদ করে ধরেছেন এই 'নারীর ইতিহাস' তথা পরবর্তী নামান্তরীত 'নারী জিজ্ঞাসা'য়।—প্রঃ সঃ]

মধুর শান্তরসের কবি জগতে একমাত্র আছেন মীরাবাঈ, মধুর রসের কবি হয়ে। প্রাকৃত দাম্পত্য পতিপ্রেম অন্য রকম সম্পর্কের পরকীয়া স্বকীয়া কোনো প্রেম নয়, সবটাই পতিরূপী ভগবানে প্রেম। ভগবৎপ্রেম বিরহ মিলন অভিমান অনুযোগ বাসনা কামনাময় এক আশ্চর্য মধুর রসে অভিষিক্ত এই কাব্যসঙ্গীত-গুলি। অপার্থিব অলৌকিক শান্ত মধুর রসে টলমল করছে যেন দেহময়ী বিরহিণীর বিদেহী পতি ঈশ্বরের মিলন বিরহ অভিসার সঙ্গীত। একমাত্র মীরাবাঈ ছাড়া আর কোন নারী এমনভাবে মধুর রসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে তুলে যেতে পারেননি। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার বিরহ মিলনকে যতটা নরনারীর প্রেম বিরহ মিলন অভিসার সঙ্গীতে, যেমন 'এ ভরা ভাদর' 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু' ভাবের

গানে বিরহ প্রেম লীলা মানুষ নিজেদের ওপর আরোপ করে নিতে পারে এব দেহভাবেও অনুভব করে, মীরাসঙ্গীতে আমরা সেই ঈশ্বরপ্রেম ও মানুষের প্রেমের মিশ্র আবেগ-অনুভূতি পাই না।

মীরাবাঈয়ের গানগুলি প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ সব গানই 'উমড় ঘুমড়কে বরসা আয়ো' 'চাকর রাখো' 'চিতনন্দন বিলমাই' 'শুনি ময় হরি আওয়নকী আওয়াজ' ইত্যাদি সকল গানেই ভগবৎভাবের বিদেহ বিরহী পতিপ্রেমেই যেন একটি ভক্তি প্রেম মিলন বিরহের শান্ত মধুরতা তাঁর চেতনাসত্তাকে অভিভূত আপ্লুত করে রেখেছে। মধুর ভাবের মূর্তিময় নির্মল সঙ্গীতকাব্য গান বলা যায়। তাঁর দেহাতীত হবি বৈষ্ণবকাব্যের 'কৃষ্ণ' হয়নি। তবু মীরাবাঈ যিনি একমাত্র নারী, অমর নারী কবি, যাঁর ভক্তিসরময় মধুর শান্তরস মানবী ও ভগবানের প্রেমলীলা-ময় কাব্যগানগুলির মধুর রসের একটি আশ্চর্য দিক, নারীচিত্তের একটি আশ্চর্য অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি করেছে।

যদিও তা জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস সুরদাসের মত ভক্ত ভগবানে দেহী-বিদেহী রাধাভাবের প্রেমরসসিক্ত সর্বত্র হয় নি। মীরাবাঈয়ের সবটাই বিরহ অভিসার মিলনের আকাঙ্ক্ষা বেদনা উদ্বেগ সঙ্গীত : 'ন হাম রমণী ন সো রমণের' একাত্মতা বা মিলনের মধুর দিক ও অদ্বৈত অনুভূতিও সে সঙ্গীতে ফুটে ওঠেনি। এটি ভক্ত ভগবানের বিরহ মিলনে পতিপত্নীলীলা বৈষ্ণবকাব্যের অথবা মহাপ্রভুর একাগ্র ভাব রাধাভাব এতে নেই।

তবুও এ ভাব বা রস মীরাসঙ্গীত-সাহিত্যেও দেবতা-মানুষে ভগবান-ভক্তের লীলার অমর সঙ্গীত-সাহিত্য। মোটামুটি মনে হয় মানুষের নবরসের—মধুর বা আদির—অপূর্ব একটি ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়ময় দেহাতীত অলৌকিক মধুর দেহময় মিলন বিরহ বৈষ্ণব-কবিতার সম্ভোগলীলার পর্যায়েও 'মীরা-সঙ্গীত-সাহিত্য, পৌঁছয়নি এব' অন্য মেয়েদের কোনো রচনাতেই এ ভাব পাওয়া যায় না। এও সম্ভবতঃ ঐ নারীদেরই 'সচেতন' মন ('কে কি ভাববে') যার জন্য লজ্জা ভয় সঙ্কোচ। যদিও মীরা ভগবৎপ্রেমের জন্য সামাজিক লজ্জার বন্ধন মানেন নি।

এক কথায় মেয়েদের যে কোনো সৃজনশক্তির—প্রতিভা থাক বা নাই থাক—মূলে যে বাধা বা অন্তরায় রয়েছে তা হ'ল লজ্জা এবং ভয় সঙ্কোচ, যা লজ্জার সহচর বা অনুসঙ্গী। অথবা ঐ ভয় যার বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন জীবদেহে প্রাণে প্রাণভয় সংস্কারেরই সকল সংস্কারের অনুভূতির আগে উৎপত্তি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিশুর মনেও নাকি প্রথম অনুভূতি ভয়। চমকে ওঠা। শব্দে কেঁদে ওঠা।

সে যাই হোক, মেয়েদের এটা কখনো লজ্জা ও ভয় মেশা অথবা কখনো ভয়ে ও লজ্জায় সেই প্রবল এক অনুভূতি। আমাদের নিজেদের মনের প্রবণতা সৃজন-

ক্ষমতা নারীস্বভাব তার রুচি অনুভূতি নিয়ে মোটামুটি যতটা আমাদের জানা ও আলোচনা সম্ভব তা করা হল।

যদিও বাকি থাকে ঢের। সারা পৃথিবীর নারী তার পারিপার্শ্বিক, তার মন ও প্রবণতাও তাই দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তবু হাঁড়ীর একটি ভাত সিদ্ধ হল কিনা দেখার মত মূল নারীচরিত্র একই। এটা স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি বলা যেতে পারে।

তবুও যেমন একেবারে স্বাধীন মেয়ে অর্থাৎ গণিকা স্বৈরিণী নারীর চরিত্রের সর্বদিক দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। একসঙ্গে বহুপতিক নারীরা প্রেমজগতে যাঁরা আছেন কোথাও (যেমন এখনোও প্রথা আছে তিব্বতে) যেমন বিবাহ বিচ্ছিন্নারা, বার বার বিবাহিতা নারীও তো সর্বত্রই আছেন এবং তাঁরা শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা যাই হন, কিন্তু মূলতঃ মনোধর্মে প্রেমে ও লজ্জায় তাঁরা একই রকম। সুবিখ্যাত মনস্বিনী এবং বিখ্যাত লেখিকা স্বর্গীয়া ভার্জিনিয়া উল্‌ফের লেখায়ও মেয়েদের 'সাহিত্য শিল্প সৃজনপ্রতিভার' অভাব সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা আছে। তিনি অবশ্য 'সাহিত্য'-জগতের কথাই বলেছেন। তাতে তিনি নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন—

(১) স্কুল কলেজে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা অনধিকার—সামাজিক হিসাবে।

(২) পারিবারিক জীবনে ছেলেমেয়ের শিক্ষায় ব্যবস্থা অধিকারে তারতম্য।

(৩) বাইরের সমাজজীবনে ও ভালোমন্দ কাজে জ্ঞানচর্চা শিল্পচর্চাতে প্রবণতা অনুযায়ী বন্ধুসঙ্গ লাভের মেয়েদের নানা বাধা ও আপত্তি।

(৪) আর্থিক কোনো অধিকার (ক) অর্জনের সুযোগ (খ) উত্তরাধিকার না থাকা।

(৫) আপন গৃহ আপন অর্থ (নিজস্ব) তথা—ব্যক্তিস্বাধীনতা না থাকা।

(৬) পুরুষদের শিক্ষিতা মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গ শ্লেষ।

(৭) লেখাপড়ার ক্ষেত্রে গুণী মানী পুরুষদের গুণশালিনী নারীর রচনা প্রচার ও প্রকাশের সাহায্য না করা এবং প্রতিকূলতা করা। আরো অনেক কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডক্টর জনসন প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত 'বচন' এবং 'প্রবচন'ও তুলে দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর আলোচনা ও অভিমতগুলিকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

বইখানির নাম হল "এ রুম অব ওয়ান্‌স ওন" (A Room of One's Own)।

যার মূল বক্তব্য বইয়ের নামকরণেই পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নিজস্ব একখানি ঘর বা আশ্রয়।

এই ক্ষেত্রে আমাদের জেনে রাখা উচিত এই মনস্বিনী অসামান্যা লেখিকার এই ছোট্ট চটি পুস্তিকাখানির মত আর একখানি নারীরচিত বই আমাদের কারুর কোনো দিন দৃষ্টিগোচর হয়নি। অন্ততঃ আমার তো চোখে পড়েনি। চিরকালই

বিখ্যাত মনস্বী প্রতিভাবান পুরুষ মানুষের উক্তি দেখেছি শুনেছি—প্রতিকূল, অনুকূল ও নিরপেক্ষ। প্রতিকূলতায় কখনো সঙ্কুচিত স্বভাবতঃই অপ্রতিভ নারীজাতি আহত লজ্জিত হয়েছেন। অনুকূলতায় কখনো উৎসাহিত হয়েছেন (হয়তো করুণা ?) লেখাপড়ায়। দু'চার কথা বুদ্ধি বিদ্যা অনুযায়ী বলেছেন। মেনেও নিয়েছেন।

বছর ১২।১৪ আগে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটি বইয়ের সমালোচনা দেখি। বইটির নামটি ঠিক মনে নেই, মনে হচ্ছে "মেয়েরা কি পুরুষদের চেয়ে ইনফিরিয়র" 'নিম্নস্তরের ?' প্রকাশক মনে হয় অ্যালেন আনউইন। বইখানি খুঁজেছি। হাতে পৌঁছয়নি। এক্ষেত্রেও সেই একই নিরুপায়তা মেয়েদের। পুরুষের সহযোগিতার অভাব এবং নিজেদের বন্দী ও গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। সংগ্রহ করে নেবার সুবিধা নেই। এনে দেবার লোক নেই।

এই থেকেও বোঝা যাবে, দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের জ্ঞানের পরিমণ্ডল সংকীর্ণ। পুরুষের কাছে যা অবারিত মুক্ত। কিন্তু সেই বইখানা বা কোনো বই দেখতে পেলেই যে মেয়েরা খুব 'জ্ঞানে বিজ্ঞানে' 'তালেবর' কিছু প্রমাণ হয়ে যেতো তা ভাবছি না। কিন্তু অনেক তথ্য মতামত অভিমত নিরপেক্ষ অনুকূল প্রতিকূল সবই একত্রে দেখার সুযোগ পাওয়া যেত তো! যাতে মেয়েদের স্বভাবের ও চরিত্রের (নারীস্বভাব যেটা জৈব নারীচরিত্র .সামাজিকও) মূল ভিত্তিটা কি যার জন্য তাঁরা 'অপ্রতিভ' জীব হয়ে রইলেন কিংবা মহৎ প্রতিভাবতী হলেন না, এটা বোঝবার কিছু উপাদানও পাওয়া যেতো। আমাদের যে কেন সত্যই কোনও রকম সৃষ্টির প্রতিভা নেই তাও নিঃসংশয়ে মানা এবং স্বীকার করারও প্রয়োজন আছে। নিজেকে জানা সেটা। ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে জানা। স্বাভাবিক সৃজন-প্রতিভা এক জিনিস; আর জ্ঞান অর্জন করে কিছু রচনা বা সৃষ্টির চেষ্টা পৃথক বস্তু। যাকে ইংরেজীতে জিনিয়স (প্রতিভা) এবং ট্যালেণ্ট (জ্ঞান) বলা হয়। সেটাও জানা বোঝা দরকার।

মোটামুটি দৃষ্টিতে দেখলেও বোঝা যাবে জগতের অনাদিকালের ইতিহাসে কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মে কাব্যে কলায় শিল্পে সাহিত্যে কর্মেও কোনখানেই নারীর হাতে মহৎ সৃষ্টি কিছু হয়নি। 'বৃহৎ' কিছুও সৃজন করতে তাঁরা পারেন নি।

বৃহৎ বা স্থূল শক্তির ক্ষেত্রে ও সৃষ্টিতেও নারীর শক্তি স্বভাবতঃ প্রাকৃতিক বিধানেই অক্ষম। যেমন বৃহৎ ভাস্কর্য. বৃহৎ স্থাপত্য ক্ষেত্রে নারী চিরকালই মজুর বা সাহায্যকারী শিল্পী। স্রষ্টা নারী নন। তাঁর শরীরই, শক্তিহীনতাই তাঁর অক্ষমতার কারণ।

কিন্তু সূক্ষ্ম ললিতকলা যেমন চিত্রকলা সঙ্গীত নৃত্য সাহিত্য কাব্য ধর্ম এতে তো শরীরের শক্তি বা কঠিন শারীরিক সাধনার প্রয়োজন হয় না। সবটাই মননজাত মনন-সাধনা মানসিক সাধনারই ক্ষেত্র সেটা। কিন্তু সেখানেও মজুরের

জানা যায় ইতিহাসে মহৎ বা বৃহৎ কোনো স্রষ্টা নারীপ্রতিভা নেই। সেক্ষেত্রেও তিনি চিরকাল অনুকারিণী প্রতিভা। অবশ্য আছেন অসামান্যা অভিনেত্রী সারা বার্নার্ড, নৃত্যপটিয়সী ইসাডোরা ডানকান, এলেন টেরী প্রমুখ। আমাদের পৌরাণিক জগতেও এমন অপ্সরা নারীরা আছেন। কিন্তু তাঁদের নৃত্যগীত প্রতিভা সৃষ্টি করেছেন বা প্রতিভা স্ফুরণ করেছেন যাঁরা, তাঁরা পুরুষই। আর এমন গুণী প্রতিভাবান পুরুষ মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী। সর্বত্রই নাচে-গানে আজো গুরু বা ওস্তাদ হলেন পুরুষরাই। ঐসব শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তাও পুরুষদেরই হাতে হয়।

এক কথায় বলা যায়, মৌলিক অথবা সংগঠক কীর্তি বা প্রতিভা মেয়েদের কোনো রকম কর্মজগতেই দেখা যায় না—না মনন জগতের লোকে,—না কর্ম জগতের ক্ষেত্রে,—না ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে। তাঁরা ধর্মসাধনার জগতে দেখা গেছে তপস্বিনী হয়েছেন, সাধিকা হয়েছেন, সাধনা করেছেন। কিন্তু মুনি বা ঋষি হন নি। বিরাট সাধক মহর্ষি হতে পারেন নি—কপিল, দত্তাত্রেয়, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখদের মত।

কপিলজননী দেবহূতি, মদালসা, চূড়ালা, অনসূয়া (দত্তাত্রেয় জননী) সকলেই সার্থক কীর্তিমান পুত্রের, স্বয়ং ভগবানের, অবতারের জননীও হয়েছেন। খৃষ্টীয় ধর্মসাধিকাও পাচ্ছি, কিন্তু স্বয়ং দ্রষ্টাঋষি দেবী হতে পারেন নি। তপস্বিনী রাবেয়া, কাশ্মীরের লল্লাদেদ্ (লালদেবী)-কেও পাচ্ছি। মীরাবাঈয়ের কথাও পাচ্ছি। কিন্তু সবাই সাধিকা জগতের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে মহান বিরাট কর্ম ও কীর্তিময় পুরুষের জগত। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে যতই খুঁজি না কেন 'নারী বিরাট' পাইনি। দেশের পুরাণ খুলে, বিদেশের পুরাণের সামান্য জানা কাহিনীতেও যাঁদের পেয়েছি, তাঁরা বিশিষ্ট নারী। কেউ পরমা সতী, কেউ মহীয়সী মাতা, কেউ দয়াশীলা ধর্মশীলা কর্তব্যশীলা নারী। জননী দুহিতা মাতা ভার্যা সকলেই সম্পর্কের আলোতেই জ্যোতির্ময়ী, দীপ্তিমতী।

এক কথায় তাঁদের দীপ্তি চাঁদের জ্যোৎস্নার মত সূর্যের কাছে পাওয়া। প্রতিফলিত—নিজের নয়। বলা যায় পুরুষ যেন সংখ্যা, মেয়েরা তার পাশে শূন্য, মূল্যহীন। সংখ্যা না থাকলে শূন্যের কি মূল্য। পুরুষদের পাশেই তার দাম।

॥ ২ ॥

মনস্বিনী ভার্জিনিয়া উলফের ধারণা মতে স্বাধীনতার গোড়ার কথা 'এ রুম অব ওয়ানস ওন'—'নিজের ঘর চাই'। নামকরণেই বইয়ের প্রতিপাদ্য বলা হয়েছে। তিনি অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন পুরুষের 'ভালো' ভদ্র এবং অমার্জিত অহংকৃত স্পর্ধিত অভিমতের। ভালো-মন্দময় মতামতেরই।—যেগুলিকে 'করুণা অবজ্ঞার টানাপোড়েনে গাঁথা আর বোনা অভিমতও বলতে পারি। কিন্তু মূল কথা হল তাঁর বইখানির 'একখানি নিজ গৃহ ও কিছু অর্থ' এবং মানুষের বাস্তব জগতে আশ্রয়, বাসস্থান ও অর্থকে প্রাথমিক. শেষ ও আদি মধ্য অন্ত সবকালেরই কথা।

তা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এতে কারুর মতভেদ হবে না। সাধুদেরও কুটির ও গ্রাস আচ্ছাদনের দরকার হয়। জীবিকার জন্য অর্থ ও ভিক্ষার প্রয়োজনও হয়। জন্তু পশুরও আশ্রয় লাগে। পাখীরও বাসা তৈরী করতে হয়।

জীবধাত্রী মেয়েরাই শুধু চিরকালই 'কাকের বাসায় কোকিলে'র মত আশ্রয় থেকে আশ্রয়ান্তরে—আশ্রয়চ্যুত হয়েও থাকতে বাধ্য হন। যার পায়ের তলার মাটি মুহূর্তে মুহূর্তে সরে যায়, ভূমিকম্পের মাটির মতই। সেটা হল এক এক আশ্রয়-দাতার বিধানে, বিয়োগে—অভাবে ও অনিচ্ছায়। এ একটা নারীজীবনে সর্বযুগ সর্ব দেশীয় সর্বকালীন প্রত্যক্ষ দৃশ্য। এই প্রত্যক্ষ অবস্থান্তর বিপর্যয় তাঁদের যাবজ্জীবন কালভোর চলতে থাকে। (১) কোনো দুহিতার পিতৃগৃহে প্রতিষ্ঠা নেই। (২) কোনো স্ত্রীর পতির বিয়োগে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় থাকে না। (৩) কোনো বিধবা জননীরও কোথাও প্রতিষ্ঠিত জায়গা থাকে না।

ভার্জিনিয়া উলফের বক্তব্য ছিল, "সেকস্‌পীয়ারের যদি কোনো বোন থাকতো সে সেকস্‌পীয়ার হতে পারত কিনা··· এবং কেন হতে পারত না···। কি তার অভাব অসুবিধা অপ্রতুল হত?" ইত্যাদি অনেক স্পষ্ট ও কিছু মৌল জিজ্ঞাসা তাঁর। 'প্রতিভার' জন্য কি দরকার···? বারে বারেই দেখে তাই তাঁর মনে হয়েছে "আর্থিক ও অবস্থানের পরাধীনতাই মেয়েদের কোনও বৃহৎ ও মহৎ কীর্তির তথা সৃষ্টিশক্তির প্রবল অন্তরায়।"···

তাঁর যুক্তিকে বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি অনেক উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন—জেন অস্টেনের লেখাপড়ার জায়গার অভাব। লুকিয়ে বইয়ের তলায় (মুদী ময়রা গয়লার) হিসাবের খাতার মধ্যে কাগজ নিয়ে "প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস" (?) রচনা। অন্য রচনা! তাঁর তথ্য ও প্রশ্নময় বইখানির কথা এখন থাক্, পরে তাঁর মতামতগুলি কিছু দেবো।

আমাদের একালে এখন নানা সমাজ দেশবিদেশের নানা জাতির নারীকে চোখে দেখা পড়ে শুনে জেনে নেবার দেশভ্রমণে দেখতে পাওয়ার বেশ-কিছু সুযোগ হয়েছে। তা থেকে এবং সেই ১৮৯৩ সালের পরের বিবেকানন্দের আমেরিকার পত্রাবলীতে আমেরিকার নারীদের কথা অনেক পাওয়া যায়। আমেরিকান নারীর কর্ম সহৃদয়তা পবিত্রতা শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন তাঁদের প্রশংসা করে। "তাঁরা স্বয়ং শ্রী" ডায়ানা দেবীর ললাটে তুষার-কণিকার মত নির্মল…

তাতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের সমাজ ও পরিবারে তারা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রের শিক্ষিত নারীজাতির চেয়ে আর্থিক ব্যাপারে সমাজের প্রথায় পারিবারিক জীবনে অনেক বেশী যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি স্বাধীন। তাঁদের জীবনের বহু অবসরেই তাঁরা অনেক সামাজিক সৎকাজে লেগে থাকেন। মানসিক জ্ঞানচর্চায় সময় দিতে পারেন। দেশবিদেশের ধর্মীয় কাজও করেন।

য়ুরোপের মেয়েরা ঠিক অত বিস্তৃতভাবে সামাজিক ও পারিবারিক কাজের বিচরণক্ষেত্র না পেলেও জেন অস্টেনের চেয়ে অনেক স্বাধীন হয়েছেন। আর্থিক স্বাধীনতাও পেয়েছেন—পিতা পতির যদি সম্পত্তি থাকে—তা থেকে।

চীন, জাপান ও এশিয়ার পারস্য, আরব, তুরস্ক, ভারতে স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার অধিকারগুলি নানা আকারে আছে এবং নেইও।

ভারতে কোথাও মাতৃতন্ত্র মালাবারের দিকে দক্ষিণ ভারতে আছে। অন্যত্র সর্বত্রই পিতৃতন্ত্রের অনধিকার। কোথাও (পুরুষের জন্য) সম্পত্তিতে যৌথ পরিবারতন্ত্রও আছে। চীন জাপানের মেয়েদের আমাদের দেশের মতই পিতা-পুত্রের মুখাপেক্ষী জীবনযাত্রা।

ইসলাম ধর্মেও সমাজে মেয়েদের সামাজিক জীবনে অধিকার খুব উদার এবং অনেক। যেমন সামাজিক জীবনে—আর্থিক জীবনেও। কিন্তু একেবারে অবরুদ্ধ জীবনধারা।

যদিও বিবাহে, বিবাহ বিচ্ছেদে, বিধবা বিবাহে পিতা-পতির সম্পত্তিতে অধিকার আছে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ সেইজন্যই আমাদের ঘরের উচ্চবর্ণের মতই সংকীর্ণ। একবার রেলপথে একটি কিশোরীর সঙ্গে মুসলমান-কন্যার সঙ্গে আলাপ হয়। স্বামী বিলাত-ফেরৎ। পড়াতে চান কিন্তু বাড়ীর গুরুজনদের মত হয় না। কৌতুক এই মেয়েটি বলেছিল যে হিন্দুর মেয়ে হলে পড়তে পেত। আমি দেখেছি বলেছিলাম হিন্দুর ঘরের নারীও যথাসময়ে সব সুযোগ পায় না। (এইখানে বলি মুসলিম সমাজের নারীদের চেনাজানা আমাদের শুধু রেল স্টীমার পথেই হয়। তাঁদের ঘরের মধ্যে তাঁদের কখনো দেখিনি। অথচ ক্রিশ্চান নারী ও সমাজকে আমরা চিনি অনেক বেশী, ঘরে ও বাইরেও)। এই বন্ধন বা বাঁধাবাঁধি নিয়ম যতই কম হোক, অধিকারের দড়িটা খোঁটায় বাঁধা আছে। সেই

থাকাই হচ্ছে বন্ধন। তা কোনো সমাজের কোনো পরিবারের সেইসব দেশের প্রথার উদারতা থাকুক না কেন। নারীদের রক্ষক দরকার দুর্জনের জন্য। কিন্তু ক্রমে তা বন্ধনে দাঁড়ায়।

এবং বন্ধনের সার কথা সত্য বন্ধনই গরুর গলার দড়িটা খোঁটা থেকে মাত্র কিঞ্চিৎ কম লম্বা। এইটাই বন্ধনের নীতিসার আর মূল কথা।

এবারে দেখা যাক সমাজের যেসব স্তরে মেয়েরা কাজ করে খেটে খায়। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে। সামাজিক অধিকার সরল সোজা। যথেচ্ছ ভোগ করে। তাদেরও দুঃখ আছে অস্বাধীন থাকায়। একবার একটি বিহারী নাপিতানী কুচরিত্র দুর্বৃত্ত স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা হয়। বললাম, "তুইও তাকে ছেড়ে চলে যা না। তোদের জাতে তো সে অধিকার আছে। নিন্দেও নেই তাতে।"

জানতাম তার একটি ছেলে ছিল। সে একটু হাসল। বললে, "ছেড়ে যাব কোথা। আবার যাকে নিয়ে ঘর বাঁধব সেও তো এই রকমই হতে পারে। আর ছেলেটার কি গতি হবে। সে না নিজের বাপকে পাবে, আমার নতুন ঘরে তার জায়গা হবে কিনা তাও তো জানিনা। হয়ত দুজনেরই মেরে হাড়গোড় ভেঙ্গে দেবে রাগ হলে।"

এবারে অকস্মাৎ ভার্জিনিয়া উলফের স্বাধীনতা-তত্ত্ব-দর্শনের নিজস্ব ঘর ও অর্থ বিশ্লেষণ দর্শন তত্ত্বের পাশে আরো যে কত সমস্যাতে জটিল নারীজগত ও নারী অস্তিত্ব রয়েছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

(১) দেখতে পেলাম, ইসলাম ধর্ম ও সমাজে প্রায় সব অধিকার রয়েছে মেয়েদের জন্য। নিজস্ব অর্থ, নিজস্ব গৃহ এবং বিবাহের বন্ধন ও মুক্তিতে। হজরৎ মহম্মদ প্রায় সমানভাবেই কোরাণশরীফে পুত্রকন্যাদের আর্থিক ও ব্যক্তি জীবনের অধিকার ও সামাজিক জীবনের অধিকার দিয়ে গেছেন। কিন্তু একটা কঠিন অবরোধের নিয়ম বন্ধনে সব বাঁধা আছে। মেয়েদের তার নিজের জীবনের ও কর্মেরও স্বাধীনতা নেই। বেশীর ভাগ স্থলেই সমাজের আদেশে মেয়েরা পুরুষ বা সমাজের কঠোর ইঙ্গিত ইচ্ছা-অনিচ্ছারই অধীন সর্বতোভাবে—হিন্দু সমাজের মতই। (কিন্তু এও কোথাও কোথাও বদলাচ্ছে। বদলাবে ক্রমে ক্রমে)। ("কোরাণ শরীফ" কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব প্রণীত)।

(২) অন্যটি হিন্দু কোড বিল। যা নিয়ে এত নারী আন্দোলন, হিন্দু কোড বিল পাশ, কত কি আমরা মেয়েরা উচ্চবর্ণেরা করলাম। এবং পেলাম হয়ত অধিকার কিছু।

কিন্তু সেটির সমস্যাও এক মুহূর্তে ঐ নাপিতকন্যা নিজে না জেনেই আমাকে চোখে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলে যে, ঐ সমস্ত অধিকার প্রাকৃতিক বিধানে নারীর পারিবারিক জীবনে জীবধাত্রী জীবনে যে কত কঠিন! কত অসার্থক! কত মিথ্যা হয়ে যায়! জননী জীবধাত্রীর মনকে সে ফেলবে কোথায়? বদলাবে

কি করে? প্রাকৃতিক নিয়মে নারীর জীবন যতটা মানুষের মর্ত অর্থাৎ পুরুষ মানুষের মত—ততটাই জৈব। অর্থাৎ সন্তানধারণ লালন-পালন জগতে তিনি জীবধাত্রী। এমনকি 'জৈব' অর্থে তিনি পৃথিবীর সব জীবজন্তুর মতই একটি প্রাকৃতিক স্ত্রীজাতীয় প্রাণী। মাতা জন্তু পশুজননীদের মতই তার জীবধাত্রীত্ব সে (কোনোকালে) অতিক্রম করতে পারবে না। পশুপাখীরা যা পারবে, পারে, তাও মানবজননী পাবে না। এও আবার ঐ সত্যেরই আর এক পরমতম সত্য। স্ত্রীপশুদের অল্পদিনেই সন্তানধারণ ও লালনেই প্রকৃতির ঋণ শোধ হয়। সভ্যতার বা মানুষের 'মনন' ঋণ নিষ্ঠতার দাবীতে। কিন্তু মানুষ-নারী চিরদিন তার দেহ মন অবসব পরিশ্রম কল্পনা-সাধনা নিজের বুদ্ধি সংকল্প সামর্থ্য অনুসারে দিয়ে চলে!

যে দেওয়ার শেষ নেই—(১) সারা জগত জুড়ে বিধাতার নিয়মে প্রকৃতিদেবী তার দেহ থেকে রক্তমাংস নিচ্ছেন সন্তানধারণকালে। (২) জন্মের পর নিচ্ছেন স্তন্য প্রাণধারণের জন্য লালনকালে। (৩) বড় হলে নিচ্ছেন জননীরূপিণীর বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য সেবা। দেহ ধারণকালে সে জীবধাত্রী। জন্মের পর লালনের সময় পোষিণী মাতা পোষিকা সেবিকা। পরেও পুরুষজগতের গৃহিণী জননী গৃহকর্ত্রী এবং সেবিকাও চিরকাল।

মানুষ নারী জীবেরও সমস্ত জীবনটা জীবধর্ম ও মানবধর্ম প্রকৃতির 'ছকে' ফেলা। দাবা খেলার ছকের মত রাজা মন্ত্রী গজ বাজীর খেলা প্রকৃতি বিধানের। কিন্তু আগাগোড়াই হারের পরাজয়ের খেলা তার যদি 'হার' মনে করি অবশ্য। বিশ্বনাথের মহা তাঁতশালায় মানুষ নারীস্বভাব আর প্রকৃতির বিধানের জৈব জীবধাত্রী নারীর স্বভাবের 'টানা পোড়েনে' বোনা মানুষ ও জীবধর্মের এক অদ্ভুত মিশ্র সৃষ্টি তারা। যেন মিশরের সেই রহস্যময় অর্ধপশু অর্ধমানুষের মূর্তির মত তার অস্তিত্ব। স্বভাবও হয়ত কতকটা। মানুষের মোহ লজ্জা সততা পশুর ভয় মূঢ় ভালবাসা সত্যমিথ্যাহীন প্রকৃতি সততা বোধহীনতা মিলে মিশে আছে।

ভাববার কথা, এই জগত জীবধর্মী জীবধাত্রীর শারীরিক মাতৃত্বের—আর পরে দীর্ঘকাল লালন-পালন ও ধাত্রীত্বের ভূমিকায়—মননজগতের কল্পনার সাধনারই বা অবসর কোথায়? আর মননজগতেরই শিল্প-সাহিত্য-কাব্য কলা সৃষ্টির কল্পনাশক্তিই বা কোথায় তাঁদের অবশিষ্ট থাকে! বিধাতার বিধানে প্রকৃতির নিয়মে জীবনের ও যৌবনের যে কোনো কর্মসাধনার শক্তি ক্ষমতাময় যৌবনের দীর্ঘ বর্ষ-মাস-দিনগুলি একভাবে যারা সন্তানদের ধারণ লালন পালন সন্তানের জন্য পারিবারিক জীবনের কর্তব্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শেষ করে খরচ করে দেয় প্রতি মুহূর্তে ইন্ধনের মত দেহের উনানে,—জীবধাত্রী জীবের মত পশুজগতের মতই (দেখা যায় পশুপাখী জননীরাও শাবক জন্মের পর প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই

শাবকদের সঙ্গ ছাড়ে না, নড়ে না। কেননা, সরে গেলেই তাদের শাবকরা মরে যায়; ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরুষ পশুদের দ্বারা, নয়তো অন্য জীবজন্তুর দ্বারা। পশু-মায়েরা অনাহারে ও আতুরেরই মত পড়ে থাকে। গৃহপালিত কুকুর বিড়ালদের দেখা যায়।) বিধাতার কঠিন নিয়ম মেনে চ'লে সেই স্বভাবকে সেই নিয়মকে অতিক্রম করে যাবার মত সামান্য শক্তিও তাদের থাকে না। তখন তাদের পুরুষের মত অপার্থিব বিশ্বজগতের মননজগতের মনোবিলাসের শিল্পসাধনার জন্য এতটুকুও শক্তি থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না।

॥ ৩ ॥

বহুদিন আগে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সাবজেকশান অব উইমেন' একটু দেখেছিলাম। বিলাতে নারীর অধিকারবাদের সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় বোধহয় সেই-ই মূলগ্রন্থ। তারপর মেয়েদের লেখা 'মেরী ভোলস্টেন ক্র্যাফট'-এর কিছু উচ্ছ্বসিত লেখাও চোখে পড়ে। কর্মে নারীর অধিকার আন্দোলনও এযুগেই আমাদের কালেই মিসেস প্যাংকহার্স্ট প্রমুখদের অনেকের নেতৃত্বে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) আগেই। তারপর অধিকার এলো ভোটের অর্থাৎ 'মানুষ' মনে করার। যুদ্ধের বিপাকে পুরুষ যুদ্ধে যাওয়ার কিছু কর্মজগতও হাতে এলো। শিক্ষার অধিকার তো ছিলই কিছুটা ওসব দেশে। অর্থ অর্জনেও কিছু ছিল। সম্পত্তি থাকলে স্ত্রীর তাতে অধিকারও এসেছে গত শতকেই।

কিন্তু পিছন দিকে যে কোনো দেশেরই যেটুকু মোটামুটি নারীজাতের কর্ম ও সৃষ্টির খোঁজ খবর পাওয়া যায়; এই সব অধিকারগুলো পাবার আগে বা পরে দেখতে পাওয়া যায় মেয়েরা সাহিত্যজগতে জর্জ ইলিয়ট, জেন অস্টেন, শার্লট ব্রন্তে প্রমুখদের সময়েও যেখানে ছিলেন আজো সেইখানেই আছেন। কোনো দেশের কোনো সাহিত্যেই এক পাও এগিয়ে যেতে পারেন নি। বরং তাঁদের অনেক আগে অশিক্ষিতা বালিকা দেশ জাতি-প্রেমিকা জোয়ান অব আর্ক বেরিয়ে গেছেন ফ্রান্সে। যাদের কিছু আগে পরে কারাগার জীবন সংস্কারে এলিজাবেথ ফ্রাই সমাজসেবায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইংলণ্ডে।

কিছুপরে অন্য ক্ষেত্রে আঠারো শতকেই অসামান্য বৈজ্ঞানিকসম্পন্না প্রতিভা নারী ম্যাডাম কুরীকে আমরা পেয়েছি। বিজ্ঞানজগতের শিক্ষা নিয়ে পোল্যাণ্ডে।

আমেরিকান সাহিত্যে অসাধারণ নারী-লেখিকা মিসেস হ্যারিয়েট বীচার ষ্টোর এর দেখাও পাওয়া গেছে। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষায় কর্মের জ্ঞানের ক্ষেত্র তখন এত প্রসারিত হয় নি তবু তাঁদের পাওয়া গেছে (একালে পার্ল বাককে পাওয়া গেছে।) তবু মনে জাগে শিক্ষা ও অধিকারের প্রসারে তার পরেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো এমন মেয়ে সাহিত্যে কলায় ধর্মে বিজ্ঞানে কারুকে বিরাটভাবে নতুন ও বিশেষভাবে পাওয়া গেল না কেন? সেকসপীয়ারের মত, গেটের মত, হিউগোর মত, টলস্টয়ের মত, ইবসেনের মত অনেক না হোক একটি রচনা একখানি বই নিয়েও। পৌরাণিক যুগের বিদেশের কথাতেও পাওয়া যায় না কোনো তেমন

নারী। যাদের হাতের নরনারী বিশেষ করে নারীচারত্র অমর ও জীবন্ত চিরকালের পাওয়া যায়।

আমাদের দেশেও পুরাণের ব্যাস, বাল্মীকি থেকে পরে কালিদাস জয়দেব তুলসীদাস ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম তার পরে প্রাকৃত বৈষ্ণবকবিদের মধ্যেও কোনো নারীর সৃষ্টির চিহ্ন পাওয়া যায় না। সৃষ্টি বলতে আমি মহৎ ও বৃহৎ বিরাট সৃষ্টির কথা বলছি। তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। অজন্তার ইলোরার গুহা চিত্রের জগতেই হোক, পুরী কোণার্ক খাজুরাহো বা দক্ষিণে মন্দিরের ভাস্কর্যেই হোক, আর ধর্ম দর্শন কাব্য সঙ্গীতকলাতেই হোক, স্রষ্টা নারী বলে কোনো মেয়েরই পরিচয় সেখানে নেই।

কিন্তু ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ও হাজার হাজার বছর অন্তর একটি করেই তো আসেন এবং ভারতেও তাঁরা যুগে যুগে একজন করেই রয়েছেন! তাই দেখা যাবে বিদেশের ইতিহাসেও। দলে দলে বিরাট, মহৎ বিশেষ স্রষ্টা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন না। কোথাও সেক্সপীয়ার ইংলন্ডে একটিই। গেটে জার্মানীতে একজনই। টলস্টয় রুশদেশে একজনই। নরওয়েতে ইবসেনও একজন। আজ অবধি একটি করেই মাত্র রুশো ভলটেয়ার ভিকটর হিউগো একজন করেই। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘকালের যুগ যুগান্তের কোটি কোটি ছোট বড় মহৎ ক্ষুদ্র পুরুষ মানুষের রচনায় প্রেরণার সাধনার উৎস তাঁদের পিছনে ছিল; তাঁদের প্রতি মুহূর্তেই সেই প্রেরণা কল্পনা আহরণ করিয়েছে। সেই ভোগবতী গঙ্গার উৎস থেকে স্রোত থেকে প্রাণ প্রবাহ পুষ্ট করেছে।

এখনো পুরাণের যে কোন পাতাতেই দেখা যাবে, 'পূর্বে মহর্ষিরা মুনিঋষিরা এই কথা বলে গেছেন।' 'বেদ উপনিষদেও এই কথা আছে।' 'যোগী তপস্বীরা এই উপলব্ধি করে গেছেন।' সকলেরই এই পূর্বসূরীদের উদাহরণ দিয়ে।

সব দেশের পুরাণেই এই পিছনের অতীতের কর্ম ধর্মই আবার নতুন প্রেরণা জাগায়। তাই থেকেই আবার বিরাট মহৎ জন্ম নেন। অতীতই বর্তমানকে নতুন করে সৃজন করে। পুরাতন নতুন আকারে আসে কবি ঋষিরাও বলেন।

সেই অনুসারেই আমাদের মেয়েদের ও নারী জাতির পিছনের কালে অতীতের যে ঐতিহ্য কি সেইটাই আমাদের দেখতে হবে। যা আমাদের জন্য পথ সৃষ্টি করবে অথবা পথ দেখাবে।

পুরাণেও আমরা যেসব ব্রহ্মবাদিনী আর সাধারণ গৃহসংসারের গৃহিণী নারী পেয়েছি তাদের মাঝেই আমাদের সত্যি আদর্শ আর সেই পথেই পথ খুঁজে পাব আমার নিজের মনে হয়।

পুরাকাল থেকে একাল অবধি যত মহাকবি মহান বিরাট স্রষ্টা জ্ঞানী পুরুষের দেখা পাই তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা পূর্বতন মহামানবদের কাছেই তাঁরা পেয়েছেন। এই দেখে মনে হয় মেয়েদেরও বুঝি তাঁদের সেই পূর্বগামিনীদের

পথেই তাঁদের সৃষ্টির বা কর্মের পথ আছে (পুরুষের পথ তাঁদের জন্য নয় বুঝি)। আমরা দেখতে পাই জনকের বা যাজ্ঞবল্ক্যের সভায় সুলভা বাচক্নবী গার্গী প্রমুখ ছিলেন তর্কবিতর্কে জ্ঞানমার্গী সুপণ্ডিতা তেজস্বিনী বিদুষী নারী। দেখতে পাই যাঁরা মহাজ্ঞানী পুরুষের সঙ্গে তর্ক করতে বাদানুবাদ করতে সাহস রাখতেন। পুরাণে একমাত্র নারী হলেন মৈত্রেয়ী। যাঁকে দেখতে পাই অতীন্দ্রিয় রহস্যময়ের অচিন্ত্য জগতের অমৃত সন্ধান করেছেন। যিনি নচিকেতার মত ব্রহ্মবিদ্যা চেয়েছেন। একজন নারী। মদালসা, চূড়ালা, দেবহূতি, অনসূয়াও এই পর্যায়েরই নারী। কিন্তু ঐ অবধিই তাঁরা পৌঁচেছেন, তার বেশী নয়। এই তেজস্বিনীরা এবং রাজরাণী রাজকন্যা অসাধারণ ও সাধারণ নারীদের প্রায় সকলেরই কিন্তু একটি বিশেষ আদর্শ ছিল চরিত্রের নির্মলতা। পবিত্রতা—দেহের ও মনেরও। কিন্তু সকলের ওই 'বিশেষ' মানুষ। 'বিশেষ' নারী। বিশিষ্ট মাত্র—বিরাট নয়।

কেউবা রাজকন্যা, স্বয়ংবরা হয়েছেন। সম্প্রদত্তা হয়েছেন। অন্যত্র জোর করে হরণ করাও ছিলেন।। সাধারণ ক্ষেত্রে মনে হয় সবাই সম্প্রদত্তাই হতেন পিতা ভ্রাতার দ্বারা।

কিন্তু সব নারীরই আদর্শ ছিল সত্য ও পবিত্রতা এবং এটাও দেখা যাবে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সর্বত্রই সেকাল থেকে একাল অবাধ নারীর আদর্শ হ'ল দৈহিক পবিত্রতা, পারিবারিক পবিত্রতা, ধর্মীয় পবিত্রতা, সামাজিক পবিত্রতা। আদিম সমাজেও এই একই আদর্শ। খৃষ্টধর্মও সেণ্ট ক্যাথারিন সেণ্ট টেরেসা সেণ্ট জেনেভি (রাণী) সেণ্ট মার্গারেট অসংখ্য মহিলারা অধ্যাত্ম সাধনায় আজো সমুজ্জ্বল এবং এই নারীর পবিত্রতার উপরই দাঁড়িয়ে আছে সন্তান, পরিবার, সমাজ। পৃথিবী সৃষ্টি। ধর্মজগত। আর তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছেন সমগ্র মনুষ্য সমাজ, তাঁর জ্ঞানপ্রতিভা প্রজ্ঞা সাধনার প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মাতার জীবনই তার ভিত্তি—পিতার নয়। জননী দেহের সার অংশ জীব-জীবনের প্রাণ সার।

এ থেকেই বোঝা যাবে নারী সর্বস্ব দান করে দিয়েছেন পৃথিবীকে এবং এই দানেই দেখা যাবে সব নারীই 'বিশেষ' হয়েছেন 'বিশিষ্ট' হয়েছেন। বিশাল বা বিরাট কখনোই হতে পারেন নি নিজের নিজের কর্ম ধর্ম জ্ঞানের বুদ্ধির ক্ষেত্রেই। কারণ যাঁর মৃত্যুর অবসর নেই কর্মজগতে তিনি বিরাটের সাধনা তাই কখন করবেন। তাই এটাও পরম সত্যই চিরদিন রইল জগতের ইতিহাসে কোথাও কোনখানে এক দিনের জন্যও একটিও নারী মননজগতে বিরাট কিছু হন নি। বিরাট কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি। মহৎ কীর্তিময় সাহিত্য বা শিল্প-সৃষ্টি করতে পারেন নি। কারণ জীবনের সমস্ত অবসর কর্ম দেহের রক্ত মাংস মন অস্তিত্ব তাঁর তিলে তিলে দিকে দিকে নিবেদন করে দিতে হয় সন্তানের মধ্যে। জীব-ধাত্রীত্বের কাজে। জৈবসৃষ্টির কাজে।

কোথায় পাবেন সেই অখণ্ড অবসর পুরুষদের মত—সঙ্গ, সঙ্গী, জ্ঞান, সাধনা, কল্পনা, চর্চা ও দেশ দেশান্তর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও আনন্দ অর্জনের নানাবিধ সুযোগ—বিশাল বিপুল যথেচ্ছ সুযোগ। 'সং ও অসং' হবার 'ভালোমন্দ' দুই-ই হবার। প্রকৃতি তাঁদের সে অবসর দেয় নি। সমাজও দিতে পারবে না তাই এবং অভিভাবকরাও দেবে না ওই একই কারণে। সবচেয়ে বড় কথা হল মেয়েরা নিতেও পারবেন না। নিতে গেলে হয় অরক্ষিত কুমারী জীবন, নইলে নিঃসন্তান বৈধব্য বন্ধ্যা খণ্ডিত জীবন অথবা সমাজবহির্ভূত গণিকা নারীর জীবন-যাত্রা তাঁর নিতে হবে।

অত মূল্যে মেয়েরা এই প্রতিভা অর্জনের 'স্বাধীনতা' কিনতে পারবেন না। কিনলেও বিশেষ কিছু লাভ হবে না। স্বাধীন সৃজনপ্রতিভার মনের ও আনন্দময় মুক্তি তাতে পাওয়া যাবে না। মুক্তিতেও সংযমের বন্ধন লাগে। পুরুষের গায়ে বন্ধনের দাগ হোঁয় না প্রকৃতির করুণায়।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে এইচ জি ওয়েলস-এর আত্মচরিত দ্বিতীয় ভাগে একটি উক্তি ছিল। কোনো নারী আত্মা যাকে (?) তিনি বলেন "যতদিন না তোমরা নিজের দেহের কর্তৃত্ব নিজেরা না পাচ্ছ ততদিন তোমরা স্বাধীন হবে না। তোমাদের কোনো অধিকার পাওয়াই সার্থক হবে না··· ।" এই ধরনের উক্তিটি অনেকদিন আগে পড়া। ভাবটা মনে আছে, ভাষাটা মনে নেই। পড়ে তখন আশ্চর্য হয়ে মনে হয়েছিল লেখক কিভাবে এবং কেন ও কথাটা বলেছেন! দেহের ওপর কর্তৃত্ব বলতে কি বোঝায়? স্বৈরাচার? গণিকার মত? যাদের জীবনযাত্রা জীবধর্মী—সামাজিক নয়। যথেচ্ছাচার-পুরুষের মত? যাদের গায়ে যথেচ্ছাচারের 'দাগ' লাগে না। 'যথেচ্ছাচারে'র দায় কলঙ্কভার (অবৈধ সন্তানভার) বহন করতে হয় না।

দেহের দায় মেয়েদের বড় দায়। ভগবানের বিধানের দায়। প্রাকৃতিক বিধানের দায়। প্রাকৃতিক নিয়মে জীবজগতে এ দায় আছে। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব নেই পশুপাখী জীব জননী জীবধাত্রীর এবং সে জগতে পুরুষ জীবদের মোটেই কোন দায়িত্ব বা দায় নেই লালন পালন বা ধর্ম কর্ম হিসাবে। অনেক সময়ে কিছু পুরুষজীব নারীজীবকে সাহায্য করে। বেশীর ভাগই করে না। যারা করে তারা পাখী জাতীয় জীবেরা—দেখতে পাওয়া যায় সাহায্য করে থাকে। শ্বাপদ জন্তুরা প্রায়ই করে না। গরু ছাগল মেষ ঘোড়া ইত্যাদিরা শাবকের রক্ষণা-বেক্ষণ মোটেই করে না। বানর জাতীয় প্রাণীরা ও হাতিরা সাহায্য করে। যূথবদ্ধভাবেও করে। হিংস্র শ্বাপদ জন্তুরা মাংসাশী জন্তুরা প্রায়ই সন্তানদের খেয়ে ফেলে—শাবককালে দেখা যায়। কাজেই মানবেতর জীবে সন্তানের রক্ষা শুশ্রূষার সব দায়িত্বভার জীবজননীদেরই নিতে হয়। পুরুষ জীবের কোনো দায়িত্ব নেই।

এই সম্পর্কে ৬০ বছর আগে নারী অধিকার আন্দোলনকারিণী এলেন কী ও তাঁর 'নারী' নামক গ্রন্থে কিছু আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল মোটামুটি এক জায়গায় যে প্রাকৃতিক বিধানে জীবজগতে মাতৃতন্ত্রই চলে এবং মাতাই সন্তান বা শাবকের সব দায়িত্বভার নেন। তাঁর একথা তাঁর অধিকারবাদ সম্পর্কের আলোচনায় একটা বিশেষ উক্তি ও মতবাদ—মাতৃতন্ত্র সম্পর্কের উক্তি। মাতৃতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র দিয়ে তিনি নারী জাতির কাজ বিধাতা নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের আলোচনা করেছেন—জীবজগত ও মানবজগত নিয়ে। সেকথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। বক্তব্য তিনি স্পষ্ট করে তুলতে ও বিচার করতে পারেন নি। আমার মতে তার কারণটা হল, তিনি জীবের জীবধর্মের আর মানুষের মননধর্মে যে মানবী মাতা ও জীবমাতার 'আকাশপাতাল ভেদ' আছে সেটাও বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সেই জটিলতার জাল খুলে ভেদ করে দিয়ে সর্বদিক দিয়ে দেখেন নি। দেখলে অবশ্য দেখতে পেতেন।

মাতৃতন্ত্র সমাজও—এখনো যা ভারতবর্ষে আছে কিছু জায়গায়—কিন্তু কাজ ও রক্ষা পুরুষ ছাড়া চলে না। যার জন্য মাদ্রাজে কোথাও কোথাও মামা-ভাগ্নী বিবাহ। মামাতো পিসতুতো বিবাহ। যেটি ইসলাম সমাজেও ঐ একই সম্পত্তি লাভের জন্য আছে। যার জন্য মা ও কন্যার সম্পত্তিতে অধিকার থাকলেও সেটা আর্থিক অধিকারের দায়িত্বভার পুরুষদের হাত ছাড়িয়ে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। অথচ দেখা যাবে এই অধিকার যদিও কোনো মহৎ বা বৃহৎ কিছু কর্ম ও কীর্তি মেয়েদের হাতে সৃজন করতে পারে নি। উপরন্তু অতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্ত্রীসমাজে মাতৃতন্ত্র সমাজে প্রায় পুরুষও কর্মকীর্তি প্রতিভার জগতে বড় হতে পারেন নি। আর্থিক অধিকারের দ্বন্দ্ব মামা-ভাগিনা জামাতা দৌহিত্রদের ঘিরে চলে। সবশক্তি ক্ষয় হয়ে যায়? বর্মার কথা যেটুকু জানা গেছে গল্পাদিতে তাতে মনে হয় পুরুষসমাজে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কম। নারীর প্রবলতার অপর পক্ষে মাতৃতন্ত্র সমাজ মাতা দুহিতাকে অর্থ দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে, সাম্য দিয়েছে, কিন্তু মানুষের মননজগতের মহৎ ক্ষেত্রে পৌঁছে দিতে পারেনি। তার কাছে সেই উক্তিটাও সত্য হয়ে উঠেছে মনের চোখের সামনে যে "শুধু খাদ্যে (মানুষের চিত্ত) মানুষ বাঁচে না। শুধু বিত্তে মানুষ তর্পণীয় হয় না। মর্ম (রামায়ণ উপনিষদ।)

সকৌতুকে চুপি-চুপি ভাবতে বসে তাহলে নারী অর্থ মানুষ অথবা মানুষই নয়—জীব মাত্র।

॥ ৪ ॥

নারী অর্ধমানুষ অথবা মানুষ নয়, জীব মাত্র? ইতিহাসে সে প্রশ্নের মেলে না উত্তর।

যেখানে যেটুকু পুরাণে কাহিনী-ইতিহাসে মহীয়সী নারীদের যেটুকু দান ও কথা পাওয়া যায় তা থেকে আমরা যেটুকু তাঁদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাই, দেখতে পাব তা সর্বত্রই কোনো একটি মাত্র বিশিষ্টতা নিয়েই তাঁরা মহীয়সী ও বড় হয়েছেন। বহুমুখী নানা বিষয়ের প্রতিভা বা সৃজনশক্তি তাঁদের মধ্যে দেখা যায় নি। যায় না।

অবশ্য পুরুষ স্রষ্টাদেরও সেদিক দিয়ে দেখা যায় যেমন কাব্যে সাহিত্যে যিনি বৃহৎ মহৎ স্রষ্টা তিনি বিজ্ঞান ইতিহাসে চিত্রকলায় বিশিষ্ট কেউ নন।—কিন্তু তাও আছেন যেমন চিত্রশিল্পী ভাস্কর কবি লেখক লিওনার্ডো দা ভিন্‌চি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখরা।

কিন্তু বার বারই নারীর মনের ইতিহাস ভাবতে গিয়ে আমাদের যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই: (১) জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সাবজেক্‌শন অব উইমেন' মতানুসারে তাঁদের সকল বিষয়ে পুরুষের অধীনতা মুখাপেক্ষিতা তাঁদের মনোজগতকে কর্ম ও ব্যবহার জগতকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাঁরা অধীন বলেই ভীতত্রস্ত ভাবেই সর্বত্র সঙ্কুচিত জীবন ধারণ করেন। এই বইয়ে প্রায় সবটাতেই বিদেশের সামাজিক জীবনের অধিকার-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আমরা তা থেকে পাচ্ছি—(ক) ভীতত্রস্ত মানুষের 'সত্য' বলার বিচার করার সাহস থাকে না। এই মহা-সত্যটি। (খ) 'সত্য' উপলব্ধি না করলে সৃজন পঙ্গু ব্যর্থ হতে বাধ্য। অসার্থক হবেই।

(২) ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর 'এ রুম অব্ ওয়ানস্ ওন' (A room of one's own)-এ বলেন নিজের নিজস্ব ঘর ও নিজের নিজস্ব 'অর্থ' না থাকাই নারীর প্রতিভার স্ফুরণের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তাঁর লক্ষ্য নারীজাতির সাহিত্য-কলা সৃজনপ্রতিভার আলোচনা। নিশ্চয়ই সেটাও আর একটা খুব বড় দিক। (ক) কিন্তু যাঁরা 'নিজের ঘর ও অর্থ' নিজস্ব করেই পান সমাজের অনুশাসন নিয়মে (যেমন ইসলাম সমাজে) তাঁদেরো অশিক্ষায় বন্দী প্রাকার ক্ষোভ অভিযোগ রয়েছে, আছে। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ কাজের স্বাধীনতা না থাকাই নিজ গৃহে ঘরে বসেও তাঁদের প্রতিভা ও জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্র পায়নি। (খ) সেই নিম্ন সমাজের মেয়েটির—যার ঘরে ও বাইরে সব অধিকারেই আছে এমনকি স্বেচ্ছাচারের

ও দৈহিক স্বৈরাচারের অধিকারও নিতে পারত। কিন্তু তার মাতৃভাষা সংস্কারগত জন্মগত সততা পবিত্রতা, রুচি, সেই যথেচ্ছাচারের অধিকার নিল না এবং দেখতে পাই তাদেরও কারুর অশিক্ষিত গ্রাম্য প্রতিভারও বিকাশ হয়নি। যা ওই স্তরের যা ওই শ্রেণীর পুরুষ গ্রাম-কবি গ্রাম-শিল্পীতে পাওয়া যাবে। এখানেও ঐ দুটি সত্তার আর একদিক দেখতে পাব।

(৩) এখনকার দিনে এযুগে প্রতীচ্যে প্রায় সর্বত্রই মেয়েরা সামাজিকভাবে খুব স্বাধীন যেমন আমেরিকায় মেয়েরা। বিবেকানন্দের উক্তিতে আজ থেকে ৭৫ বছর আগেই ঊনিশ শতকেই সাত আট দশক আগেই তাঁদের নির্মলতার গুণের সততাই করুণার মমতায় স্বাধীন কর্মের প্রেরণা ও কাজের চিত্র পাই, কিন্তু আজ অবধি তাঁদের মাঝ থেকেও কোনো বিরাট শক্তিশালিনী স্রষ্টা নারী সাহিত্যে দর্শনে চিত্রে ভাস্কর্যে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের বিজ্ঞানের শিল্পের সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই এখনো পুরুষই প্রথম ও প্রধান হয়েই সৃজনজগতে সব জায়গায় আছেন। য়ুরোপেও প্রায় দু'শতাব্দী ধরে মেয়েরা অনেক অধিকারই পেয়েছেন; লেখিকা সাহিত্যিক কবিও দেখা গেছে; তবু সেই পুরুষের অনুকারী সাহিত্য কাব্যশিল্পেই তাঁরা রয়ে গেলেন এবং আছেন।

বৃহৎ বা মহৎ, কুটিল, খল, বর্বর, ইতর—কোনো রকমই পুরুষ চরিত্রে তো তাঁরা সৃজন করতেই পারেন নি। আশ্চর্য এই যে, বিশিষ্ট ভালোমন্দ নারী-চরিত্রও দেখাতে লিখতে পারেন নি। পুরুষ সম্বন্ধে যথেচ্ছ উক্তিতে লজ্জা ভয় থাকতে পারে, কিন্তু নারীর স্বজাতি সতী ও গণিকা নারীচরিত্র? উল্লেখ্য এই যে তাঁরা পুরুষ-চিত্রিত সতী চরিত্রের 'নকলনবীশী'ই করেছেন, তাঁদের রচিত অহল্যা দ্রৌপদী তারাদের নকল করেন নি। এরপর আমাদের ধারণা হয়েছে ব্যাস বাল্মীকির মত মহাকবি মহামানব বিরাট স্রষ্টা মেয়েদের মধ্যে যেমন কেউ হন নি, কেউই হতে পারবেন না কোনো যুগেই। তার দাম অনেক। সে দাম সে মূল্য দেবার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য, অন্তরের সেই মহাঐশ্বর্য (ঈশ্বরত্ব, প্রভুভাব, স্বাধীনতা)। কল্পনা সৃষ্টির ঐশ্বর্য। অন্তরের মুক্ত জগত মেয়েদের নেই। প্রসঙ্গতঃ নিবেদিতার একটি উক্তি উদ্ধৃতি করি, তিনি এক জায়গায় বলেছেন "...এ চাইতে গেলে তার আর বিয়ে করা চলে না..." ('লোকমাতা নিবেদিতা' থেকে, ৫১১ পৃঃ)। সে দাম সে মূল্য হ'ল সমস্ত জীবন দেহ মন প্রাণ। যে শক্তি দিয়ে পুরুষ সাধনা করেন অবলীলাক্রমে তাঁর দেহ মনের জীবনের কিছু ত্যাগ না করেও এবং করেও, ক্ষয় না করেই গৃহ-পরিবার-সন্তান। মেয়েদের মন-মনন দেহ জীবনযাত্রা একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে বাঁধা জড়ানো। তার মহা বাধা অন্তরায় হ'ল তার নারীজীবন। তার কিছু সৃজন করতে হলে এই জীবনের অনেক কিছুই বাদ দিতে হয় এবং সেটা বাদ দেওয়া চলে ধর্ম জগতেই। অনেকে সে সাধনা করেছেন। শিল্পকলা সাধনার জগতে তা সম্ভব হয় না। পুরুষ স্রষ্টার জীবনের

ভার নারী তুলে নেয়। নারীর সেই ভার পরিবার সন্তানের কি নিতে পেরেছে পুরুষ?

(১) ভার্জিনিয়া উলফের একখানি ঘর আর কিছু অর্থ নিজস্ব পেলেও তাতে 'প্রতিভার জায়গা হবে না। মহৎ বৃহৎ 'প্রতিভার' জন্য চাই অনন্ত আনন্দ। অনন্ত মুক্তির স্বরূপ ধারণা ও সাধনা। অনন্তকালের ধারণা শক্তি চাই যা অনন্তকাল দেহের সীমার মধ্যেই পুরুষ উপলব্ধি করেন। কিন্তু মেয়েদের সেপথ দুর্গম দুরূহ। সেপথে তাঁর জন্য হয় না নিজের ঘরের কিছু লোকসঙ্গের স্বাধীনতা পাবেন এই মাত্র। শ্রদ্ধা পাবেন না। না মেয়েদের না পুরুষের, না নারীর। পুরুষের সঙ্গ বন্ধুত্ব পাওয়া যাবে মাত্র। হয়ত ক্ষতি হয়ে যাবে (তাদের 'ঘর' তাদের জন্য আছে। মেয়েদেরও বন্ধুত্ব প্রায়ই পাবেন না)।

কারণ তাঁদের অবসর নেই এবং স্বাধীনভাবে থাকা স্বাধীন নারীকে মিলিয়ে নিতে ঘরের নারীরা পারবে না, এবং যদি সে নারীর গৃহ সন্তান স্বামী পরিজন না থাকে, মনে মনে সে নিজেও ব্যর্থ অসার্থক হবেই; এবং তাকে সমাজও 'ব্যর্থ অসার্থক' মনে করবেই। ধর্মজগত ছাড়া অন্যত্র করবেই। কেননা ধর্মের কথা হল ত্যাগ। অন্যত্র সেও নিজেকে অসার্থক মনে করবেই। কেননা দুদিকে খরচ করবার মত মানুষের প্রতিভা থাকতে পারে না।

(২) ইসলাম সমাজের সমস্ত মৌলিক অধিকারের পাশে একটি মাত্র অনধিকার। সেটা যেমন বিপুল তেমনি কঠোর; বাইরের জগতে মেশার অধিকার না থাকা। কাজেই তাতে তার জ্ঞানের স্বাধীনতার বিপুল পিপাসা আকাঙ্ক্ষা মিটবে না। বন্ধন তো থেকেই গেছে। রয়েছেই।

(৩) নিম্নস্তরের সমাজের সেই নাপিতানী নারীর সব অধিকারই ছিল। জীবিকা অর্জন। বিবাহিত জীবনের স্বাধীনতা। নিজেই নিজের প্রভু। তবু সন্তানের বন্ধন নারীর স্বাভাবিক মনের পবিত্রতা সততা সতীধর্ম তার যথেচ্ছাচারে বিতৃষ্ণা এনেছিল। সেও পবিত্রতা ও আদর্শের পথেই সার্থকতা খুঁজেছে। কিন্তু মানুষের মনটি তার মনে মনে কোথায় ব্যর্থ অসার্থক হয়ে আছে ('হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে?' সেই সার্থকতা)।

(৪) এইচ. জি. ওয়েলস-এর উক্তির মর্ম যেটুকু আমি বুঝেছি তাতে তাঁর বক্তব্য আমার মনে হয়েছে মেয়েদের 'ইচ্ছার স্বাধীনতা'। সমাজের নিয়মের যে সতীত্ব ও পবিত্রতা তাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার ও না করার তাকে অতিক্রম করারও নিজের দেহের উপর স্বাধীনতা। সেটা কি করে হয়—ত্যাগে বা ভোগে —কৌমার্য ব্রহ্মচর্যের পথে, না স্বৈরাচারের পথে? অথবা সমাজ স্বামী সন্তান মেনে একটা কোনো মীমাংসা? যা চলেছে চলছে তার আপোষ রফা? সেটা একমাত্র শ্রদ্ধা পরস্পর আর প্রেমের ভালবাসার পথেই সম্ভব। বলা ভালো, তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট হয়নি। লেখকও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন নি তার সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

এতদিনেও যতদূর আমার মনে আছে এইটুকুই। নরনারীর দেহ সম্পর্ক ভোগ সম্বন্ধে স্বাধীনতাতে পুরুষ ও নারীর তুলনীয় হওয়া সম্ভব নয়। সেটা প্রাকৃত জগতে পশু জগতে জগতে হয়। মানব জগতের যে মনন বন্ধন যে সমাজ বন্ধন যে সন্তান বন্ধন আছে তাতে তা কখনোই সম্ভব হয়নি। কদাচ হলেও থাকেনি মেয়েদের পক্ষে। তা হতে গেলে নারী পশু জন্তু জগতের প্রাণী হয়ে যেতে বাধ্য। নারীরও মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তাই তা হতে পারে নি।

এরপর মনে করে নেওয়া যাক কি কি বাধা অন্তরায় মেয়েদের মননজগতের সৃজনক্ষেত্রে হয়ে থাকে, হয়। মেয়েদেব জীবনযাত্রায় • মননবস্তুব সৃষ্টির প্রথম বাধা ঃ (১) তার স্থিতিহীনতা। চির জীবন তার জীবনযাত্রা আশ্রয় পাওয়া আর আশ্রয়চ্যুতির কাহিনীতে বোনা থাকে আগেই বলেছি। দুহিতা নারী, পত্নী গৃহিণী নারী, বিধবা জননী বা বিধবা নিঃসন্তান নারী, কোনোদিনই কারুর ঘর দুয়ার নেই স্বাধীনভাবে থাকাব জন্য। বনবাসী ব্যাস বাল্মীকিদেরও স্বাধীন জীবন যা ছিল, যা লোকের থাকে, মেয়েদের পৃথিবী ভরা নাবী জাতি মেয়েদের কারুর তা নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্নবস্ত্রদাতারও বদল হয়। পিতা, পতি, পুত্র বা অন্য কেউ থাকে না। আশ্রয় অন্ন প্রশ্রয় পরিবেশ ও থাকবার ঠাঁই না থাকলে তার যে কোনো কাজের সাধনা কল্পনার ক্ষেত্রও মানুষের পঙ্গু সংকীর্ণ হয়ে যায়, শক্তি থাকে না। যত বড় প্রতিভাই থাক না সে শক্তি রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান হলেও তার স্বচ্ছন্দ পরিবেশ প্রশ্রয় না থাকলে চিন্তাহীন অর্থ আর সম্পদ না থাকলে, দেশবিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাওয়ার সুযোগ না থাকলে তাঁরও অত বিরাট সর্বোতোমুখিতা লাভ করা কঠিন হত। তাঁর প্রতিভাতে ওই কারণগুলির আনুকুল্য যথেষ্ট ছিল। পাবিবারিক নানা দায়দায়িত্বও ছিল না তাঁর।

দ্বিতীয় প্রবল কারণ হল ঃ (২) প্রাকৃতিক বিধানে নারী জীবধাত্রী। জীবকে দেহে ধারণ করেন বারে বারে। বহু সন্তানের মা হলে পরেও দীর্ঘকাল ধরে লালন করেন। তারপরে দীর্ঘ বর্ষ মাস ধরে তারপরও তাদের সংসারধর্মের পালনকর্ত্রী পালিকা হয়ে গৃহপালিনী হয়ে থাকেন। যতদিন না সেই পুরুষ সন্তানের জন্য আবার একটি নারী এসে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দায়-দায়িত্ব নেন, এবং একটি পুরুষ এসে সেই কন্যা সন্তানকে নিজ গৃহে নিয়ে যায়।

যদি কোনো নারী সাহিত্যিক বা শিল্পী কর্মী হন তাঁকে শিশুটির লালন ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে উঠে আসতে হয়। কাজের ব্যাঘাত হয়। বাধা হয় লেখাপড়ার কাজে, শিল্পকাজে, গৃহ কাজকর্মে। যদি চিত্রকরী হন ছবি তুলি রং ফেলে আসতে হয়। যদি গায়িকা নর্তকী হন (ইসাডোরা ডানকান স্মরণীয়)- সে ক্ষেত্রেও বাধা থাকেই। সবার ওপর থাকে যদি শিশুদের একটি কেউ অসুস্থ হয় সব সাধনা মাথায় ওঠে। যদি ক্ষুধার্ত হয়, দুরন্ত হয়, পীড়িত বিপন্ন হয়, সব কাজ ফেলে সামলাতে হয়। পিতাদের এ দায় নেই। নারীর

এই সঙ্গে পারিবারিক গৃহধর্মও পালন করতে হয়। বহু সন্তানের জননী যাই হোন নারী,—তাঁকে সন্তান ধারণ করা জৈব জীবজগতের প্রাকৃতিক বিধান ছাড়াও —মানব জগতের জীব জননীর কর্তব্যের দায়িত্ব এবং দায় চিরদিন বহন করতে হয়। বহু পরে প্রৌঢ়ত্বে যখন অবসরের দিন আসে তখন শরীরে দেখা দেয় বার্ধক্য, জরা, অক্ষমতা। কল্পনার জগতে মন জড় পদার্থের মত হয়ে যায় সংকীর্ণ কেন্দ্রে বাস করে। যৌবনের স্বপ্ন মুছে গেছে। অবশিষ্ট জীবনের সে সময়ে জরাগ্রস্ত মনে একমাত্র ধর্ম-আনুষ্ঠানিক বা আধ্যাত্মিক সাধনা ভাবনা কিংবা মৃত্যুভাবনা ছাড়া আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। যা আমরা মৈত্রেয়ীতে পেয়েছি। বহু সাধিকা জীবনেও পাওয়া গেছে।

তখন নারীজীবন কর্মক্লান্ত। পরিবারে অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব। অবজ্ঞাত উপেক্ষিত জরাগ্রস্থ জননী ও গৃহিণী। যিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি শরীরের পোষিকা শক্তি দিয়ে "জীবধাত্রী" ধর্ম পালন করে এসেছেন, শিশু জন্মের পর হৃদয় মন দিয়ে পরিবারের এবং শিশুর সেবা স্বাচ্ছন্দ্যের কাজ করেছেন, নিজের কথা ভাবার কল্পনা করারও অবসর ছিল না যাঁর সে সময়ে, সেই জীবধর্মী জীবধাত্রীদের পৃথিবীর জীবধর্মের ঋণ শোধ করার পর আর শক্তি কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মনের সাধনার জন্যও নয়, শরীরের শক্তির ও কাজেরও নয়। তখন স্থবির তাঁরা ধর্মজীবন ছাড়া আর কিছু সামনে খুঁজে পান না। যে জীবনধারায় শেষ ফল দেখতে পাওয়া যায় দেশে দেশের সাধিকা তপস্বিনীতে এবং অন্যত্র মূঢ় নির্বোধ সংশয়ী হতাশ নিরাশ কিংবা স্থূলদৃষ্টি নারীর দলে। এই হোল প্রাকৃতিক বিধানে নারী জীবনের চিত্র।

আসলে নারী স্বভাবের জৈব ও অজৈব দুটি দিক যে একবার পুরুষের অজৈব ও জৈব দিকের চেয়ে স্বতন্ত্র পৃথক সেইটাই আমাদের দেখা ও বোঝা হলেই আমরা আমাদের অবিশেসত্ব ও বিশেষত্ব, ক্ষুদ্রত্ব ও বিরাটত্ব দিকগুলোর কারণও বিশেষত্ব খুঁজে পাব।

পুরুষের জীবসত্তা জীবধর্ম মেয়েদের জৈবসত্তার চেয়ে একেবারে পৃথক। মেয়েরা যখন সন্তান লালন ও পালনে জীবধর্মী তখনও তাঁদের একটি দেহাতীত মাতৃভাবের জীবনযাত্রা মনোধর্ম, তাঁদের জৈবজীবনকে অতিক্রম করে যায়। যেমন পুরুষের উগ্র ইন্দ্রিয়মন জীবসত্তা অনায়াসেই মনোজগতের আদর্শ ইন্দ্রিয়াতীত রসে তাঁকে বিরাট সৃজন.লোকে নিয়ে যায়।

যদিও উভয়েই মনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। সেই এক হলো প্রেমের আনন্দের প্রেরণা—মনের সৃষ্টিই হোক অথবা দেহের সৃষ্টিই হোক।

একটি আনন্দও প্রেমের রসই দুজনের মূল কথা। এই থেকে তার স্বভাবের মূল সূত্রটি খুঁজে পাব আশা করছি।

আর সেইখানেই দেখতে পাব পুরুষ কেমন করে নিজের জৈব ও অজৈব মন ও

মনন দিয়ে বিচার বুদ্ধি দিয়ে অনুভূতি দিয়ে নারীর দেহকে অস্তিত্বকে অনুভূতিকে অন্তরকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন চিরকাল। এবং তাঁকে দেখেছেন তাঁদের নিজেদের জৈবজগৎ দিয়ে। মেয়েদের জীবধাত্রীত্বের দিক দিয়ে নয়। মনোজগতের প্রেম বেদনা আনন্দের অনুভূতি দিয়ে দেখেননি। সেই সুখ অনুভূতিগুলি হলো (১) সুগভীর লজ্জা যাকে বলে হ্রী। (২) অতল প্রেম ও ত্যাগের বেদনা। (৩) আর জৈব দৈহিক কামনাবাসনা (তথা প্রেমের) আলোচনায় অসীম বিতৃষ্ণা।

এই তিনটি অনুভূতি কি সাধারণ কি অসাধারণ কি প্রাজ্ঞ কি মার্জিত সমস্ত নারী সমাজের দেহ ও চরিত্রেরই জন্মগত স্বভাবের বিশেষত্ব। এই সূক্ষ্ম মন রুচি পুরুষের চেয়ে একেবারে পৃথক। এমনকি ভগবানের বিভূতি বর্ণনায় এই বিশেষত্বই বলা হয়েছে—কীর্তি, শ্রী, বাক্, লজ্জা, মেধা, ধৃতি ক্ষমামতি—স্ত্রী জাতির মধ্যে ভগবানের রূপ বিভূতির এই সব বিশেষ বিশেষ প্রকাশ।

বেদ উপনিষদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহিত্য থেকে গ্রাম সাহিত্য লোক সাহিত্য ব্রতপার্বণ সাহিত্য সর্বত্রই কিন্তু ঐ যা পূর্বে বলে এসেছি নারীর মেয়েদের চরিত্রের মূল বিশেষত্বের ইতিহাসই বহন করছে।

হৈমবতী দুর্গাতে শক্তি, লক্ষ্মী কমলাতে সম্পদ শ্রী হ্রী, বীণাপাণি সরস্বতীতে জ্ঞান বিস্তারে 'কীর্তি মেধা লজ্জা . " আনন্দরূপিণী মূর্তি।

এই নানা মুনি ঋষির কল্পনায় নানারূপের আহ্বান ও দর্শন এই থেকেই মেয়েদের ও পুরুষের জৈব ও অজৈব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত লোকের আদি প্রভেদ দেখতে পাব। খুঁজেও পাব। কিন্তু আমাদের মনস্তত্ত্বের ইতিহাসের আদি কথা আদি সূত্র যে ঐ ভিত্তিগুলি (১) লজ্জা (হ্রী) ত্যাগ (কীর্তি) (২) প্রেম ধৃতি ক্ষমা স্ত্রী বুদ্ধিমতী (যা ক্ষমা কামনা-বাসনার আলোচনায় বিতৃষ্ণা) মনে রাখতেই হবে।

দেখা যাবে যত প্রতিভা জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি থাক না কেন মেয়েদের—নারীর ইতিহাসে নারীর মন পরিবেশ আবার ব্যবহার গ্রাম্য বা বিদগ্ধ যেমনই হোক না —এ তিনটি শোভার ভিত্তিতে তার ভিত দৃঢ় এবং সেখানেই তাঁদের সঙ্গে পুরুষের চরিত্র প্রতিভার একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

দেখতে হবে ও ভাবতে হবে—এটা তার স্বভাব—অথবা বুদ্ধি ও মনন ধর্মের অভাব। সেই কারণটাই আমাদের তুলে ধরতে হবে একালের চিন্তাশীল মনন শীল মেয়েদের সামনে।

রাজা

(রাম মোহন রায় ১৭৭২—১৮৩৩)

চন্দন কাঠের চিতা। পাশে কলস কলস ঘৃত।
গঙ্গোদক কোশাকুশী সর্ব মাঙ্গলিক
পুষ্প পাত্র মালা শঙ্খ রক্তাম্বর অলক্ত সিন্দুর
সব নিয়ে সমবেত ব্রাহ্মণ স্বজন বন্ধু গুরু পুরোহিত।
বহুমূল্য শয্যা পরে মরণ শয়নে শায়িত দয়িত।
শোকার্ত অলকমণি পাশে।
সম্মুখে অনন্ত পথ তার এক চিরকাল বিচ্ছেদ বিধুর।
সহসা ডাকিল কারা—"ওঠো ওঠো বধূ।
এসো নারী—এসো এসো সতী
মিটিয়ে বিচ্ছেদ দাহ। কর স্নান। লও করে ফুলমালা।
পর অলক্ত সিন্দুর।
আনো আনো শুভ চির বিবাহের রক্ত পট্টাম্বরে।
ওরে পুরনারী চন্দন আঁকোরে ভালে, হাতে দেবে কাজললতাটি।
শোকে আর মরণের সপ্তসিন্ধু বহি এবারের সপ্তপদী
মাড়াইয়া আকাশের মহাশূন্য মাটী।
এ যাত্রা হবে না শেষ, ফুরাবে না সপ্তপদী
গণ্ডী গুনে গুনে
মিটিবে বিচ্ছেদ দাহ চিতা শয্যার আগুনে।"
শুকালো চোখের জল।
মিলালো বিচ্ছেদ দুঃখ। নারী চাহিল বিহ্বল।
চন্দন কাজলমালা অলক্ত সিন্দুরে সাজাইয়া দিল সবে
দেহখানি তার।
দাঁড়াল বিমূঢ় সতী।
পাশে প্রাণহীন পতি।
কোন মহা সপ্তপদী পথে কি করিয়া যাবে
ধরে তার হাত।

* * *

দূরে হতে আসে দূতসংবাদ।

দু-নেত্রে শোকের অশ্রু। আর এক কোন ভয়ে
শঙ্কিত অন্তর।
আসেন পুরুষ সিংহ শ্রীরামমোহন নিজ গৃহ পর।
চারিদিকে নতশির ভীত মুখ স্তব্ধ পরিজন
জিজ্ঞাসেন, কোথা মাতা। কোথা মোর ভ্রাতৃবধূগণ।
অঙ্গুলী সংকেতে তারা দেখাইল বধূদের গৃহ।
সব ঘরে পরিজন। নাহিক অলকমণি শুধু।
শূন্য তার ঘর।
কোথা বধূ শুধান দেবর
মিলেনা উত্তর।
নয়নে ফুটিল নীর।
সে অশ্রুতে ছায়া মাগে ক্রীড়াসাথী ক্ষুদ্রবধূ অলকমণির।
এসেছিল নববধূ ললাটে চন্দন আঁকা, কাজললতাটি মাথে,
পরিধানে রাঙা চেলী, চরণে নূপুর।
গেছে সহমৃতা হতে মৃত্যু বিবাহের পথে—
সহমৃত্যু অভিযাত্রী বধূ গেছে মহাদূর।
যে অশ্রুর অস্পষ্ট আভাসে
কাদের অসংখ্য মূক মৃত মুখ
ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতের পথে ভেসে আসে।
ক্ষোভ রোষ করুণায় চোখে ভরে জল।
সেজল নিভায়ে দিল শতযুগ যুগান্তর
অনির্বাণ নারী চিতানল।
সে ক্রোধবহ্নির আলোক
দেখাইল প্রাণে সত্য, প্রেমে সত্য, জীবনের নিত্য
সতীলোক।

*   *   *

তোমাকে বলেছে লোকে রাজকার্যে
রাজোপাধি তব।
কে জানে সে কথা।
আমি জানি, নারী জানে সত্য তাহা নয়।
ধরণীতে রাজ অধিরাজ সেই অসহায় মানুষেরে
যে দেয় অভয়।